দশরথ দেব
নির্বাচিত রচনা সংকলন

(প্রথম খন্ড)

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
মেলারমাঠ ।। আগরতলা

দশরথ দেব

নির্বাচিত রচনা সংকলন

প্রথম খন্ড

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারী, ২০০২

প্রকাশনায়
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী)
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা
ত্রিপুরা

মুদ্রণে
ত্রিপুরা প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
মেলারমাঠ ❑ আগরতলা

প্রচ্ছদ ঃ বিভূতিভূষণ সাহারায়

দাম ঃ ১৫০ টাকা
(একশত পঞ্চাশ টাকা)

দশরথ দেব

নির্বাচিত রচনা সংকলন

সূচীপত্র



দশরথ দেব

জন্ম ঃ ২-২-১৯১৬ ইং মৃত্যু ঃ ১৪-১০- ১৯৯৮ ইং

ভূমিকা

ত্রিপুরার জনশিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম পথিকৃৎ, ১৯৪৮-৫০ সালের সশস্ত্র কৃষক সংগ্রামের সর্বাধিনায়ক, প্রখ্যাত সমাজ সংস্কারক, রাজতন্ত্র থেকে গণতন্ত্রে উত্তরণের সংগ্রামী প্রক্রিয়ার অন্যতম সংগঠক, প্রথিতযশা সাংসদ, রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী, সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির প্রাক্তন সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের আজীবন সভাপতি কমরেড দশরথ দেব প্রয়াত হওয়ার পর তাঁর লেখা ও বক্তৃতা নিয়ে নির্বাচিত রচনা সংকলন প্রকাশের জন্য পার্টির রাজ্য কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নানা প্রতিকূলতার জন্য কাজটি সম্পাদন করতে কিছুটা দেরী হলেও তার প্রাসংগিকতা ও প্রয়োজনীয়তা আজও সমানভাবে বিদ্যমান।

ছাপানোর কাজে সুবিধার জন্য নির্বাচিত রচনা সংকলনটি তিন খন্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। এবার প্রথম খন্ড প্রকাশিত হওয়ায় আমরা আনন্দিত। বাকী দুই খন্ডের আত্মপ্রকাশ যথাসম্ভব দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য ব্রতী হতে হবে। প্রথম খন্ড প্রকাশে যাঁরা বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। পার্টির প্রবীণ সদস্য কমরেড অনিরোধ দাস তাঁর সদা সক্রিয়তা ও কাজটিতে লেগে থাকার ভূমিকার মধ্য দিয়ে প্রথম খন্ড প্রকাশনার কাজ সম্পন্ন করে একটি গুরু রাজনৈতিক দাযিত্ব পালন করেছেন। তাব জন্য তাঁকে ও তাঁর সহযোগী বন্ধুদের বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক- সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভিন্ন সমস্যার গভীরে যেতে হলে কেবল এসবের বর্তমান অভিব্যক্তিগুলো বিচার করলেই চলবে না, অতীতের যাবতীয় মূল মূল ঐতিহাসিক ঘটনা প্রবাহ সম্পর্কে এবং সেই সময়ের প্রেক্ষিতে ঘটনাবলীর বাস্তবসম্মত, যুক্তিগ্রাহ্য ও বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের সংগে সত্যানুসন্ধানী প্রত্যেকেরই ঘনিষ্ঠ পরিচিতি একান্তভাবে আবশ্যক। কমরেড দশরথ দেবের নির্বাচিত রচনা সংকলন- এ অনুসন্ধিৎসার তৃষ্ণা মেটাতে সক্ষম হবে বলে মনে করি। ত্রিপুরার মৌলিক সমস্যা হচ্ছে, উপজাতি জনগোষ্ঠীর জাতি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সমস্যা। পুঁজিবাদী বিকাশের বন্ধ্যা পথে এ সমস্যা আজ সংকটে পবিণত হয়েছে। সে কারণে বুর্জোয়া- জমিদারদের স্বার্থরক্ষাকারী সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের সংগ্রাম থেকে জাতি পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার সংগ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে দেখার উপায় নেই। তথাকথিত বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলনের মাধ্যমে এ সংগ্রাম কোনওভাবেই শক্তি সঞ্চয় করতে বা সফল হতে পারে না। রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ অউপজাতি জনগণের সমর্থন ও সক্রিয়

অংশগ্রহণ এ ক্ষেত্রে একটি আবশ্যকীয় শর্ত। একজন কমিউনিস্ট হিসাবে কমরেড দশরথ দেব এ ঐক্য গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন।

উপজাতিদের ক্ষুদ্র একাংশের মধ্যে সন্ত্রাসবাদের মদতপুষ্ট ও দেশীয় কায়েমী স্বার্থবাদীদের প্রশ্রয়ে লালিত বিচ্ছিন্নতার আত্মঘাতী প্রবণতার বিরুদ্ধে কমরেড দশরথ দেবের লেখনী আজও জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করার অব্যাহত কঠিন-কঠোর সংগ্রামে পথের দিশারী। অসংখ্য শহীদের রক্তঝরা পথ বেয়ে রাজ্যের বামপন্থী ও কমিউনিস্ট আন্দোলন সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। এ অগ্রযাত্রায় নতুন গতিবেগ সঞ্চারে নতুন প্রজন্মের কাছে কমরেড দশরথ দেবের নির্বাচিত রচনা সংকলন একটি বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

জাতি - উপজাতি উভয় অংশের শান্তি-সম্প্রীতি ও উন্নয়নকামী জনগণের নিকট রচনা সংকলনের প্রথম খন্ডটি একটি মতাদর্শগত হাতিয়ারে পরিণত হবে বলে আশা করি। কমরেড দেব-এর নির্বাচিত রচনা সংকলনের প্রথম খন্ড প্রকাশের মাধ্যমে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

আগরতলা
৫ মার্চ, ২০০২

সম্পাদক
ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি
ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি(মার্কসবাদী)

দশরথ দেব স্মরণে

দশরথ দেব ছিলেন ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিংসবাদী নেতা। ১৯৯৮-এর ১৪ই অক্টোবর যেদিন তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার আগের পঞ্চাশ বছরে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসে এমন ঘটনা খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে যাতে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল না। একটানা পঞ্চাশ বছরের বেশী সময় ধরে কোন রাজ্যের রাজনীতিতে নিজের প্রভাবকে ধরে রাখা নিঃসন্দেহে কঠিন কাজ। খুব কম রাজনীতিকের জীবনেই তা ঘটে থাকে। দশরথ দেব সেই দুর্লভ কৃতিত্বের অধিকারী। তাঁর সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে গণ-আন্দোলনের নেতা ও সংগঠক হিসাবে, সংসদের সদস্য হিসাবে এবং সর্বশেষ রাজ্যের মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন ত্রিপুরার ইতিহাসে তা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। রাজনৈতিক প্রবন্ধকার হিসাবেও যথেষ্ট সুখ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন তিনি। নিজে ভাষাবিদ্ না হয়েও ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপজাতিদের ভাষা 'কক বরকের' উন্নয়নের জন্য তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তার জন্যও তিনি বিভিন্ন মহল থেকে প্রশংসিত হয়েছেন। কিন্তু সব কিছুর ঊর্দ্ধে যেকথা সত্যি তা হল উনিশশ' চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের দশকের শুরুতে সরকীর দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে তাঁর নেতৃত্বে ত্রিপুরার উপজাতিদের মধ্যে যে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠেছিল সেটা ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক অধ্যায়। যা তাঁকে এক কিংবদন্তী পুরুষে পরিণত করেছিল।

১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের ২রা ফেব্রুয়ারী ত্রিপুরার খোয়াই মহকুমার পূর্ব রামচন্দ্রঘাটের আমপুরা গ্রামে এক দরিদ্র উপজাতি পরিবারে দশরথ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। সেই সময়ে আমপুরার মত দুর্গম উপজাতি অঞ্চলে শিক্ষার আলো গিয়ে পৌঁছেনি। যে বয়সে ছেলেদের বই পুঁথি হাতে স্কুলে যাওয়ার কথা সেই বয়েস ঐ সব উপজাতি পল্লীর ছেলেরা বাবা - মা'র সঙ্গে মাঠে অথবা জুমে যেত কাজে যোগান দেবার জন্য। কত প্রতিভার যে এর ফলে অপমৃত্যু ঘটেছে কে বলবে। একই ভবিতব্য হয়ত অপেক্ষা করছিল দশরথের জন্যও। কিন্তু তা যদি ঘটতে না পেরে থাকে, দশরথ যদি অজান্তে হারিয়ে গিয়ে না থাকেন তাহলে সে কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবেই তাঁর নিজের। ছোটবেলা থেকেই লেখাপড়ার জন্য ছিল তাঁর অদম্য আগ্রহ। তবে তাঁর জীবনে স্কুলে যাওয়ার প্রথম সুযোগ যখন ঘটে তার আগেই অনেকগুলি মূল্যবান বছর নষ্ট হয়ে গেছে। অক্ষর জ্ঞান লাভের জন্য তিনি যখন কাছাকাছি একটি স্কুলে ভর্তি হন তখন তাঁর বয়স ছিল চৌদ্দ বছর। তবে ছাত্র হিসাবে তিনি যেমন ছিলেন মনোযোগী তেমনি ছিলেন মেধাবী। লেখাপড়ার প্রতি তাঁর গভীর আগ্রহ দেখে শিক্ষকগণও তাঁর সম্পর্কে খুবই যত্নবান ছিলেন।

দশরথের স্কুল জীবন কেটেছিল খোয়াই শহরে। তবে তিনি যখন সপ্তম শ্রেণীর ছাত্র সেই একটি বছর তিনি আগরতলা উমাকান্ত একাডেমিতে পড়াশুনা করেছিলেন। ১৯৪৩ সালে খোয়াই হাইস্কুল থেকেই তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেন এবং প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তিনি ভর্তি হন পার্শ্ববর্তী শ্রীহট্ট জেলার হবিগঞ্জ শহরের (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত) বৃন্দাবন কলেজে। ১৯৪৭ সালে হবিগঞ্জ থেকে বি এ পাশ করার পর তিনি চলে যান কলিকাতায় উচ্চতর শিক্ষার জন্য। এম এ এবং সেই সঙ্গে ল (Law) পড়ার জন্য ভর্তি হন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে।

রাজনীতির সাথে দশরথ দেবের প্রথম পরিচয় হয় যখন তিনি অন্য কয়েকজন সহকর্মীর সঙ্গে মিলে ১৯৪৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর (১৩৫৫ ত্রিপুরাব্দের ১১ই পৌষ) ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতি গঠন করেন। এই সংগঠনের সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে সুধন্বা দেববর্মা ও হেমন্ত দেববর্মা এবং তাঁকে নির্বাচিত করা হয়েছিল সহসভাপতি। রাজনীতির সাথে জনশিক্ষা সমিতির সরাসরি কোন যোগ ছিল না। অশিক্ষা, দারিদ্র্য ও কুসংস্কার থেকে উপজাতি সমাজকে মুক্ত করা ছিল এই সংগঠনের মূল লক্ষ্য। তবে আপাতদৃষ্টিতে জনশিক্ষা সমিতি একটি সমাজসংস্কারমূলক অরাজনৈতিক সংগঠন হলেও একথা সত্যি যে জনশিক্ষা সমিতি গঠনের ক্ষেত্রে যেসব উপজাতি ছাত্র উদ্যোগী হয়েছিলেন তাঁরা কমিউনিস্ট নেতা বীরেন দত্তের কাছ থেকে এ বিষয়ে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে তাঁদের নিয়মিত যোগাযোগও ছিল।

১৯৪৫ সালটি ছিল ইতিহাসের এক যুগ সন্ধিক্ষণ। ফ্যাসীবাদের পরাজয় এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের গৌরবজনক বিজয়ের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটার পর সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের প্রভাব সর্বত্র দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছিল। পরাধীন দেশগুলিতে সৃষ্টি হয়েছিল জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রবল জোয়ার। ভারতবর্ষেও তখন এক অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। পরাধীনতার শৃঙ্খল মুক্তির জন্য এদেশের মানুষ তখন উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতা আন্দোলনের ঢেউ এসে লেগেছিল ভারতের এক কোণে অবস্থিত রাজন্য শাসিত এই ত্রিপুরায়ও। ত্রিপুরার পশ্চাদপদ উপজাতিদের, বিশেষতঃ তার শিক্ষিত যুব অংশের মধ্যে আত্মবিকাশের আকাঙ্খা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই নবজাগ্রত চেতনারই সেদিন প্রতিফলন ঘটেছিল জনশিক্ষা সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে।

শিক্ষার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেদিন রাজতন্ত্রী ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের মধ্যে যে ব্যাপক জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল সত্যিকার অর্থেই সেটা ছিল এক নজিরবিহীন ঘটনা। সেই সঙ্গে এটাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ যে শিক্ষা প্রসারের এই কর্মসূচীর পাশাপাশি মহাজনী শোষণ থেকে মুক্তির লক্ষ্যে উপজাতিদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির জন্যও জনশিক্ষা সমিতি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। পরবর্তী সময়ে জনশিক্ষা সমিতির এই ভূমিকার

মূল্যায়ন করে দশরথ দেব লিখেছেন, "জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন শুধুমাত্র শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার বাণীই উপজাতিদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেয়নি, শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষাও তাদের মুখে তুলে দিয়েছে। অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে সংগঠিত প্রতিবাদ করতে শিখিয়েছে। এক কথায় উপজাতি জনগণের মধ্যে নতুন চেতনার উন্মেষ ঘটিয়েছে"।

জনশিক্ষা আন্দোলন দশরথ দেবের নিজের জন্য ছিল নেতৃত্বের যোগ্যতা প্রমাণের প্রথম পরীক্ষা। জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন সংগঠক হিসবে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছিলেন তেমনি উপজাতি জনগণের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তাও ছড়িয়ে পড়েছিল ব্যাপকভাবে। যদিও শুরুতে তিনি ছিলেন নেতৃস্থানীয় সবার মধ্যে একজন মাত্র, কিন্তু এই আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যোগ্যতার পরীক্ষায় তিনি অন্য সহকর্মীদের পেছনে ফেলে এক নম্বরে উঠে আসেন।

দশরথ দেব প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িত হয়ে পড়েন ১৯৪৮ সালের মে মাসে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ (পরিবর্তিত নাম ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ এবং আরও পরে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ) গঠিত হবার পর। মূলতঃ জনশিক্ষা সমিতির নেতা ও কর্মীদের নিয়েই এই রাজনৈতিক সংগঠনটি তৈরী হয়েছিল । দশরথ দেব ছিলেন এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত তিনি এই পদে আসীন ছিলেন।

মুক্তি পরিষদ যে সময়ে গঠিত হয় তার বেশ কিছু সময় আগে থেকেই ত্রিপুরায় এক অনিশ্চিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল মহারাজার অকাল মৃত্যুর কারণে। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত যেদিন স্বাধীনতা লাভ করে তার মাত্র তিন মাস আগে ১৭ই মে তারিখে মহারাজা বীরবিক্রিম কিশোর মাণিক্য বাহাদুরের মৃত্যু হয়। যুবরাজ কিরীট বিক্রম তখন নাবালক। তাঁর পক্ষে রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করে একটি রিজেন্সী কাউন্সিল যার প্রেসিডেন্ট ছিলেন প্রয়াত মহারাজার বিধবা পত্নী মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবী। এই সময়ে ভারত সরকারের পরামর্শমত সত্যব্রত মুখার্জি নামে এক আই সি এস অফিসারকে ত্রিপুরার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়েছিল। ত্রিপুরা আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৪৭ সালের ১৩ই আগস্ট যখন রিজেন্সী কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট হিসাবে মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবী ইনস্ট্রুমেন্ট অব এক্সেসন স্বাক্ষর করেন।

আইনগতভাবে ত্রিপুরা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাওয়ার পরেও বলপূর্বক তাকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ষড়যন্ত্র হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের নায়কদের অন্যতম ছিলেন মহারাজ কুমার দুর্জয় কিশোর দেববর্মণ যিনি শুধু মাত্র রাজপরিবারের একজন প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন না, রিজেন্সী আমলে গঠিত মন্ত্রীসভারও তিনি একজন মন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সত্যব্রত মুখার্জির বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছিল তিনিও এই ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত

ছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের নির্দেশে প্রধানমন্ত্রী মুখার্জী পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। একইভাবে দুর্জয় কিশোরকেও মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দিতে বাধ্য করা হয়েছিল। এবং সাময়িককালের জন্য রাজ্য থেকে তাঁকে বহিষ্কারও করা হয়েছিল।

সত্যব্রত মুখার্জীকে বিদায় নিতে বাধ্য করার পর কেন্দ্রীয় সরকার এ বি চাটার্জী নামে এক আই সি এস অফিসারকে ত্রিপুরার দেওয়ান নিযুক্ত করে পাঠায়। এই দেওয়ানী ব্যবস্থা চলছিল ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর যেদিন ত্রিপুরা চূড়ান্তভাবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয় তার আগে পর্যন্ত। দেওয়ানী শাসন আমলে নামে রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব থাকলেও প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত দেওয়ানগণই। ১৯৪৯ সালের ১৫ই অক্টোবর রাজতন্ত্রের আইনগত অস্তিত্ব লোপ পায় এবং ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা পুরোপুরিভাবে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে হস্তান্তরিত হয়।

ত্রিপুরায় যখন এ ধরণের এক অনিশ্চিত রাজনৈতিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সারা দেশে কমিউনিস্টদের উপর তখন নেমে এসেছিল প্রচন্ড দমন-পীড়ন। ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে যে 'জঙ্গী' লাইন গ্রহণ করা হয়েছিল তারপর থেকে কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকারী আক্রমণের তীব্রতা বৃদ্ধি পায়। কোন কোন রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল সেই সময়ে। অন্য যেসব রাজ্যে তা করা হয়নি সেই সব রাজ্যেও কমিউনিস্টদের পক্ষে প্রকাশ্যে কাজ করা অসম্ভব্ করে তোলা হয়েছিল। হাজার হাজার কমিউনিস্টকে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়েছিল। পুলিশের গুলিচালনায় শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন বহু কমিউনিস্ট কর্মী। জেলখানায় আটক নিরস্ত্র বন্দীদের উপর গুলি চালনার মত নৃশংস ঘটনাও ঘটেছিল সেই সময়ে।

যদিও ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট পার্টি তখন খুবই দুর্বল এবং তার প্রভাবও তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না, কিন্তু তা সত্ত্বেও কমিউনিস্টরা এরাজ্যেও সরকারী আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। পার্টির দুই স্থানীয় নেতা দেবপ্রসাদ সেনগুপ্ত ও কানু সেনগুপ্তকে বিনা বিচারে আটক করা হয়। গ্রেপ্তার হন অন্য আরও দু'জন রাজনৈতিক নেতা প্রভাত রায় ও বংশী ঠাকুর। গ্রেপ্তার এড়াতে বীরেন দত্ত আত্মগোপন করেন।

এই পর্যায়ে বীরেন দত্ত এবং জনশিক্ষা আন্দোলনের তিন নেতা — দশরথ দেব, হেমন্ত দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা গোপনে এক সঙ্গে মিলিত হয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচন করেন। তাঁরা এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে সরকার দমনপীড়নের মাত্রা যেভাবে বাড়িয়ে চলেছে তাতে প্রকাশ্য রাজনৈতিক কার্যকলাপের সুযোগ ক্রমশ সঙ্কুচিত হয়ে আসছে। কাজেই আত্মগোপন করে থেকে যাতে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলা যায় সেই লক্ষ্যে একটি নতুন রাজনৈতিক সংগঠন সৃষ্টি করতে হবে। ঐ বৈঠকেই দশরথ দেবকে সভাপতি করে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের ফল হয়েছিল যুগান্তকারী। দশরথ

দেবের পরিচালনায় এবং মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে যে প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তা ত্রিপুরর রাজনৈতিক ধারার মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। ছোট্ট কমিউনিস্ট পার্টি একটি বিরাট গণভিত্তিক পার্টিতে পরিণত হয়েছিল।

দশরথ দেব যখন মুক্তি পরিষদের সভাপতি পদের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন তাঁর ছাত্র জীবনের তখনও সমাপ্তি ঘটেনি। কলেজের পড়াশুনা শেষ করার পর তিনি তখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে অধ্যায়নরত কিন্তু নিজের ভবিষ্যতের চেয়েও রাজ্যের জনগণের, বিশেষতঃ উপজাতি জনগণের ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে ছিল অনেক বেশী মূল্যবান। তাই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা অসমাপ্ত রেখে আত্মগোপনে চলে যাওয়ার এবং রাজনৈতিক আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নেন।

জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দশরথ ও তাঁর সহযোদ্ধারা সাধারণ উপজাতিদের চোখে যে সম্মান ও মর্যাদার উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন তারপর তাঁদেরই নেতৃত্বে যখন মুক্তি পরিষদ একটি রাজনৈতিক সংগঠন রূপে আত্মপ্রকাশ করে তখন ব্যাপক সংখ্যায় উপজাতিদের ঐ সংগঠনের পতাকাতলে টেনে আনা ততটা কঠিন কাজ ছিল না। অল্প সময়ের মধ্যেই উপজাতিদের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে মুক্তি পরিষদ জনপ্রিয় হয়ে উঠে। মহাজনী শোষণ, 'তিতুন' প্রথা বা বেগার শ্রম প্রভৃতির মত যেসব সমস্যা উপজাতি জীবনকে অভিশপ্ত করে তুলেছিল সেগুলির বিরুদ্ধে আন্দোলনের কর্মসূচী ছাড়াও জনগণের সকল অংশের কাছে গ্রহণযোগ্য সাধারণ গণতান্ত্রিক দাবিগুলিও মুক্তি পরিষদের রাজনৈতিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার ছিল তাদের মূল রাজনৈতিক শ্লোগান।

মুক্তি পরিষদ গঠিত হওয়ার পর তখনও ছয় মাস পূর্ণ হয়নি, কিন্তু ইতোমধ্যে ১৯৪৮ সালের ৯ই অক্টোবর আগরতলা থেকে মাত্র ২৫ কিলোমিটার দূরে গোলাঘাটি উপজাতি পল্লীতে নিরস্ত্র জনতার উপর গুলিবর্ষণ করে পুলিশ ৭ ব্যক্তিকে খুন করে যাদের মধ্যে ৬ জনই ছিলেন উপজাতি। এই নৃশংস হত্যাকান্ডের পর পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠে। উপজাতিদের মধ্যে প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুক্তি পরিষদ গেরিলা কায়দায় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নেয়। এই সিদ্ধান্তের পর গেরিলা বাহিনী গঠনের কাজ জোর কদমে শুরু হয়ে যায়। দশরথ নিজেই ছিলেন গেরিলা বাহিনীর সুপ্রীম কমান্ডার।

১৯৪৯ সালের ৯ মার্চ সামরিক আইন জারী করে সমগ্র খোয়াই বিভাগকে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তারপর থেকে খোয়াই ও সদর বিভাগের বিস্তীর্ণ পার্বত্যাঞ্চলে দমনপীড়নের মাত্রা বেড়ে গিয়েছিল প্রচন্ডভাবে। উপজাতি অংশের মানুষদের দলে দলে গ্রেপ্তার করে এনে জেলে পোরা হয়েছিল। পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল শত শত ঘরবাড়ী। পুলিশী নির্যাতনের ভয়ে অসংখ্য মানুষ জঙ্গলে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছিল। দশরথ দেব ও অন্যান্য নেতাদের ধরিয়ে দিতে পারলে লোভনীয় আর্থিক

পুরস্কার দেওয়া হবে বলেও পুলিশের পক্ষ থেকে ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল।

সেনাবাহিনীর অত্যাচারের নৃশংসতম ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৯ সালের ২৮শে মার্চ যখন খোয়াই বিভাগের পদ্মবিল গ্রামে তারা সোজাসুজি গুলি চালিয়ে তিন উপজাতি মহিলাকে খুন করে। এই ঘটনায় কুমারী, মধুতি ও রূপশ্রী এই তিন বীরাঙ্গণা শহীদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

পদ্মবিলের নারীহত্যার পর সরকারের প্রতি উপজাতি জনগণের ঘৃণা আরও বেড়ে যায়। প্রতিরোধ সংগ্রামও অধিকতর তীব্রতা লাভ করে। দশরথ দেব পদ্মবিলের নারীহত্যার ঘটনাকে বর্ণনা করেছেন জ্বলন্ত আগুণে ঘৃতাহুতি দেওয়ার শামিল বলে। সরকার তাদের দমননীতিকে যত তীব্র করছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে প্রতিরোধ সংগ্রামও ততই প্রবল হয়ে উঠছিল। লক্ষ্যণীয় যে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলাকালীন সময়ে সরকারের কাছে আত্মসমর্পণের একটি ঘটনাও ঘটেনি। এছাড়াও, যেকথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন তা হল যতদিন সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছিল ততদিন সদর ও খোয়াই বিভাগের বিস্তীর্ণ উপজাতি প্রধান এলাকায় সরকারের প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ প্রায় উঠে গিয়েছিল। ঐসব এলাকায় গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এক সমান্তরাল প্রশাসন।

১৯৫০ সালের শেষ দিকে, প্রতিরোধ সংগ্রাম যখন খুবই তীব্র সেই সময়ে দশরথ দেব সহ গণমুক্তি পরিষদের গোটা নেতৃত্ব এক সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেন। সংগ্রামের অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁরা কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা বোধ করেছিলেন। তাছাড়া, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে তেলেঙ্গানার কৃষকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান, পশ্চিমবঙ্গের কাকদ্বীপ ও অন্যান্য জায়গায় কৃষকদের জীবনপণ লড়াই, পূর্ব পাকিস্তানের ময়মনসিং জেলার হাজং উপজাতিদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম প্রভৃতি সমকালীন ঘটনাবলীও গণমুক্তি পরিষদ নেতৃত্বের চিন্তাধারাকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল।

পার্টি প্রোগ্রাম চূড়ান্ত করার জন্য ১৯৫১ সালের অক্টোবর মাসে কলিকাতায় গোপনীয়ভাবে কমিউনিস্ট পার্টির যে বিশেষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে দশরথ দেব প্রতিনিধি হিসাবে যোগ দিয়েছিলেন। ঐ সম্মেলনে তাঁকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত করা হয়েছিল। পার্টি সদস্যপদ লাভ করার এক বছরের মধ্যে কেন্দ্রীয় কমিটিতে নির্বাচিত হওয়া কোন কমিউনিস্ট পার্টির জন্য এক নজীরবিহীন ঘটনা। সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতা হিসাবে দশরথ যে অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন এটা ছিল তারই স্বীকৃতি। ১৯৬৪ সালে পার্টি ভাগ হওয়ার আগে পর্যন্ত দশরথ দেব অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। পার্টি ভাগ হওয়ার পর তিনি সি পি আই (এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন এবং ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত স্বপদে বহাল থাকেন। স্বাস্থ্যের গুরুতর-অবনতি ঘটায় তিনি সে বছর কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অব্যাহতি চেয়ে নিয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে অনুষ্ঠিত রাজ্য সম্মেলনে তিনি পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য

কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছিলেন। তারপরেও পার্টি ভাগ হওয়ার আগে এবং পরে বেশ কয়েকবার তাঁকে রাজ্য কমিটির সম্পাদকের গুরু দায়িত্বভার বহন করতে হয়েছে।

স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। সেই নির্বাচনে দশরথ দেব ত্রিপুরা পূর্ব কেন্দ্র থেকে লোকসভায় নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেবার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল এমন এক পরিস্থিতিতে যখন কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষে স্বাধীনভাবে নির্বাচনী প্রচার চালাবার সুযোগ ছিল না বললেই চলে। পার্টির নেতা ও কর্মীদের অধিকাংশই তখনও গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হচ্ছিলেন। নির্বাচন প্রক্রিয়া চলাকালীনও নির্বাচন প্রার্থীসহ বেশ কিছু সংখ্যক কমিউনিস্ট নেতাকে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে আটক করা হয়েছিল। দশরথ দেব নির্বাচন লড়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে থেকে এবং মাথার উপর গ্রেপ্তারী পরওয়ানা নিয়ে। প্রকাশ্যে ভোটারদের সামনে উপস্থিত হয়ে তিনি যে ভোট চাইবেন সে সুযোগ তাঁর ছিল না। তাঁর বিরুদ্ধে কংগ্রেস দলের প্রার্থী ছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি ও সুপরিচিত রাজনৈতিক নেতা শচীন্দ্রলাল সিংহ। দশরথ দেব অতি সহজেই তাঁকে পরাজিত করেছিলেন। দশরথ দেব যেখানে পেয়েছিলেন প্রদত্ত বৈধ ভোটের ৫৩.৯০ শতাংশ সেখানে শচীন্দ্রলাল সিংহের প্রাপ্ত ভোট ছিল মাত্র ৩৭.২৮ শতাংশ।

লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পরেও দশরথ দেবের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরওয়ান প্রত্যাহার করে নেওয়ার কোন ইচ্ছা রাজ্য সরকারের ছিল না। বরং তারা সুযোগ খুঁজছিল লোকসভা অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য যদি দশরথ দিল্লী যাওয়ার চেষ্টা করেন তখন পথিমধ্যেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা যায় কিনা। বাধ্য হয়ে তাঁকে গোপন পথে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে নয়াদিল্লী পৌঁছতে হয়েছিল। শপথ নেবার জন্য লোকসভায় উপস্থিত হওয়ার আগে পর্যন্ত পুলিশ তাঁর গতিবিধি সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সবাইকে অবাক করে দিয়ে তিনি যখন সভায় উপস্থিত হন তখন সদস্যগণের মধ্যে অনেকেই তাঁকে সোল্লাসে স্বাগত জানিয়েছিলেন। পরদিন জাতীয় দৈনিক সংবাদ পত্রগুলিতে দশরথ দেবের ছবিসহ তাঁর শপথ গ্রহণের এই বিবরণ প্রকাশিত হওয়ার পর সারা দেশে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল। এই নাটকীয় ঘটনার পর সেদিনই কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশে ত্রিপুরা সরকার দশরথ দেবের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা প্রত্যাহার করে নেয়। একই সঙ্গে পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের অন্য যেসব নেতার বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরওয়ানা ছিল সেগুলিও প্রত্যাহৃত হয়।

লোকসভার প্রথম অধিবেশনে যোগ দেওয়ার পর দশরথ দেব যখন মুক্ত মানুষ হিসাবে ত্রিপুরায় ফিরে আসেন তখন তিনি বীরোচিত সম্বর্দ্ধনা লাভ করেছিলেন। তদানীন্তন চীফ্ কমিশনারী সরকার তাঁর সম্বর্দ্ধনার জন্য কোন সরকারী মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দিতে অস্বীকার করায় আগরতলা শহরের বাইরে ধান ক্ষেতে সম্বর্দ্ধনা সভার অনুষ্ঠান করতে

হয়েছিল। কিন্তু তাতেও মানুষের উৎসাহে ভাটা পড়েনি। সকল বয়সের হাজার হাজার নারী - পুরুষ জমায়েত হয়েছিলেন তাঁর সম্বর্দ্ধনা সভায়। সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলনের শুরু থেকেই দশরথ দেবের নাম ছড়িয়ে পড়েছিল মানুষের মুখে মুখে, কিন্তু আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হওয়ায় তাঁকে চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয়েছিল খুব কম লোকেরই। তাঁর সম্বন্ধে তারা এতদিন এত কথা শুনে এসেছেন তাঁকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হবে, লোকের কাছে সেদিনের সম্বর্দ্ধনা সভার এটা ছিল একটা বাড়তি আকর্ষণ।

১৯৫২ সালের পর ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত যে ছয়টি লোকসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তার সব ক'টিতেই তিনি তাঁর পুরোনো কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৯৬৭ এবং ১৯৭৭ ছাড়া বাকি চারটি নির্বাচনে তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন। পঞ্চম লোকসভায় (১৯৭১-৭৭) তিনি ছিলেন সি পি আই (এম) গ্রুপের ডেপুটি লীডার। দীর্ঘ ২০ বছর লোকসভার সদস্য থাকাকালীন তিনি অবহেলিত ও পশ্চাদপদ ত্রিপুরার জটিল সমস্যাগুলিকে জাতীয় স্তরে তুলে ধরে সেগুলি সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে অক্লান্তভাবে চেষ্টা করেছেন।

সারা ভারত কৃষক সভার একটি প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসাবে দশরথ দেব ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরে যান। সোভিয়েত ইউনিয়নের পর প্রতিনিধি দলটি চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরী ও বুলগেরিয়া এই তিনটি সমাজতান্ত্রিক দেশও সফর করেছিল। সেবার তিনি লন্ডনেও গিয়েছিলেন এবং অ্যালবার্ট হলে অনুষ্ঠিত এক সভায় ভাষণ দিয়েছিলেন। শ্রোতাদের অধিকাংশ ছিল শ্রমজীবী অংশের মানুষ। সমাজতন্ত্রের সাফল্যগুলি সম্পর্কে তিনি এই সভায় ব্যাখ্যামূলক বক্তব্য রেখেছিলেন। দেশে ফিরে আসার পর তাঁর প্রথম কাজ হয়েছিল ত্রিপুরার গ্রামাঞ্চলে ঘুরে ঘুরে জাতি - উপজাতির সাধারণ মানুষের কাছে সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফরের অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরা।

১৯৬২ সালে ভারত - চীনের মধ্যেকার সীমান্ত বিরোধ যখন সশস্ত্র যুদ্ধের রূপ নেয় সারা দেশেই তখন কমিউনিস্ট - বিরোধী অপপ্রচার তুঙ্গে উঠেছিল। শত শত কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা হয়েছিল। ত্রিপুরাতেও সেই সময়ে দশরথ দেব সহ ৬৮ জনকে ভারত রক্ষা আইনে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং তাঁদের আটক রাখা হয়েছিল সুদূর বিহারের হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলে। প্রায় দুই বছর বন্দীজীবন কাটাবার পর সুপ্রীম কোর্টে হেবিয়াস কর্পাস মামলা করে এই সব রাজবন্দীরা মুক্তি পেয়েছিলেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই ১৯৬৪ সালের ডিসেম্বরে সি পি আই (এম) -এর সপ্তম কংগ্রেস সমাপ্ত হওয়ার পর সারা দেশ থেকে পার্টির অসংখ্য নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়। এবারও তাঁদের বিরুদ্ধে সেই একই দানবীয় আইন অর্থাৎ ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করা হয়েছিল। ত্রিপুরায় প্রথম দফায় যাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়েছিল আবারও তাঁদের হাজারীবাগ সেন্ট্রাল জেলেই পাঠিয়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয়

দফায় দশরথ দেব, নৃপেন চক্রবর্তী ও সরোজ চন্দকে গ্রেপ্তার করে পাঠানো হয় বিহারের দুমকা ডিস্ট্রিক্ট জেলে। এক বছর বাদে এই সব রাজবন্দীদের মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে আবার নিবর্তনমূলক আটক আইনে ত্রিপুরায় সি পি আই (এম) -এর ৩৬ জন নেতা ও কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁদের প্রথমে বিহারে ভাগলপুর সেন্ট্রাল জেল এবং তারপর কলিকাতার আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আটক রাখা হয়। এই সব আটক বন্দীদের মধ্যে দশরথ দেবও ছিলেন। এবারেও বন্দীরা মুক্তি পান এক বছরের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর।

১৯৭৭ সালের লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের শোচনীয় পরাজয় ও কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটার পর তার ধাক্কা এসে লাগে ত্রিপুরাতেও। কংগ্রেস পরিষদীয় দল ভেঙ্গে দু'টুকরা হয়ে যায় এবং ত্রিপুরায় কংগ্রেস শাসনের অবসান ঘটে। তারপর স্বল্পস্থায়ী দু'টি কোয়ালিশন সরকার গঠিত হওয়ার পর ১৯৭৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতির শাসনাধীনে বিধানসভা নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সেই নির্বাচনে সি পি আই (এম) নেতৃত্বাধীন বামফ্রন্ট ৬০টি আসনের মধ্যে ৫৬টি দখল করে নিয়ে সরকার গঠন করে। সেবার দশবথ দেব রামচন্দ্রঘাট কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটাধিক্যে বিজয়ী হন। পরবর্তী তিনটি নির্বাচনেও (১৯৮৩, ১৯৮৮ ও ১৯৯৩) তিনি একই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন এবং প্রতিবারই রেকর্ড সংখ্যক ভোটের ব্যবধানে বিজয়ী হয়েছেন।

১৯৭৮ সালে নৃপেন চক্রবর্তীর নেতৃত্বে প্রথম বামফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠিত হলে দশরথ দেব হন সেই মন্ত্রিসভার শিক্ষামন্ত্রী। ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতি গঠনের মধ্য দিয়ে রাজনীতির সাথে যাঁর প্রথম পরিচয় ঘটেছিল তেত্রিশ বছর বাদে শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাবার দয়িত্ব বর্তেছিল তাঁরই উপর। দায়িত্ব প্রতিপালনে তিনি যে যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন একথা এমনকি তাঁর সমালোচকেরাও অস্বীকার করতে পারবেন না। শিক্ষামন্ত্রী হিসাবে তিনি সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন দুর্গম অঞ্চলে অশিক্ষার অন্ধকার কাটাবার জন্য শিক্ষার আলো দ্রুত পৌঁছে দেওয়ার উপর। ককবরক ভাষী উপজাতি ছেলেমেয়েরা যাতে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের সুযোগ পেতে পারে তা সুনিশ্চিত করার দিকে তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তাছাড়া, যেখানে যেখানে প্রয়োজন সিনিয়র বেসিক স্কুলগুলিকে মাধ্যমিক স্কুলে এবং মাধ্যমিক স্কুলগুলিকে উচ্চতর মাধ্যমিক স্কুলে পরিণত করার জন্যও তিনি প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যেসব মহকুমা শহরে ডিগ্রী কলেজ ছিল না সেই সব শহরেও ডিগ্রী কলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। এক কথায় শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ বিকাশের জন্য তিনি যে ভূমিকা পালন করেছিলেন তা ছিল খুবই প্রশংসনীয়। উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসাবে দশরথ দেবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান হল উপজাতিদের স্বশাসনের অধিকার সুনিশ্চিত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। তাঁরই উদ্যোগে ১৯৭৯ সালে ত্রিপুরা বিধানসভায় ত্রিপুরা

উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইনটি পাশ হয়। এবং ১৯৮২ সালে ঐ আইন অনুবলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের জন্য নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই ব্যবস্থা গ্রহণ করার ফলেই কেন্দ্রীয় সরকার বাধ্য হয়েছিলেন ত্রিপুরায় সংবিধানের ষষ্ঠ তফসিল অনুবলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন করার জন্য ১৯৮৪ সালে সংবিধান সংশোধন করতে।

১৯৮৩ সালের নির্বাচনের পর যখন দ্বিতীয় বামফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়, তিনি ছিলেন সেই মন্ত্রীসভায় উপ-মুখ্যমন্ত্রী।

১৯৮৮ সালে কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে সন্ত্রাসবাদ দমনের নামে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে সেনাবাহিনী নামিয়ে দিয়ে এবং নানাধরনের জালিয়াতির আশ্রয় নিয়ে কংগ্রেস নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করেছিল এবং এভাবে রাজ্যের শাসন ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। সাথে সাথেই সারা রাজ্যে নামিয়ে আনা হয়েছিল আধা ফ্যাসিস্ট সন্ত্রাস। অসংখ্য পার্টি কর্মী খুন হন। অনেকেই বাড়ীঘর ছেড়ে অন্যত্র আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। এই সন্ত্রাসের রাজত্ব স্থায়ী হয়েছিল টানা পাঁচ বছর। এই কঠিন পরিস্থিতিতে পার্টির রাজ্য সম্পাদকের গুরু দায়িত্ব পালন করতে হয়েছিল দশরথ দেবকে। কিছু সময়ের জন্য বিধানসভায় বিরোধী দলের নেতাও ছিলেন তিনি।

১৯৯৩ সালে রাষ্ট্রপতির শাসনে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তাতে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস - টি ইউ জে এস জোট শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। বামফ্রন্ট আবার ক্ষমতায় ফিরে আসে। তৃতীয় বামফ্রন্ট সরকারের মুখ্যমন্ত্রী হন দশরথ দেব। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ তিনি মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণ করার কয়েক মাসর মধ্যেই গুরুতরভাবে অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেই অসুস্থতা থেকে তিনি আর আরোগ্য লাভ করেননি। দিনের পর দিন তাঁর স্বাস্থের অবনতি ঘটতে থাকে। ফলে মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে তাঁর কাছ থেকে যে কর্মতৎপরতা প্রত্যাশিত ছিল তার অনেকটাই অপূর্ণ থেকে যায়। ১৯৯৮ সালের নির্বাচনে অসুস্থ দশরথ দেব স্বেচ্ছায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়ান। তারপর অল্প কয়েক মাস মাত্র তিনি বেঁচেছিলেন। ১৯৯৮ সালের ১৪ই অক্টোবর তাঁর জীবনদীপ নিভে যায়।

দশরথ দেব নিজে যেহেতু জন্মগ্রহণ করেছিলেন এক দরিদ্র উপজাতি পরিবারে, কাজেই উপজাতিদের জীবন - যন্ত্রণাকে জানার ও বোঝার জন্য তাঁকে অন্যের দ্বারস্থ হতে হয়নি। নিজের জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি তা সম্যক উপলব্ধি করেছিলেন। তাই দেখা যায় রাজনৈতিক জীবনের শুরুতেই জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তিনি যেমন উপজাতি সমাজে শিক্ষার আলো পৌঁছে দেবার ও সামাজিক কুসংস্কার থেকে উপজাতিদের মুক্ত করার জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন, তেমনি নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়েছিলেন শোষণ ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে তাদের সচেতন করে তোলার জন্য। কিন্তু উপজাতিদের স্বাধীকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন যাতে বিচ্ছিন্নতার খাতে প্রবাহিত না হয় এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের মূলস্রোতে যাতে এই আন্দোলনকে ধরে রাখা যায় সেদিকে ছিল তাঁর প্রখর

দৃষ্টি। তাঁর এ ধরনের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বলেই দেখা যায় উনিশ শ'চল্লিশের দশকের শেষ ও পঞ্চাশের দশকের শুরুতে গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে উপজাতিদের মধ্যে যে জঙ্গী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার মধ্য দিয়েই এরাজ্যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, যা পরবর্তিতে বিস্তৃতি লাভ করেছে অনুপজাতি অংশের মধ্যেও।

একথা সত্যি যে অতীতে ত্রিপুরা ছিল রাজতন্ত্রের অধীন একটি উপজাতি - প্রধান রাজ্য এবং এখানকার রাজপরিবারও ছিল উপজাতি বংশোদ্ভূত। একই সঙ্গে এটাও সত্যি যে ত্রিপুরার সীমান্ত সংলগ্ন অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলা থেকে বাঙালিরা বহু আগে থেকেই ত্রিপুরায় এসে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করতে শুরু করে। ফলে ঐতিহাসিকভাবেই এখানে একটা মিশ্র জনবসতি গড়ে উঠে। তাছাড়া, ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর বছরের পর বছর ধরে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিপুল সংখ্যায় বাঙালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা এরাজ্যে চলে এসে স্থায়ীভাবে আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে এখানকার জনসংখ্যাগত চিত্র সম্পূর্ণ পাল্টে গেছে। যে উপজাতিরা ছিল জনসংখ্যার সংখ্যাগড়িষ্ঠ অংশ তারা নিদারুণ সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে।

দশরথ দেব ভাল করেই জানতেন যে ঐতিহাসিকভাবে সৃষ্ট জনসংখ্যাগত ভারসাম্যের এই পরিবর্তনকে ইচ্ছা করলেই উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া যাবে না। তিনি দৃঢ়ভাবে একথা বিশ্বাস করতেন যে উভয় জনগোষ্ঠীর মানুষকে এখানে মিলেমিশে থাকতে হবে এবং ত্রিপুরার ভবিষ্যৎ নির্ভর করবে বাঙালী ও উপজাতি এই দুই জনগোষ্ঠীর মধ্যে মৈত্রীবন্ধন কতটা শক্তিশালী করা যায়, তার উপরে।

নীতিগত প্রশ্নে দশরথ দেব কোন সময়েই কোনরূপ আপোষের পক্ষপাতি ছিলেন না। আর সেজন্যই দেখা যায় 'উপজাতিরা উপজাতিদের জন্য' এই ভ্রান্ত ও ক্ষতিকর আওয়াজ তুলে যখনই যারা গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উপজাতিদের দূরে সরিয়ে রাখার ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে তাদের পরিচালিত করার চেষ্টা করেছে, তিনি সেই অপচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য কঠিন আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছেন। উপজাতি সর্বস্বতা ও বাঙালী বিদ্বেষকে পুঁজি করে গড়ে উঠা ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি যখন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সামনে একটা বড় রকমের চ্যালেঞ্জ হিসাবে দেখা দেয় তখন সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়তাবাদী রাজনীতির প্রভাব থেকে উপজাতিদের, বিশেষ করে তাঁর যুব অংশকে মুক্ত রাখার জন্য আদর্শগত সংগ্রাম জারী রাখার উপর তিনি বিশেষভাবে জোর দিয়েছিলেন। একইভাবে, ১৯৮০'র দশকের প্রথম থেকে শুরু করে পরবর্তী বছরগুলিতে 'স্বাধীন ত্রিপুরা' তথা স্বাধীন উপজাতি রাজ্য গঠনের অবাস্তব লক্ষ্য সামনে রেখে যখন একের পর এক বিভিন্ন উগ্রপন্থী সংগঠন গজিয়ে উঠে তখন ভুল পথে পরিচালিত উপজাতি যুবকদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টার পাশাপশি এই সব উগ্রপন্থী সংগঠনকে মতাদর্শগতভাবে পরাজিত করার উপর দশরথ দেব সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন।

আবার অন্যদিকে 'আমরা বাঙালী'র মত উগ্র জাতীয়তাবাদীরা যখন বাঙালী স্বার্থ রক্ষা করার নামে সংখ্যাগড়িষ্ঠ বাঙালী জনগোষ্ঠীর মধ্যে আধিপত্যবাদী ভাবধারার প্রসার ঘটাবার এবং তাদের মধ্যে উপজাতি বিদ্বেষী মনোভাবকে চাঙ্গা করে তোলার অপচেষ্টা চালিয়েছিল তখন সমান গুরুত্ব দিয়েই তার বিরুদ্ধে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করেছিলেন দশরথ দেব। তিনি সকলকে একথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে গণতন্ত্রকে যদি অর্থপূর্ণ করে তুলতে হয় তাহলে যারা সংখ্যাগড়িষ্ঠ তাদেরই দায়িত্ব নিতে হবে সংখ্যালঘিষ্টদের রক্ষা করার। তথাকথিত বাঙালী স্বার্থের ধুঁয়া তুলে যারা সাধারণ বাঙালী জনগণকে প্রতারিত করতে চেয়েছিল তাদের জবাব দিয়ে তিনি আরও স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে শ্রেণীবিভক্ত সমাজে ধনী ও দরিদ্রের স্বার্থ কখনও এক হতে পারে না। কাজেই উপজাতি বিদ্বেষী প্রচার চালাতে গিয়ে যারা বাঙালী স্বার্থরক্ষার দোহাই দিচ্ছে তারা আসলে গরীব অংশের বাঙালী জনগণের স্বার্থের বিপরীতে ধনী ও কায়েমী স্বার্থবাদীদের শ্রেণী স্বার্থকেই রক্ষা করতে চাইছে।

সরকারের মধ্যে অথবা সরকারের বাইরে যখন যে অবস্থানে ছিলেন সেখানে থেকেই দশরথ নিরলসভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে গেছেন যাতে জাতি- উপজাতির মৈত্রীকে শক্তিশালী করা যায় তার জন্য। আর এটা করতে গিয়ে তিনি দু'দিক থেকেই প্রতিক্রিয়াশীলদের আক্রমণের শিকার হয়েছেন। বাঙালী জাত্যভিমানীরা তাঁকে আক্রমণ করেছে বাঙালী বিদ্বেষী একজন সাম্প্রদায়িক নেতা বলে। আর অন্যদিকে সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়বাদীরা তাঁর বিরুদ্ধে আক্রমণ শানিয়েছে এই বলে যে দশরথ যদি রাজনৈতিক স্বার্থে আপোষমূলক মনোভাব না দেখাতেন তাহলে ত্রিপুরায় এত বিপুল সংখ্যক বাঙালী উদ্বাস্তুর আগমন ঘটতে পারত না এবং এ রাজ্যে বাঙালী প্রাধান্যও প্রতিষ্ঠিত হত না।

বিরুদ্ধবাদীদের এই সব মিথ্যা ও উদ্দেশ্যমূলক অপপ্রচার জনমতকে যে খুব একটা প্রভাবিত করতে পেরেছিল তা নয়। উল্টো, জাতি - উপজাতি মৈত্রীর প্রশ্নে দশরথ যে নীতি সম্মত ও বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন বাঙালী ও উপজাতি উভয় জনগোষ্ঠীর বিপুল সংখ্যাগড়িষ্ঠ অংশের মানুষের কাছ থেকে তা স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন লাভ করেছে। এমনকি রাজনীতির ক্ষেত্রে যারা তাঁর থেকে ভিন্নমত পোষণ করতেন তারাও জাতি - উপজাতি মৈত্রীর প্রশ্নে তাঁর বলিষ্ঠ ভূমিকাকে প্রশংসা না করে পারেন না। আর তাই ইতিহাসে তিনি অমর হয়ে আছেন 'জাতি-উপজাতি ঐক্যের মিলন সেতু' হিসাবে।

সরোজ চন্দ

ভাষা দরদী না, বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী ?

আগরতলার রাজনৈতিক কর্মী নামে পরিচিত কিছু লোক সম্প্রতি পাহাড়ের দুই এক জায়গায় গিয়ে ত্রিপুরা ভাষাকে লেখ্য ভাষায় রূপান্তরিত করার নাম করে উগ্রজাতিয়তাবাদী ভাব ধারা প্রচারে নেমেছেন বলে জানা যায় । তাদের এই কার্যকলাপ ত্রিপুরা জাতিকে কোথায় টেনে নিয়ে যাবে সেই কথা প্রত্যেক ত্রিপুরা ভাষাদরদীরই ভেবে দেখা প্রয়োজন। সাম্প্রদায়িক মনোভাব যুক্ত, প্রত্যেক প্রগতিশীল জনতাকে ঐ সব কুৎসাকারীদের বিভেদনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল রাখাই আমার এই লেখার উদ্দেশ্য। প্রত্যেকটি হালাম, ত্রিপুরা, বাঙ্গালী যারাই ত্রিপুরাকে সুন্দর ভাবে গড়ে তুলতে চান নিজেদের জীবনকে সুখীও প্রাচুর্যপূর্ণ করে তুলতে চান, তাদের সকলকেই এই বিষয়ে ভেবে দেখতে অনুরোধ করি।

এই কতিপয় লোক প্রচার শুরু করেছেন— ত্রিপুরাদের ভাষা, সংস্কৃতি ও রাজ্য সবই গেল। আজ বাঙ্গালীরাই ত্রিপুরার সর্বে-সর্বা। এতদিন ভরসা ছিল কমিউনিস্ট পার্টি হয়ত পাহাড়িয়াদের জন্য কিছু করবে। কিন্তু বাঙ্গালীদের প্রভাবাধীন কমিউনিস্ট পার্টি ও আজ ত্রিপুরাদের ভাষাকে উন্নত করতে, তাদের শিক্ষা প্রসারের কাজ করতে চায় না, এই সব কথা তারা প্রচার করতে শুরু করেছেন।

কাজেই, জাতি রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে বাদ দিয়ে শুধুমাত্র পাহাড়িয়াদের নিয়ে একটি স্বতন্ত্র দল গঠন করে অগ্রসর হওয়ার সময় উপস্থিত, একথা প্রচারে বাহির হয়েছেন তারা। এবং সরলমতি আমাদের পাহাড়িয়া ভাইদের বিভ্রান্ত করায় চেষ্টা নিচ্ছেন।

প্রচারকারীদের এই নীতি বিভেদকারীদের নীতি। ইহা পাহাড়িয়াদের সর্বনাশ করায় নীতি। বিভেদনীতির উপর ভর করে পার্বত্য সমাজ বাঁচতে পারে না। অন্যদের সাথে মিশে, ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম করেই তাদের জাতীয় সত্ত্বা- বজায় রাখতে হবে। ইহাই সত্যিকারের জাতি হিসাবে অগ্রসর হবার পথ।

বেশী দিনের কথা নয় মাত্র কয়েক বৎসর আগে উপদেষ্টা শ্রীজিতেন দেববর্মাদের দল পাহাড়িয়াদের স্বার্থ রক্ষার নামে এক সাম্প্রদায়িক 'ত্রিপুর সংঘ' নামে একটি সংঘ সৃষ্টি করেছিল। প্রথমে উদ্দেশ্য ছিল ত্রিপুরা থেকে 'বাঙ্গাল খেদান'। শেষ পর্যন্ত যখন কেহ তাদের এই দলে যোগ দিল না তখন তারা কংগ্রেসী শাসকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ত্রিপুরাদের ঘর পোড়ানোর কাজে অগ্রসর হন। উপদেষ্টা শ্রীজিতেন ও শ্রীমোকন্দ দেববর্মার স্বহস্তে আগুন দেয়া পোড়াবাড়ীর চিহ্ন এখনও জিরানিয়া এলাকায় গেলে পাওয়া যাবে। প্রমাণ চানত হাজার কণ্ঠ এখনই অগ্রসর হবে সাক্ষ্য দিতে।

এই 'ত্রিপুর সংঘের' নেতাদের কাজই ছিল 'বাঙ্গালী বিদ্বেষ' প্রচার করে পাহাড়িয়া প্রীতি দেখিয়ে পাহাড়িয়াদের স্বার্থে উল্টা বাঁশ দেয়া। এবং রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটিও কথা না বলা। শোষণের বিরুদ্ধে কিছু না বলা। যাদের মতলব পাহাড়িয়াদের সমতলবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের কাছ থেকে পৃথক করে রাখা। আর যে কয়জন ত্রিপুরা রাজার মোসাহেবী ঠাকুর সাহেব আছেন, তারা প্রকৃত পক্ষে ত্রিপুরা সমাজের ঘাড়ে চড়ে বসতে চান। জাতি রক্ষার কোন বালাই নেই। পরবর্তী সময়ে যখন 'ত্রিপুর সংঘে'র নেতারা জিসনিয়া অঞ্চলে গিয়ে সিপাইদের সাথে ত্রিপুরা চাষীদের ঘর পোড়ালেন তখনই তাদের ত্রিপুরা দরদীর ভূমিকা বেফাঁস হয়ে গেল।

বিভেদনীতির ভিতর দিয়ে অত্যাচারী শাসক ও শোষকদের সুবিধা করে দেয়া এবং ঐ প্রভুদের ছত্র ছায়ায় থেকে তাদের কিছু প্রসাদ লাভ করা এটাই হলো তাদের মতলব। এবং কিছুটা তারা লাভও করেছেন এই প্রসাদ।

ত্রিপুরাদের মধ্যে কমিউনিস্ট বিদ্বেষ ও বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করে যারা আজ তাদের কমিউনিস্ট পার্টি এবং গণমুক্তি পরিষদ হতে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা দল তৈরী করে, ত্রিপুরাদের স্বার্থ রক্ষা করায় চিন্তা করেন, ত্রিপুরার জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ বাঙ্গালীদের সাথে শত্রুতা করে পাহাড়িয়া জাতির সত্বা রক্ষা ও তাদের অগ্রগতির স্বপ্ন দেখেন — আমি বলব — তারা এখনো কল্পনা রাজ্যেই বাস করছেন। বাঙ্গালী সমাজ পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত কেঁচো মাটির চাক নয় যে একটু ঠেলা দিলেই নীচে গড়িয়ে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। ত্রিপুরার মাটির সাথে তাদেরও ঐতিহাসিক সম্পর্ক রয়েছে।

এইসব প্রচারকারীদের আগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ যাহাই হউক, এখন থেকে ত্রিপুরার জনতা তাদের ভাল করেই চিনতে থাকবেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, এই ধরণের লোকদের চিনবার মত বুদ্ধি এই কয় বছরের আন্দোলনে আমাদের ত্রিপুরার যথেষ্টই লাভ করেছেন। আমি এবং আমি যে পার্টিতে আছি সেই পার্টির একটি বিরাট অংশ ত্রিপুরার পাহাড়িয়াদের সন্তানদের নিয়ে গঠিত। পাহাড়িয়াদের স্বার্থ কখনও আমরা কি ভুলতে পারি? অতীতের কার্যকলাপ,জনশিক্ষার স্কুল প্রতিষ্ঠার কাজ হতে আরম্ভ করে যে সব কাজ আজ পর্যন্ত আমরা করেছি এবং পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে যে সব দাওয়া উত্থাপন করেছি — ত্রিপুরার ইতিহাসে পাহাড়িয়াদের স্বার্থ এমন করে কে কবে দুনিয়ার সামনে উপস্থিত করেছে, ত্রিপুরাকে ভারতের বুকে শ্রেষ্ঠ আসন কে কবে দিয়েছে? ত্রিপুরা ভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাদান এবং তার জন্য এখন থেকে ভাষা রিসার্চ ব্যুরো গঠনের দাবী পর্যন্ত পার্লামেন্টে উত্থাপন করা হয়েছে, ত্রিপুরা ভাষায় গান রচনা করে লক্ষ কণ্ঠে ছাড়িয়ে

দেয়া হয়েছে, পার্টি সম্মেলনে ভাষার দাবীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে দেখা হয়েছে, তবু নাকি প্রচারকারীরা বলেন — কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরা ভাষা চায় না। এই মিথ্যাবাদীদের মুখে ছাই দিয়ে আমাদের পার্লামেন্টে উত্থাপিত উপজাতীয়দের দাবী দাওয়া সমূহ।

একথা বলা যায় আমরা এখনও অনেক কাজ করতে পারিনি। বিপ্লবের আগ পর্যন্ত বহু কাজই সমাপ্ত থেকে যাবে। সেগুলি করা সম্ভব একমাত্র বিপ্লবের পরেই। সামাজিক, আর্থিক, রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হলো রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা এখনও কংগ্রেসীদের হাতে, — কমিউনিস্টদের হাতে নয়। কাজেই যা কিছু করতে না পারার জন্য কংগ্রেসীরাই সম্পূর্ণ দায়ী, কমিউনিস্টরা তা নয়। কংগ্রেসীদের অপরাধ ঢাকবার উদ্দেশ্যেই দালালরা কমিউনিস্টদের দায়ী করছে। কংগ্রেস সরকার জনতাকে যে কিছু কিছু রিলিফ দিচ্ছে তা কমিউনিস্টদের আন্দোলনের চাপেই দিতে বাধ্য হচ্ছে। আরো কঠোর সংগ্রামের মাধ্যমেই আমাদের অগ্রসর হতে হবে। কংগ্রেসকে গদিচ্যুত করতে হবে। এবং ভাষার উন্নতি সহ সকল দাবীর পরিপূর্ণতা আনতে হবে। সমস্ত জাতি উপজাতির বিভেদ নয়,বরং তাদের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই এই পরিপূর্ণতা অর্জনের অমূল্য প্রতিশ্রুতি।

উগ্র জাতীয়তাবাদীরা জাতি ও উপজাতিকে আলগা করে নিজ নিজ জাতি বা উপজাতি রক্ষার চিন্তা করে থাকেন। কিন্তু এই বাস্তব বিরোধী চিন্তাকে আমরা মনে স্থান দিই না।

আমরা একদিকে বর্ণাতীত কবল হতে পশ্চাদপদ, অবজ্ঞাও, নির্যাতিত, সবরকম রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সুযোগ সুবিধা লাভে বঞ্চিত পার্বত্য সাম্প্রদায়ের স্বার্থের কথা এক মুহূর্তের জন্যও ভুলতে পারি না — অন্যদিকে তেমনই পাহাড়িয়া ছাড়া ত্রীপুরায় যে সব বাঙ্গালী হিন্দু মুসলমান, মণিপুরি ও অন্যান্য সম্প্রদায় রয়ছেন তাদের স্বার্থ পায়ে মাড়াতে পারি না ' ইয়া কুং বাই — না গই মাঁয়য়া।"

সবার স্বার্থরক্ষা করতে হবে। একে অন্যের উপর ভর করে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অগ্রসর হতে হবে। কেও কারো সাথে শত্রুতা করে সুফল পাবে না। শোষণের বিরুদ্ধে শাসকদের জনমত গঠনের বিরুদ্ধে। তাদের বিভেদনীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামই হবে আমাদের বিভিন্ন জাতি ও উপজাতির সত্বা রক্ষার এবং ইহাকে আরও সঞ্জীবিত করে তোলার সংগ্রাম। শত্রুদের বিরুদ্ধে মিলিত সংগ্রাম না করে নিজেদের মধ্যে বিভেদনীতি জীইয়ে রাখা — একে অন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করা হবে আত্মঘাতী নীতি।

কংগ্রেসের দুর্নীতি পরায়ন শাসন ব্যবস্থা, তার চিফ কমিশনারী শাসন ব্যবস্থা, তার তাবেদার উপদেষ্টা পরিষদ এবং তাদের অনুসৃত বিভেদনীতিই হলো ত্রিপুরার প্রগতির শত্রু। এদের ঝাঁটিয়ে দূর করতে হবে ত্রিপুরা থেকে।

আমাদের পাহাড়িয়াদের নিজেদের মধ্যে আরো লৌহ-দৃঢ় একতা গড়ে তুলতে হবে অন্যদের ও দলে টানতে হবে। শুধু বাইরের একতাই যথেষ্ট নয় চিন্তা জগতের একতাকে আদর্শগত সংগ্রামের ভিতর দিয়ে আরো মজবুত করতে হবে। এইভাবে গড়ে উঠা সম্মিলিত শক্তি শত্রুদের প্রত্যেকটি জনবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে যাদুমন্ত্রের মত কাজ করবে।

(ত্রিপুরার কথা ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা ১৯ মে, ১৯৫৪)

কেন আমরা বকেয়া খাজনা মকুব চাই

ত্রিপুরার এক বিরাট সংখ্যক কৃষক পরিবার গত ৫/৬ বৎসর ধরিয়া সরকারী খাজনা একদম দিতে পারে নাই। কাহারও কাহারও ১০/১২ বৎসরের খাজনাও বাকী পড়িয়াছে বলিয়া জানা যায়। এরূপ বকেয়া খাজনা জমিয়া থাকাটা কৃষকদের পক্ষে মারাত্মক। এক বৎসরের খাজনা বকেয়া পড়িলেই পরের বৎসর তাহা পরিশোধ করা কৃষকদের পক্ষে অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হইয়া দাঁড়ায়।

কেন খাজনা বকেয়া হয়? ইহার কারণ অতি সুস্পষ্ট। কৃষকদের আর্থিক সংকটই এই সব কৃষকদের খাজনা জমিয়া থাকার মূল কারণ। ভারত বিভগের পর হইতে এই সংকটের পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পায়। কৃষি অর্থনীতিতে দারুণ সংকট দেখা দেয়। এই সংকট বাড়িতে বাড়িতে আজ এমন এক জায়গায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে যে কৃষকদের পক্ষে এই 'বকেয়া' খাজনা আদায় করাত দূরের কথা তাঁহারা নিজেদের বাঁচার পথই পাইতেছে না।

পাক - ভারত বাণিজ্য সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যাওয়ায় কৃষকদের আয়ের পথ অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছে। ভারত বিভাগের পূর্বে ত্রিপুরার কৃষকদের আয়ের প্রধান প্রধান পথ ছিল কৃষিজাত ধান, চাউল, পাট ও কার্পাস বিক্রয়। তাহা ছাড়া আয়ের আর একটা প্রধান পথ হইল, বনজাত দ্রব্যাদি বিক্রয় যেমন বাঁশ, বেত, ছন, কাঠ ইত্যাদি। তাহাছাড়া বিভিন্ন বিভাগে বিভিন্ন রকম ফসল বিক্রয় হইত। সদর বিভাগে আনরস, খোয়াই এ সরিষা, কমলপুর, কৈলাশহর এবং ধর্মনগর বিভাগে গুড় ইতাদি বিক্রয় করিয়া কৃষকেরা টাকা রোজগার করিতে পারিতেন। কিন্তু পাক - ভারত বাণিজ্য বন্ধ হইবার ফলে কৃষকদের এই আয়ের পথ সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

গত ৪/৫ বৎসর যাবত সময় মত বৃষ্টি না হইবার ফলে জমিতে ঠিকমত ফসল উৎপাদন করা যায় নাই কিংবা যাহাও ফসল করা হইত তাহাও অসময়ে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের ফলে প্রচুর পরিমাণে ফসল নষ্ট হইয়াছে। ফলে দেশে খাদ্য কমিয়া গিয়াছে। এই বৎসরও প্রবল বৃষ্টিপাতের ফলে কৃষকদের প্রভূত ক্ষতি সাধিত হইয়াছে সন্দেহ নাই।

সরকারী পুলিস মিলিটারী হামলাও এই খাদ্য উৎপাদনে যথেষ্ট বাঁধা সৃষ্টি করিয়াছে। গত ১৯৪৮ ইং হইতে ১৯৫১ ইং পর্যন্ত ত্রিপুরার বিভিন্ন বিভাগে পুলিশ মিলিটারীর অবাধ রাজত্ব চলে। এই হামলা বিশেষভাবে চালানো হয় খোয়াই, সদর এবং কমলপুরের উপজাতীয় কৃষকদের উপর। কৃষকদের ঘর বাড়ী পোড়াইয়া দেওয়া, তাহাদের হালের বলদ টানিয়া আনা, তাহাদের ঘর লুট-পাট করিয়া ঘরের কাপড় চোপড়, হাঁস, মোরগ, শূকর, টাকা পয়সা জোর করিয়া টানিয়া আনা, জনগণকে নারী - পুরুষ নির্বিশেষে মার-পিট ও ধর-পাকড় ইত্যাদি কাজ চালাইয়া ঐসব অঞ্চলে এক বিভীষিকার রাজত্ব সৃষ্টি করা

হইয়াছিল। কৃষিকার্য ছাড়িয়া কৃষকদের বনে লুকাইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ফলে তাহারা মোটেই গৃহস্থী করিতে পারে নাই। সরকারী এই দমন নীতি ও কৃষকদের অবস্থা সাংঘাতিকভাবে অবনতি ঘটাইবার একটি বড় কারণ।

আরও একটি কারণ হইল গত ১৯৪৮ ইংরেজীতে খোয়াই এবং সদর বিভাগে দারুণভাবে গো মড়ক দেখা দেয়। এই গো মড়কে সেই বৎসর একমত্র খোয়াই বিভাগেই দেড় হাজার হালের বলদ মারা গিয়াছিল। সদর ও অন্যান্য বিভাগেও এই রোগে শত শত হালের গরু ও মহিষ মারা গিয়াছিল।

এই সব কারণেই ত্রিপুরার কৃষকদের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং দারুণ খাদ্য সংকট দেখা দেয়। ১৯৫১ ইংরেজীর প্রথম ভাগে সমগ্র খোয়াই বিভাগে দারুণ খাদ্যাভাব দেখা দেয়। শত শত মানুষকে বনের মুখী, বাঁশের করুল খাইয়া জীবন যাপন করিতে হইয়াছিল। বহুলোক অনাহারে মরিয়াছে। সেই বৎসরে এই খাদ্যাভাব সদর বিভাগেও চরম হইয়া উঠিয়াছিল। অনুরূপভাবে অন্যান্য বিভাগে খাদ্যাভাব দেখা দিয়াছিল।

১৯৫৩ ইংরেজীতে এই খাদ্যাভাব সমগ্র ত্রিপুরায় দেখা দেয়। সেই বৎসর হাল কৃষক, জুমিয়া কৃষক এবং অনেক উদ্বাস্তু অনাহারে মারা যায়।

এইভাবে অনবরত প্রতি বৎসর খাদ্য সংকটে ও দুর্ভিক্ষের কবলে পড়িয়া ত্রিপুরার কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হইয়া পড়িয়াছে। সরকারী খাজনাও দিতে পারে নাই।

কিন্তু সরকারের তরফ হইতে প্রচার করা হয় যে কৃষকরা ইচ্ছা করিয়াই খাজানা দেয় নাই। এইভাবে অপপ্রচার করিয়া জনসমক্ষে ত্রিপুরার কৃষকদের হেয় প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা অনবরত চালান-হইতেছে।

ত্রিপুরা সরকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, শ্রমিক ও অন্যান্য শ্রেণীর জনগণের কাছে কৃষকদের এই বাস্তব অবস্থা গোপন রাখিয়া অবাধ শোষণ চালাইয়া যাইবার জন্যই এইরূপ অপপ্রচারে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে।

সম্প্রতি ধান চাউলের দাম কমিয়াছে। অথচ সেই অনুপাতে নিত্য ব্যবহার্য জিনিষ পত্রের দাম না কমিয়া — বরং দাম আরো বৃদ্ধি পাইয়াছে। ফলে কৃষকদের অবস্থা আরও খারাপ হইয়াছে। কাজেই বর্তমানে কৃষকদের পক্ষে আর বকেয়া খাজনা দেওয়া মোটেই সম্ভব নয়।

এখন ত্রিপুরার সংকটাপন্ন কৃষক সমাজকে বাঁচাইতে হইলে ত্রিপুরা সরকারের পক্ষে এক মুহূর্তও বিলম্ব না করিয়া নিম্ন লিখিত কাজে হাত দেওয়া অবশ্য কর্তব্য —

১) বর্তমানে নতুন নতুন জমি অবাদে আনিয়া দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি করার দিকে এখনো সরকারের কোন নজর নাই। ছোট ছোট জল সেচের ব্যবস্থা করিয়া নতুন নতুন জংলা ভূমি আবাদে আনিয়া খুব বাড়াবাড়ি না করিয়া সমস্ত কৃষকদের কৃষিঋণ দিয়ে তাহাদের বাঁচাইতে হইবে। জঙ্গলা ভূমি আবাদে আনিয়া জুমিয়া ও উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন দিতে হইবে।

২) কৃষকদের অনুকূলে ভূমি সংস্কার আইন চালু করা হইতেছে না। বরং জন বিরোধী বন আইন চালু করিয়া কৃষক নিধন যজ্ঞের আয়োজন অগ্রসর হইতেছে। নতুন নতুন ট্যাক্সের বোঝা কৃষকদের ঘাড়ে চাপানো হইতেছে। ইজারা প্রথা কিছু মাত্র কমে নাই। বরং এই ইজারার টাকার অঙ্ক আরও বাড়িয়াছে। গত বৎসরেও তেলিয়ামুড়া বাজারের ইজারাদারগণ ছাগল প্রতি এক আনা আদায় করিতেন। কিন্তু বর্তমানে প্রতি ছাগলের জন্য বিক্রেতাকে চারি আনা দিতে হয়। এই সংকট সমাধানের দিকে সরকারের কোন দৃষ্টি নাই।

সরকার হইতে কৃষিঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা না থাকায় আত্মরক্ষা করার জন্য বাধ্য হইয়া কৃষকদের সুদখোর মহাজনদের কাছ হইতে দাদন লইতে বাধ্য হইতেছে। সরকার হইতে সত্বর কৃষিঋণ দিয়া তাহাদের বাঁচানো দরকার।

৩) বকেয়া খাজনা মুকুবের জন্য এই বৎসর ত্রিশ হাজারের উপর দরখাস্ত দাখিল করা হইয়াছে। এবং কৃষি ঋণের জন্য কুড়ি হাজারের মত আবেদন পত্র দাখিল করা হইয়াছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত 'বিবেচনা করা হইবে' সরকার ঘোষণা দিয়াই নীরব রহিয়াছেন। কোন সরকারী ব্যবস্থা করিতেছেন না।

৪) ভারতের অন্যান্য প্রদেশে তমাদী আইন চালু হইলেও ত্রিপুরার সরকারী খাস ভূমিতে এই আইন চালু করা হয় নাই।

৫) এমনকি ত্রিপুরায় কিছু সংখ্যক তালুকদার ও জোতদারগণ এই সংকটের মুখে কৃষকদের দুরবস্থার কথা উপলব্ধি করিয়া বকেয়া খাজনা মুকুব করিয়া দিয়াছেন। অথচ বড় জমিদার সরকার এখনো বকেয়া খাজনা মুকুবের কথা চিন্তা না করিয়া কৃষকদের জমি নীলাম করার জন্য নোটিশের পর নোটিশ জারী করিতেছেন। কোথাওবা আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছেন।

সরকার হইতে প্রচার করা হইয়া থাকে যে কমিউনিস্টদের প্ররোচনার জন্যই কৃষকরা খাজানা দিতেছেন না।

কথা হইল ধর্মনগর, উদয়পুর, সোনামুড়া বিভাগ প্রভৃতিতে গত নির্বাচনের আগে কৃষকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী প্রভাব ছিল কংগ্রেসীদের। কিন্তু তখন হইতেই সেই সব বিভাগেও কৃষকদের খাজানা বকেয়া পড়িয়াছে। তবে তাহারা কংগ্রেসের প্ররোচনাতেই খাজানা দেওয়া বন্ধ করিয়া দিয়েছেন।

আসল কথা হইল কাহারো প্ররোচনার কথা নয়। ক্রমবর্দ্ধমান অর্থসংকটে ত্রিপুরার কৃষকদিগকে এইরূপ চরম দুরবস্থার মধ্যে ঠেলিয়া দিয়াছে এবং দিতেছে যে তাদের পক্ষে আর সরকারী খাজানা আদায় করা মোটেই সম্ভব নয়। বিশেষত সম্প্রতি ধানের দর কমিয়া যাওয়ায় অথচ অন্যান্য নিত্য ব্যবহার্য জিনিসের দাম না কমায় এই সংকট আরো গভীর আকার ধারণ করিয়াছে। ইহা একটি সাধারণ সংকট নয় — ইহার গভীরতা অনেক।

এইরূপ অবস্থায় আমরা আশা করি সরকার অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্তে না গিয়া যে

সমস্ত নীলাম নোটিশ জারী করা হইয়াছে তাহা প্রত্যাহার করুণ। এবং বকেয়া খাজানা আদায় স্থগিত রাখুন।

ত্রিপুরার সমস্ত গণতান্ত্রিক ও বাস্তববাদী জনগণ এই সংকটের মুখে কৃষকদের এই বকেয়া খাজনা মুকুব, জমি হইতে উচ্ছেদ না হইবার এবং সরকার হইতে কৃষিঋণ পাওয়ার দাবী সমর্থন করিবেন। ত্রিপুরার মূল অর্থনীতি হইল কৃষি অর্থনীতি। কৃষকদের অবস্থার উন্নতি হইলেই ত্রিপুরার জনতার অন্যান্য অংশের অবস্থা অপেক্ষকৃত ভাল হইবে।

(ত্রিপুরার কথা, ৪র্থ বর্ষ - ১৬শ সংখ্যা ১৫ই ভাদ্র - ১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৪ ইং)

বুনিয়াদী শিক্ষার পদ্ধতি

"রাম রজ্যের" উপাসক কংগ্রেস মহারথীদের বহুল প্রচারিত মেকী "বুনিয়াদী শিক্ষার" অসারতার কথা চলতি সনের (১৯৫৪ ইং) ত্রিপুরার কথার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত আমার 'ত্রিপুরার শিক্ষা ব্যবস্থা ও বুনিয়াদী শিক্ষা' শীর্ষক প্রবন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইয়াছে। এই গান্ধী মার্কা 'বুনিয়াদী শিক্ষা' ভারতের সমাজকে কোন দিকে ঠেলিয়া দিতে চায়, ত্রিপুরায় এই শিক্ষা প্রবর্তনের চেহারা কি সেই সম্পর্কেও কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে সেই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে। আলোচ্য প্রবন্ধে কি ধরণের 'বুনিয়াদী শিক্ষা' প্রবর্তন বিষয়ে ক্ষানিকটা আলোচনার অবতারণা করিব।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা এমন ছাঁচেই গড়িয়া তোলা দরকার যাহা দেশে উন্নত ধরণের যন্ত্রপাতির সাহায্যে অর্থনীতি, শিল্প ও সংস্কৃতি গড়িয়া তুলিতে সাহায্য করে। সমাজকে পেছনের দিকে ঠেলিয়া না দিয়া বা যে স্তরে আছে সেই স্তরেই আবদ্ধ না রাখিয়া সামনের দিকে অগ্রসর হইতে সাহায্য করে। ইহাই হইবে শিক্ষা ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য।

ইহাই যদি শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য হয় তবে নিঃসন্দেহে বলিব ভারত সরকারের অনুসৃত বর্তমান বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি সেই কর্তব্য যথাযথ পালনে কেবল অপারগ নয়, সেই আদর্শের বিশ্বাসঘাতকতা করিতেছে। সুক্ষ্মভাবে বিচার বিবেচনার অপেক্ষা রাখে না, স্থূল দৃষ্টিতেই অতি সহজে ধরা পড়ে — তাহাদের এই চরকা কেন্দ্রীক শিক্ষা পরিকল্পনা আধুনিক যন্ত্রপাতির সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কত অসহায়। অগ্রসর দেশ সমূহে যেখানে আনবিক শক্তির সাহায্যে দেশের উৎপাদন ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার মহৎ প্রচেষ্টা চলিতেছে সেখানে এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে আঁকড়াইয়া থাকার পরিকল্পনা কত নিরর্থক, কত হাস্যস্পদ।

আরও বেশী আপত্তিজনক ও মারাত্মক হইল এই শিক্ষা কেন্দ্র গড়িয়া তোলার ক্ষেত্র নির্বাচন। তাহারা প্রথমেই বাছিয়া নিয়াছেন যেখানে সাধারণভাবে লিখন, পঠন এবং গণিত, ভূগোল, বিজ্ঞান বিষয়ে সাধারণ প্রাথমিক জ্ঞান লাভেরও সুযোগ নাই এমন সব এলাকা - গ্রাম বা বস্তিগুলিকে। ঐসব জায়গাতে প্রয়োজন ছিল প্রাথমিকভাবে তাহাদের আক্ষরিক জ্ঞানের সাথে পরিচয় করান, লিখন পঠন শিক্ষাদান করা। ভূগোল, বিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি কতগুলি মৌলিক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞান বিতরণের ব্যবস্থা করা। কিন্তু তাহা উপেক্ষা করিয়া কংগ্রেসী শাসকগবর্গ ঐসব এলাকাতেই প্রথমে গান্ধী মার্কা 'তকলী' শিক্ষার কেন্দ্র গড়িয়া তুলিতে চান। গ্রামবাসীরা যাহাতে নিজেদের পারিপার্শ্বিক সীমা লঙঘন করিয়া খোলস মুক্ত হইয়া অগ্রসর হইয়া আসিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা এইস্থানগুলি নির্বাচন করিয়া লইতেছেন। ধীরে ধীরে শহরের দিকে রওয়ানা দিবেন এই মহারথীরা। গ্রামে সর্বত্র আজ যে গণজাগরণের ঢেউ উঠিয়াছে তাহাতে শাসকবর্গ শঙ্কিত। গান্ধী মার্কা 'চরকায় সূতা

কাটা', মাটীর পুতুল বা বাঁশ বেতের টুকরী, দোলনা বাননোর কাজে ডুবাইয়া রাখিয়া দেশবাসীর জ্ঞাণ লাভের এই তীব্র পিপাসাকে তাহারা নিবারণ করিতে চান। গণজাগরণ রুখিবার জন্য 'বালির বাঁধ' তৈয়ার করিতে চান। তাহাদের এই প্রচেষ্টাকে "ক্রন্দনরত শিশুকে মাতৃস্তনের বিনিময়ে আঙ্গুলের অগ্রভাগ চুষিতে দেওয়া" – ত্রিপুরা ভাষায় প্রচলিত এই প্রসিদ্ধ প্রবাদের সাথে তুলনা করা চলে।

একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবেন তাহাদের প্রাথমিক চেষ্টা কোন জায়গায় বেশী তোড়জোর চলিতেছে। বুনিয়াদী স্কুল গড়ার প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসাবে আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যের যতগুলি স্কুলে দা, কোদাল, খন্তা, কাঁচি পাঠান হইয়াছে, সবগুলি স্কুলের অবস্থানই কোনটি উপজাতি অধ্যুষিত পাহাড় অঞ্চল, কোনটি মজুর বস্তিতে বা শিক্ষার কম আলোক প্রাপ্ত সমতল ভূমির গ্রামাঞ্চলে। অর্থাৎ যেখানে বেশী সংখ্যক চাষী মজুররা থাকনে। ত্রিপুরার বেশীরভাগ স্কুলই পাহাড় অঞ্চলে অবস্থিত, যেগুলিকে বুনিয়াদী স্কুলে উন্নীত করার জন্য সরকার বিশেষ সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন।

কেন এই প্রচেষ্টা? ইহাতে সরকারের কোন বিশেষ গোপন স্বার্থ লুক্কায়িত আছে কি? নিশ্চয়ই আছে। এই মেকী বুনিয়াদী শিক্ষার প্রবর্তনের মূলে শাসকবর্গের অন্তর্নিহিত অপ্রকাশিত কথাই হল চাষী মজুর ও পাহাড়িয়া ছেলে মেয়েরা, তোমাদের বেশী উচ্চশিক্ষার প্রয়োজন কি? সাধারণভাবে আলু বেগুনের ক্ষেতচাষ প্রাণালী, বাঁশ বেতের ছোট-খাটো কাজ, কাঠের মোটা কাজ, আর কয়েক লাইন "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম" গান শিখিলেইত যথেষ্ট। ইহাই কংগ্রেসী মার্কা রাম রাজত্বের মহাপ্রসাদ। ইহাই তোমাদের প্রাপ্য। ইহাতেই সন্তুষ্ট থাক।

তাই আমরা নিঃসন্দেহেই বলিব ইহা বুনিয়াদি শিক্ষার নামে দেশবাসীর প্রতিভা বিকাশের দ্বার রুদ্ধ করা, সমাজকে খোলস মুক্ত না হইতে দেওয়া, শিক্ষার অগ্রগতিকে বাধা দিয়া শিক্ষা সঙ্কোচন করা।

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শ কি হওয়া উচিত

বুনিয়াদী শিক্ষার মূল আদর্শ হইল দেশের কোটি কোটি মানুষের মৌলিক বিষয়ক যেমন, ভূগোল, গণিত, বিজ্ঞান, সঙ্গীত প্রভৃতি বিষয়ে পরিপূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত জ্ঞানের সহিত উৎপাদনশীল শ্রম ও শরীর চর্চ্চার সমর্থন সাধন করা। সৃষ্টিশীল প্রতিভা সম্পন্ন অংসখ্য মানব গোষ্ঠী সৃজন করা যাহারা তাহাদের স্কুল কলেজের শিক্ষার সাথে ঐসব উৎপাদনশীল শ্রমের সমন্বয় সাধন করিয়া সমাজ, দেশ ও নীতিকে উন্নত শিখরে লইয়া যাইতে পারেন।

এই মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে হইলে আমাদের দেশের শিক্ষা পদ্ধতির আমূল সংস্কার করা অত্যাবশ্যক। বর্তমান শিক্ষা পদ্ধতি যে বহুল ত্রুটীপূর্ণ, সে বিষয়ে বলাই বাহুল্য।

শিক্ষার্থীদের উল্লিখিত মৌলিক বিষয়ে প্রাথমিক জ্ঞানদানের জন্য কতকগুলি নিয়ম

করা উচিত। কারণ, ঐসব মৌলিক বিষয়ে প্রয়োজনীয় প্রাথমিক জ্ঞানদানের আগে কাওকে কোন বিশেষ ব্যবহারিক বিষয়ে পারদর্শী করিয়া গড়িয়া তোলার কথা বাতুলতা মাত্র।

প্রথমত, চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত স্কুলে বালক বালিকাদের ভূগোল, গণিত, শরীর বিজ্ঞান, বিজ্ঞান ও সাহিত্য প্রভৃতি মৌলিক বিষয়ক প্রাথমিক জ্ঞান দিতে হইবে এবং তাহা সম্পূর্ণ সরকারী ব্যয়ে ও বাধ্যতা মূলকভাবে দিতে হবে।

এই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা সমাপ্ত হইলে শিক্ষার্থীদের অন্য যে কোন ব্যবহারিক বিষয়ে উন্নত ধরণের শিক্ষালাভ করার মত একটা প্রাথমিক ভিত্তি রচিত হইবে। অতঃপর শিক্ষার্থীদের পছন্দ মত বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, ইঞ্জিনীয়ারিং বা কৃষি বিষয়ক যন্ত্রপাতি ব্যবহার, চিকিৎসা বিদ্যা আরও অন্যান্য উন্নত ধরণের ব্যবহারিক বিষয়ে জ্ঞান লাভের সুযোগের ব্যবস্থা রাখিলে সেই শিক্ষা দেশের আরও বেশী কাজে ব্যবহৃত হইতে পারিবে। সর্বাঙ্গীণ সুন্দর দেশকে শিল্প, বাণিজ্য, সংস্কৃতিতে, অর্থনীতিতে সমৃদ্ধশালী করিয়া গড়িয়া তুলিতে সহজ ও সুগম হইবে।

কিন্তু গান্ধীর বুনিয়াদী শিক্ষার মূল কথা কি ? তাহার শিক্ষা পদ্ধতিতে বলা হইয়াছে -- ঐসব মৌলিক বিষয় বস্তুর জ্ঞানলাভ পরে। প্রথম হইল -- সূতা কাটা, পুতুল বানান। ইহারই মাধ্যমে অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান দানের জন্য সম্ভাব্যনুযায়ী চেষ্টা করা। মুখ্য হইল পুতুল বানান ও সূতা কাটা। গৌন হইল মৌলিক বিষয়ের জ্ঞানার্জন।

আরও বেশী মারাত্মক হইল ৪/৫ বৎসর বয়সের বালক বালিকাদের প্রথমেই বলা হইত আগে রাষ্ট্রের জন্য পরিশ্রম কর, রাষ্ট্রকে আর্থিকভাবে সাহায্য কর। রাষ্ট্রের নিকট হইতে পাওয়ার কথা পরে। তাই তাহার আত্মনির্ভরশীল বুনিয়াদী শিক্ষার আদর্শ হইল -- রামায়ণ, মহাভারত বা আরো আদিম যুগের 'আশ্রম বিদ্যালয়' প্রবর্তন করা। এ একটা স্থলে বহু ছাত্র-ছাত্রী থাকিবে। তাহারা খেলনা, কাপড় ইত্যাদি আরও নানাবিধ জিনিষ প্রস্তুত করিয়া বাজারে বিক্রয় করিবে। আলু, বেগুনের চাষ করিয়া ফসল -- বিক্রয় করিবে এবং তাহাতে আয় হইবে, সেই আয় হইতে স্কুলের খরচ চলিবে।

আগেই ট্যাক্স নয়, আগে শিক্ষার জন্য ব্যয় কর

এই ব্যবস্থা প্রকারান্তরে শিশুদের উপর ট্যাক্স বসান। শিশুদের কাছ হইতে টাকাত আদায় করা যাইবে না, কাজেই তাহাদের শ্রমটাই গ্রহণ করা হউক। যাহা পাওয়া যায় তাহাই লাভ। শিশুদের দ্বারা রোজগার করাইয়া স্কুল পরিচালনা করার গান্ধিজীর এই "বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতির" খোলাখুলি অর্থ করিলে এই দাঁড়ায়। পি আর নাম্বিয়ার তাহার "বুনিয়াদী শিক্ষা" শীর্ষক প্রবন্ধে ঠিকই বলিয়াছেন "রাম রাজ্যের উপাসক" গান্ধীজী বিখ্যাত কবি কালিদাসের 'রঘু বংশম' কাব্যের মূল্যবান শ্লোকটি ভুলিয়া গিয়াছেন। ইহাতে মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন -- "রাজাই (অর্থাৎ রাষ্ট্র) রাজ্যের সমস্ত নর-নারীকে রক্ষা করা,

তাহাদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা এবং শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করার জন্য দাসী। শিশু ভূমিষ্ঠ হইবার সাথে সাথেই সেই নবজাত শিশুটির প্রতি মাতা-পিতার দায়িত্ব শেষ হইয়া যায়। সেই দায়িত্ব গিয়া গড়ায় রাজা বা রাষ্ট্রের উপর।"

কালিদাসের এই মহা মূল্যবান কথা বাদ দিলেও সাধারণভাবে যাহা দেখি তাহাতে কি দেখা যায়? দেখা যায় — নবজাত শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই স্তন্যপান করাইয়া মাতা উহাকে রক্ষা করেন। কোন শিশুর মা প্রথমেই নবজাত শিশুর সঙ্গে শর্ত করেন না যে পারিশ্রমিক কিছু দাও নতুনবা দুধ খাওয়ান হইবে না। কিন্তু কংগ্রেসী শাসকরা আজ নিলর্জ্জ হইয়া উঠিয়াছেন যে, শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষাদানের উপর শর্ত আরোপ করিতেছেন। শ্রম দাও রাষ্ট্রের জন্য — নতুবা শিক্ষা মিলিবে না।

কমিউনিস্ট পার্টি প্রকৃত বুনিয়াদী শিক্ষার বিরোধী নয়

একথা আজ সর্বত্র প্রচার করা হইতেছে যে কমিউনিস্ট পার্টি বুনিয়াদি শিক্ষা চায়না, তাহারা ইহার ঘোর বিরোধী। এই কথাটি মোটেই সত্য নয়। কমিউনিস্ট পার্টি প্রত্যেকটি জিনিষেরই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি-ভঙ্গী বিশ্লেষণের পক্ষপাতি। কমিউনিস্ট প্রকৃত বুনিয়াদী শিক্ষা প্রবর্তনের শুধু পক্ষেই নয়, তাহারা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া আসিতেছে এবং সাফল্যলাভ না করা পর্যন্ত আরো চালাইয়া যাইতে কৃত সংকল্প। তবে একথা অতীব সত্য যে বর্তমানে যে ধরণের বুনিয়াদী শিক্ষা সরকার চালু করিতে চাহিতেছেন, কমিউনিস্ট পার্টি এই ধরণের বুনিয়াদী শিক্ষা দেশে প্রবর্তনের ঘোর বিরোধী। এবং ইহার বিরুদ্ধে সক্রিয়ভাবেই বিরোধিতা করিতে থাকিবে। কারণ গান্ধী মার্কা এই বুনিয়াদী শিক্ষার মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি ভারতের সমাজ অগ্রগতি সম্ভাবনা দেখেন না। যে যুগে মানব কল্যাণে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে আনবিক শক্তির ব্যবহারের পরীক্ষা চলিতেছে সেই যুগে চরকা কেন্দ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়া প্রাচীন যুগের গ্রামমুখী কুটীর শিল্পের উপর বেশী প্রাধান্য দিতে কমিউনিস্ট পার্টি চায় না। কুটির শিল্পের প্রসার হোক তাহা কামিউনিস্টরাও চায়। কিন্তু যন্ত্রকে বাদ দিয়া কেবল হস্ত নির্মিত কুটীর শিল্পের উপর দাঁড়াইয়া জাতি বা দেশ গঠনের স্বপ্ন কমিউনিস্ট পার্টির নাই। আদিম যুগের ক্ষয়িষ্ণু প্রাচীন গ্রাম্য সমাজ ব্যবস্থাকে জীয়াইয়া রাখার নামে বৈজ্ঞানিক যুগের অগ্রগতির প্রতি কমিউনিস্টরা নিজেদের চোখ ঢাকা দিয়া থাকিতে পারেন না।

এই গান্ধীমার্কা মেকী বুনিয়াদী শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তনের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে দেশের অগণিত জনগণও এই সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টির সাথে এক সঙ্গে আসিয়া দাঁড়াইবেন সেই দৃঢ় বিশ্বাস কমিউনিস্ট পার্টির আছে।

(ত্রিপুরার কথা, ৪র্থ বর্ষ - ২৯শ সংখ্যা ৬ই পৌষ - ২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৪ ইং)

লোকসভায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট সংক্রান্ত বক্তব্য

১৭ ডিসেম্বর,১৯৫৫

এটা খুব ভাল কথা যে আমরা এস আর সি রিপোর্ট (রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের রিপোর্ট) আলোচনা করছি। প্রথমেই আমি অবশ্যই বলব যে ত্রিপুরা সম্পর্কে এস আর সি'র প্রস্তাবে খুব সাংঘাতিক কথা বলা আছে। আমার জানা আছে যে ত্রিপুরাতে দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবী খুব একটা নতুন কিছু নয়। অনেকদিন ধরে ত্রিপুরার জনগণ এই দাবী করে আসছেন। এমনকি এই সভাতেও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আশ্বাস দিয়েছেন যে, কোন রকমের একটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে; এবং কমিশনের রিপোর্ট আসা পর্যন্ত আমাদের অপেক্ষা করতে বলেছেন। রিপোর্ট আসার পর দেখছি দায়িত্বশীল সরকার তো দূরের কথা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবেই ত্রিপুরার অস্তিত্বকে অস্বীকার করা হয়েছে। কমিশনের প্রস্তাব ত্রিপুরার জনগণের পক্ষে শুধু ক্ষতিকারকই নয় — এতে ত্রিপুরার জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকারকেই অস্বীকার করা হয়েছে। একই সঙ্গে ভাষাভিত্তিক বিভাজনের যে পদ্ধতি রাজ্য পুনর্গঠনের সময় কমিশনের অনুসরণ করা উচিত তা কিন্তু এখানে স্পষ্টভাবে লংঘিত হয়েছে। এই সভায় আমি জোরের সঙ্গেই বলতে চাই যে ত্রিপুরার মানুষ আসামের সঙ্গে যুক্ত হবার প্রবল বিরোধী। আমার হাতে কয়েকটা টেলিগ্রাম আছে। এমনকি রাত্রে আমি ঘুমাতেও পারি না কারণ দিন রাত সবসময়ই অজস্র টেলিগ্রাম আসছে- প্রত্যেকটি টেলিগ্রামে লেখা আছে "আমরা সংযুক্তি চাই না; আমরা নিজেদের বিধানসভা সহ আলাদা রাজ্য চাই'। এটা শুধু আমার দাবী নয়, এটা কংগ্রেস, কম্যুনিষ্ট পার্টি, পি এস পি, কিষাণ মজদুর দল এবং ত্রিপুরার অন্যান্য সমস্ত রাজনৈতিক দলের দাবী। জনজীবনের সবরকম উপাদানই আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে। সম্মানিত এই সভার প্রতি আবেদন আপনারা ত্রিপুরার মানুষের ইচ্ছাটা যাচাই করে দেখুন — তারপরে যাহোক একটা সিদ্ধান্তে আসুন। আমি নিশ্চিত যে আপনারা যদি ত্রিপুরায় গিয়ে মানুষকে জিজ্ঞেস করেন তবে তাদের বেশীর ভাগই আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযুক্তির বিরুদ্ধে তাদের মত দেবেন। আমি জানি না এমন একজন ও আছেন কিনা যিনি এই সংযুক্তিকে সমর্থন করবেন। সংযুক্তির সপক্ষে কমিশন যেসব যুক্তি দিয়েছেন সে সবের আগে আমি ত্রিপুরা সম্পর্কে কিছু কথা বলতে চাই যা সযত্নে বিবেচনা করা দরকার। আমরা আমাদের স্মারকলিপিতে আগেই বলেছি —

"কমপক্ষে ১৩৬৫ বছর ধরে ত্রিপুরা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবে অস্তিত্ব বজায় রেখেছে (বর্তমান ত্রিপুরাব্দ হচ্ছে ১৩৬৫)। এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে ত্রিপুরা তার নিজস্ব সংস্কৃতি গড়ে

তুলেছে। যদিও প্রায় একশ বছর ধরে রাজ্যের আদালতের ভাষা হচ্ছে বাংলা .... তবু ত্রিপুরার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাংলার সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সঙ্গে পুরোপুরি এক ও অভিন্ন বলে মনে করলে ভুল হবে।"

কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছে যে আসামে যেহেতু বেশ কিছু বাঙালী আছেন সেজন্য ত্রিপুরা যদি আসামের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে ত্রিপুরার বাঙালীরা আসামের বাঙালীদের সঙ্গে মিশে যাবেন এবং তার ফলে তাদের স্বার্থ সুরক্ষিত হবে। আমি এখানে বলতে চাই যে ত্রিপুরাতে শুধু বাঙালী নয়, বেশ ভালো সংখ্যক উপজাতি মানুষ ও রয়েছেন। ত্রিপুরা উপজাতিদের রাজ্য। আমরা স্মারকলিপিতে বলেছি —

"১৯৪৭ এর কয়েক দশক আগে ও রাজ্যে ত্রিপুরার উপজাতি মানুষেরাই ছিলেন সংখ্যাগুরু এবং তারাই ত্রিপুরার বিশেষ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন।"

বলা হয়েছে যে দেশভাগের পর বাঙালীরা সংখ্যাগুরু হয়েছে। স্মারকলিপিতে আছে —

" ১৯৫১ সালের জনগণনা সূত্র উদ্ধৃত করে কমিশন দেখিয়েছেন ত্রিপুরার জনসংখ্যা ৬৩৯,০২৯— কিন্তু তা সঠিক নয়। জনসংখ্যা ৯ লক্ষের মত। বাস্তুহারারা ক্রমাগত অনুপ্রবেশ করছে এবং জনসংখ্যা বাড়ছে।

"এমনকি ১৯৪৯ এ ভারতভুক্তির পরে ও ত্রিপুরা 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে তাব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

"ত্রিপুরার অর্থনীতিতে ও ছিল তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের ছাপ ....দেশভাগের ফলে রাজ্যের গোটা অর্থনীতি বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ত্রিপুরার যে বাণিজ্য ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল পূর্ব পাকিস্তানের (যা প্রায় সমস্ত ত্রিপুরাকে বেষ্টন করে আছে) সঙ্গে দেশভাগের ফলে তা মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে।

"পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত বাস্তুহারাদের সংখ্যা ত্রিপুরার জনসংখ্যার অর্ধেকের চাইতেও বেশী। ত্রিপুরার অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের প্রশ্নটি সেজন্যই এইসব শ্রমজীবী মানুষের পুনর্বাসনের দায়িত্বের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য হয়ে গেছে।" ত্রিপুরার বিষয়ে এই হচ্ছে কতগুলো বাস্তব তথ্য।

এখন কমিশন যেসব যুক্তি দিয়েছেন সেইসব যুক্তির প্রশ্নে আসা যাক। কমিশন মনে

করেন প্রায় একই ধরনের ভাষা ব্যবহার হচ্ছে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যেসব গুরুত্বপূর্ণ নীতি অনুসরণ করা উচিত এটা হচ্ছে তার একটা। এখন দেখা যাক ত্রিপুরার ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ কি ভাবে হয়েছে। কমিশন স্বীকার করেছেন যে ব্যাপক সংখ্যক বাঙালীরাই নয় উপজাতিদের একটা বড় অংশ ঘরের বাইরে বাংলাভাষাকেই সাধারণ ভাষা হিসেবে ব্যবহার করেন — যদিও উপজাতিদের নিজস্ব আলাদা কথ্য ভাষা রয়েছে। আপনি দেখতে পাবেন যে ত্রিপুরার সঙ্গে আসামের- যার রাজ্যভাষা হচ্ছে অসমিয়া — তার কোন মিল নেই। এমনকি কমিশনের রিপোর্টে স্বীকার করা হয়েছে যে ভাষাগত সাধারণ ঐক্য থাকা খুবই ভালো কথা এবং যদি রাজ্যের বিধানসভাকে অবোধ্য ভাষার চীৎকারও চেঁচামেচিতে মুখরিত করতে না হয় তবে সেই রাজ্যকে মাত্র একটি ভাষায় এবং তা জনগণের ভাষায় কাজ চালাতে হবে। আপনি যদি এই নীতি মেনে চলেন তাহলে দেখা যাবে আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার কোন কিছুতেই মিল নেই। তাদের ভাষা হচ্ছে অসমিয়া। ত্রিপুরাতে জনগণের একটা অংশ বাঙালী, তারা বাংলায় কথা বলেন এবং অপর অংশটি হচ্ছে উপজাতি যাদের নিজস্ব আলাদা ভাষা রয়েছে — যার সঙ্গে আসামের উপজাতিদের ভাষার কোন মিল নেই। এটা সত্যি যে আসামে বেশ বড় সংখ্যক বাঙালী রয়েছেন যারা ত্রিপুরার সীমান্তবর্তী এলাকায় বসবাস করছেন। কিন্তু সংযুক্তির প্রশ্নে এটা কোনরকম যুক্তি হতে পারে না কারণ ত্রিপুরার সংস্কৃতিকে বাঙালী সংস্কৃতির সঙ্গে পুরোপুরি মিলিয়ে দেখা যায় না।

ত্রিপুরার বিশিষ্ট সংস্কৃতি, তার অবিস্মরণীয় ইতিহাস ও ঐতিহ্য যদি আঞ্চলিক কোন সত্তার জন্ম দিয়ে থাকে তবে তাকে হিসেবের মধ্যে না রাখা বাস্তবোচিত হবে না। বিশেষ রকমের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার ঐতিহাসিক সংস্কৃতি তৈরী হয়েছে যার সঙ্গে আসামের উপজাতিদের সংস্কৃতির কোন মিল নেই। এই সত্যকে অস্বীকার করলে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ শুধু নয়, অনুপজাতি জনগণের প্রতি ও অবিচার করা হবে। আর্থিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক বিবেচনায় ও আসামের সঙ্গে ত্রিপুরাকে মিলিয়ে দেয়া যুক্তিসম্মত নয়। ভৌগোলিক দিক থেকে নিঃসন্দেহে ত্রিপুরা আসামের সংলগ্ন অঞ্চল। কিন্তু এই কারণটাই ত্রিপুরাকে আসামের মধ্যে ঢুকিয়ে দেবার পক্ষে কোন যুক্তি হতে পারে না কারণ ত্রিপুরার সঙ্গে আসামের কোনরকম সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক ঐতিহাসিকভাবেই নেই। এই সম্পর্ক কেন তৈরী হতে পারেনি তারও যথেষ্ট কারণ আছে।

অর্থনৈতিকভাবে আসাম হচ্ছে একটি অনুন্নত ও পিছিয়ে পড়া রাজ্য — যার নিজের রয়েছে ঘাটতি বাজেট। কমিশন স্বীকার করেছেন যে আসামে রেল ও সড়ক যোগাযোগ যথেষ্ট নেই, রয়েছে শিল্পের অভাব, বন্যানিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর অভাব। সংযুক্তিকরণ হলে

অর্থনৈতিকভাবে ও আর্থিক দিক দিয়ে কিভাবে তা ত্রিপুরার উন্নতির সহায়ক হবে আমরা তা বুঝতে পারছি না। ভাষাগত ঐক্য এবং এক অঞ্চল থেকে অন্যত্র সহজে যাবার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থা — এসব কয়েকটি দিক প্রশাসনিক সুবিধার দিক থেকে মনে রাখা দরকার। কমিশনের রিপোর্টে এই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সংযুক্তি ত্রিপুরাকে সেই লক্ষ্যে নিয়ে যাচ্ছে না। ত্রিপুরার আইন আসামের ধাঁচে তৈরী করা হয়নি। এগুলো পশ্চিমবঙ্গের ধাঁচেই করা হয়েছে। দয়া করে মনে করবেন না আমি পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে ওকালতি করছি। উপজাতি জনগণ অন্য কোন প্রতিবেশী রাজ্যে যেতে চায় না। পূর্ণাঙ্গ গণতান্ত্রিক কাঠামোসহ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের সরকার তারা চায়।

এখানে আমি তুলে ধরতে চাই, সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত মিলের যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ নীতি এবং জনগণের যে আকাঙক্ষার কথা রাজ্য পুনর্গঠনের বিষয়ে বিবেচনা করার দরকার ছিল — তা কিন্তু ত্রিপুরার ক্ষেত্রে একটু ও করা হয়নি। আসামের সঙ্গে ত্রিপুরার সং যুক্তির প্রস্তাব করে কমিশন আর একটা ভুল করেছেন। এটা প্রতিরক্ষার ব্যাপারে। কমিশন বলছেন ভারতের ঐক্য ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষিত ও শক্তিশালী করা একটি আবশ্যিক কর্তব্য। এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আসামের মধ্যে ত্রিপুরার অন্তর্ভুক্তির পক্ষে এই যুক্তি দেখা যায় না। কারণ প্রতিরক্ষা হচ্ছে কেন্দ্রীয় বিষয় এবং দেশ রক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। যদি ত্রিপুরা আলাদা থাকে তবে কোন সমস্যাই হচ্ছে না। এরকম ও যুক্তি দেয়া হয়েছে যে ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য, তার জনসংখ্যা খুবই কম আর তার তিনদিক পাকিস্তান ঘিরে আছে। অনেকে যুক্তি দিয়েছেন ত্রিপুরা একটি ছোট রাজ্য বলে প্রতিরোধ করতে পারবে না এবং বিপদের সময় নিজেকে রক্ষা করতে ব্যর্থ হবে। এটা একটি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য। প্রতিরক্ষার দায়িত্ব কেন্দ্রের। দেশ রক্ষা করার কাজ এই ছোট রাজ্য বা অন্য কোন রাজ্যের একার কাজ নয়। প্রতিরক্ষা একটি জাতীয় সমস্যা। এটা কোন বিশেষ প্রদেশ, জেলা বা রাজ্যের সমস্যা নয়। যদি দেশের কোন জায়গায় বাইরের দিক থেকে অথবা বাইরের শক্তির দ্বারা কোন বিপদ উপস্থিত হয় তবে তা প্রতিরোধ করতে সমগ্র দেশ ও জাতিকে একসঙ্গে নিয়ে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসতে হবে।

আরেকটি কথা আছে যা ভুললে চলবে না। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য নয়। যদি ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ত্রিপুরা একটি স্বাধীন রাজ্য হত তবে খুব গুরুতর সমস্যা দেখা দিত। ত্রিপুরা স্বাধীন রাজ্য নয় — এটা ভারতীয় ইউনিয়নের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যদি বিদেশীদের দ্বারা এই রাজ্য কখন আক্রান্ত হয় তখন কেন ভারতীয় ইউনিয়ন ত্রিপুরাকে রক্ষা করার দায়িত্ব নেবে না?

আরেকটি কথা আছে। কমিশন মণিপুরকে আলাদা রাজ্য হিসেবে রাখার প্রস্তাব করেছেন এবং তার সপক্ষে কিছু যুক্তি ও দিয়েছেন। যুক্তি হচ্ছে এই যে মণিপুর হচ্ছে একটি সীমান্ত রাজ্য, রাজ্যটি বহু শতক ধরেই স্বাধীন রাজ্য হিসেবে রয়েছে, এই রাজ্যের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের কোন রেল যোগাযোগ নেই, এর রয়েছে বিশেষরকম সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন, বিশেষরকম জাতিগত ও ভাষাগত অবস্থা; আসামের বেশ ভালোমত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যা রয়েছে, রাজ্যটি কেন্দ্রের কাছ থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্য পাচ্ছে এবং রাজ্যটিকে যদি অন্য কোন রাজ্যের সঙ্গে যুক্ত করা হয় তবে তার অর্থনৈতিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে; এছাড়া মণিপুরের জনগণ ও সংযুক্তির বিপক্ষে। এইসব যুক্তির ওপর ভিত্তি করে কমিশন প্রস্তাব রেখেছেন যে মণিপুরকে স্বতন্ত্র রাখা উচিত। আমি বলতে চাই যে ত্রিপুরা রাজ্যের ক্ষেত্রে এই একই কথা প্রয়োগ করা হোক। একজন অন্ধ মানুষ ও দেখতে পারে যে এইসব মূল ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েই ত্রিপুরার মানুষ গণতান্ত্রিক সরকারের কাঠামো সহ একটি স্বতন্ত্র রাজ্যের দাবী করেছেন।

সন্ধ্যা ছয়টা

আসামের ভেতরের ছবিটা একটু দেখা যাক। এমনকি রাজ্য পুনর্গঠিন কমিশন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরকম সমস্যার কথাই বলেছেন। সেখানে যেসব সংখ্যালঘু বাঙালী তাদের অধিকারের সুরক্ষার জন্য সংগ্রাম করছেন তাদের অসন্তোষ রয়েছে। সেখানে বিভিন্ন উপজাতি রয়েছেন যারা তাদের নিজেদের স্বার্থ সুরক্ষিত করতে আঞ্চলিক স্বায়ত্ত শাসনের জন্য সংগ্রাম করছেন। সেখানে রয়েছে শৃংখলা বিনষ্টকারী শক্তি যা নাগাদের মধ্যে এবং উত্তর — পূর্ব ফ্রন্টিয়ার এজেন্সির জনগণের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা জাগিয়ে তুলছে। যদি ত্রিপুরার অনিচ্ছুক জনগণকে জোর করে এই ধরনের অসন্তোষের আগুনে ঠেলে দেয়া হয় তবে ভারতের ঐক্যরক্ষার কাজ এগিয়ে নেওয়া যাবে না।

১৯ ডিসেম্বর, ১৯৫৫

গত পরশু আমি ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করার বিরুদ্ধে কতগুলো বিষয়ের উপর বক্তব্য রেখেছি। সংবাদপত্রে যেভাবে এ খবর প্রকাশিত হয়েছে তাতে বক্তব্য বোঝার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ভুল থেকে গেছে। আমি একথা বলিনি যে, ত্রিপুরা যদি আসামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় তবে আসামে বাঙালীর সংখ্যা বেড়ে যাবে এবং উপজাতিরা নির্যাতিত হবে। আর সেজন্যই নাকি ত্রিপুরার জনগণ এর বিরোধী। আমি এরকম কথা বলিনি। এখানে ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমি সেটাই বলতে চেয়েছি। একজায়গায় কমিশন নিজেই এক

বিপজ্জনক বিষয়ের প্রস্তাব করেছেন — যা আমার এখানে বলা দরকার। কমিশন প্রস্তাব করেছেন যে যদি আসামের ভেতরে বাঙালী প্রশাসিত একটি অঞ্চল তৈরী করা যায় তবে বাঙালীদের স্বার্থ সংরক্ষিত হবে। আমি বলছি এটা একটা মারাত্মক প্রস্তাব।

আমি দেখিয়েছি যে আসামের অভ্যন্তরে বাঙালীদের এভাবে বিভক্ত করাটা খুবই অবাস্তব ব্যাপার এবং তার ফলে বাঙালী ও অসমিয়াদের মধ্যে দীর্ঘকালের পুরনো তিক্ততা আরো ঘনীভূত হবে। সমগ্র রাজ্যের ঐক্য এতে বিপদের মুখোমুখী হবে এবং জাতীয় পরিকল্পনার কাজ বাধাপ্রাপ্ত হবে। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি কিভাবে কমিশন এই ধরনের সাংঘাতিক প্রস্তাব রাখতে পারলেন।

এমন কি আসামের মুখ্যমন্ত্রী অনেকবার প্রকাশ করেছেন, প্রেস বিবৃতি দিয়েছেন, বিধানসভায়ও বলেছেন যে তাঁরা ত্রিপুরাকে নিতে ইচ্ছুক নন। তারা তখনই ত্রিপুরার বোঝা নিতে রাজী হবেন যখন কেন্দ্র থেকে পর্যাপ্ত আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়া হবে। ত্রিপুরা যদি আসামের সঙ্গে যুক্ত হয় তবে তার ভাগ্যে যে কি ঘটবে তারই কিছু সংকেত এগুলো।

কমিশনের রিপোর্টে আরেকটি বিষয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে — সেটা হচ্ছে জাতীয় পরিকল্পনার সফল রূপায়ণ সম্পর্কে। জাতীয় পরিকল্পনাকে কিভাবে সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় — এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিকে কমিশন রাজ্য পুনর্গঠনের সময় চিন্তাভাবনার মধ্যে রাখতে বলেছেন। আসাম সরকারের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলতে পারি যে কাঁচামালের অভাবে, শিল্পের যন্ত্রপাতি এবং প্রযুক্তিবিদের অভাবে আসাম ভুগছে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার কাজ ও আসামে ভালভাবে হয়নি। বিনীতভাবে একথা বলতে পারি যে ত্রিপুরাতে আসামের থেকে ভাল কাজ হয়েছে। যতদূর আমি দেখছি তাতে দেখছি যে ত্রিপুরা ও আসামের উন্নয়ন পরিকল্পনা পরস্পর নির্ভরশীল নয়, পরিপূরক নয় এমনকি পরস্পরের সাহায্যকারীও নয়। সেজন্যই ত্রিপুরাকে যদি আলাদা রাখা হয় তাহলে জাতীয় পরিকল্পনার পক্ষে কোন বিপদ উপস্থিত হবে না। অন্যদিকে বরং ত্রিপুরা যদি আসামের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে জাতীয় পরিকল্পনা অবশ্যই এক অচলাবস্থার সম্মুখীন হবে।

ত্রিপুরার জনগণ তাদের নতুন ভাবী রাজ্যের সম্মান সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তুচ্যুত মানুষ ত্রিপুরায় বসবাস শুরু করেছেন এবং ত্রিপুরার অর্থনীতিকে গড়ে তোলার ব্যাপারে তারা তাদের যতটুকু ক্ষমতা ততটুকু সাহায্য দিচ্ছেন। যতই থেমে থেমে বা ধীরগতিতে হোক না কেন, ত্রিপুরা অগ্রগতির পথেই চলেছে। আসামের সঙ্গে কোনরকম সংযুক্তি এই কর্মসূচীকে ব্যাহত করবে। সেজন্যই এই সভার কাছে এবং

ট্রেজারি বেঞ্চের সদস্যদের কাছে আমি আবেদন জানাচ্ছি এই লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য তাঁদের চিন্তাভাবনাকে পরিচালিত করতে। অনুগ্রহ করে ত্রিপুরাকে আলাদা রাখুন, তাদের অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের সুযোগ দিন — যাতে তারা নিজেদের সংস্কৃতি গড়ে তুলতে পারে এবং তাদের নিজেদের কাজের ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে পারে।

এরপর আমি অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও আর্থিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে বলছি। এই যুক্তির ভিত্তিতে কমিশন ত্রিপুরাকে আলাদা রাখার সম্ভাবনার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেছেন। যুক্তি দেয়া হয়েছে যে, একটা ছোট রাজ্য হয়ে এবং সামান্য আয় নিয়ে ত্রিপুরা আর্থিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য হিসেবে গড়ে উঠতে পারবে না। আমি একথা মেনে নিচ্ছি। কিন্তু আমি এটা মেনে নিতে পারছি না যে দীর্ঘসময় পরে ও ত্রিপুরা আর্থিক সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য হিসেবে কখনই গড়ে উঠতে পারবে না। যদি আপনারা ত্রিপুরার অর্থনৈতিক সম্পদের প্রতি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টি নিয়ে দেখেন তবে দেখবেন সম্ভাবনা হতাশাজনক নয়। দেখবেন সেটা অন্ধকার নয়। আশার আলো আছে। আমি মনে করি না রাজ্য পুনর্গঠনের প্রশ্নে আর্থিক সম্ভাবনার প্রশ্নটি নিয়ে আসার প্রয়োজন রয়েছে। এটা কোন বিশেষ রাজ্যের সমস্যা — এই রাজ্য বা ওই রাজ্যের সমস্যা নয় — তা বিচ্ছিন্নভাবে দেখা চলে না। আর্থিক সম্ভাবনার প্রশ্নটিকে জাতীয় সমস্যার দিক দিয়েই দেখতে হবে। আমাদের একত্রিত হয়েই অর্থনীতিকে গড়ে তুলতে হবে। প্রত্যেক রাজ্যের অবশ্যই তাতে সহযোগিতা থাকবে এবং রাজ্যগুলো যাতে আর্থিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য হিসাবে গড়ে উঠতে পারে তারজন্য কেন্দ্রীয় সরকারের দিক থেকে সমস্ত রাজ্যগুলোকে নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার ব্যাপারে উৎসাহিত করা দরকার ও সবরকম প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র সরবরাহ করা দরকার। আমি মনে করি একটি স্বাধীন জাতীয় অর্থনীতি গড়ে তোলার ব্যাপারে এটাই হবে সঠিক পথ। কোন রাজ্যই - তা যত বড় বা সম্পদশালীই হোক না কেন— কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া বা অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে সহযোগিতা না করে তার অর্থনীতি সার্থকভাবে গড়ে তুলতে পারে না বা আর্থিকভাবে সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য হয়ে উঠতে পারে না। এমনকি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ও স্বীকার করেছেন যে প্রস্তাবিত কর্ণাটক বা প্রস্তাবিত কেরালা রাজ্য বর্তমানে আর্থিক সম্ভাবনাপূর্ণ রাজ্য হয়ে উঠবে না। বাস্তবে বর্তমানে ভারতে খুব কমই রাজ্য আছে যে সব রাজ্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য ছাড়াই কাজ চালিয়ে যেতে পারে। সুতরাং রাজ্য পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে আর্থিক সম্ভাবনার প্রশ্নটির কোন গুরুত্ব নেই — রাজ্য পুনর্গঠন ভাষাভিত্তিক নীতির ভিত্তিতেই হওয়া উচিত।

যদি দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিকোণ থেকে ধরা হয় তবে দেখা যাবে যে ত্রিপুরার ভালো সম্ভাবনা রয়েছে। ত্রিপুরায় রয়েছে মোট ২৬ লক্ষ একর জমি যার মধ্যে চার লক্ষ একর

জমি কৃষির আওতায় এসেছে। বাকি জমি পুনরুদ্ধারের কাজ এখনও হয়নি। তাছাড়া, ত্রিপুরায় রয়েছে ভালো খনিজ সম্পদ — বিশেষ করে তেল ও কয়লা। এখানে ডম্বরু জলপ্রপাত ও রয়েছে যার থেকে বিশেষজ্ঞদের মতে ৬০,০০০ কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতে পারে যা সমগ্র রাজ্যের বিদ্যুতের চাহিদার পক্ষে যথেষ্ট।

ত্রিপুরায় পাট, তুলা, বাঁশ, আখ ইত্যাদির মত গুরুত্বপূর্ণ কাঁচামাল ও উৎপাদিত হয়। চা বাগান ছাড়া এখানে রয়েছে বিশাল বনজ সম্পদ। যদি যথাযথভাবে এগুলো গড়ে তোলা যায় এবং ভালো যোগাযোগ ব্যবস্থা করা যায় তাহলে খুব সহজেই এখানে মাঝারি ধরণের শিল্প গড়ে তোলা যেতে পারে। কিন্তু সমস্ত দায়িত্ব কেন্দ্রের ওপরই কারণ কেন্দ্রের সাহায্য ছাড়া ত্রিপুরা একা একা এইসব শিল্প গড়ে তুলতে পারবে না।

এসব বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে আমি আবার এই সভার কাছে এবং মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যেন ত্রিপুরাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত করা না হয়, যেন ত্রিপুরাকে আলাদা রাখা হয় যাতে রাজ্যটি নিজের অর্থনীতি ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারে। যদি আসামের সঙ্গে ত্রিপুরা মিশে যায় তবে প্রাথমিক বিপর্যয় ঘটবে ত্রিপুরার মানুষের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রে। বর্তমানে ত্রিপুরার ছেলেমেয়েরা স্নাতকোত্তর স্তর পর্যন্ত বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করছে। কিন্তু যদি আসামের সঙ্গে মিশে যায় তবে এই সুযোগ থেকে তারা বঞ্চিত হবে। কারণ এমন কি রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন প্রস্তাব রেখেছেন যে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত সংখ্যালঘুদের আঞ্চলিক ভাষা শিক্ষার মাধ্যম হবে কিন্তু তারপর এরকম ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ওপর রাজ্যভাষা চাপিয়ে দেয়া হবে। এটা ত্রিপুরার মানুষের কাছে একটা কঠিন সমস্যার সৃষ্টি করবে। আমি প্রস্তাব রাখতে চাই যে কেবলমাত্র প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত নয় — কমপক্ষে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ছেলেমেয়েদের বিদ্যালয়ে শিক্ষার মাধ্যম করা হোক সংখ্যালঘুদের ভাষাকে।

দ্বিতীয় বিপর্যয় হিসেবে দেখা দেবে — অসমীয়াদের সঙ্গে আসামের ভেতরের বাঙালীদের যে পারস্পরিক বিদ্বেষমূলক মনোভাব বর্তমানে রয়েছে তা আবার বৃদ্ধি পেতে শুরু করবে। তৃতীয়ত, ভাষার প্রশ্নে অনবরত একটা গোলযোগ লেগেই থাকবে। ভাষা নিয়ে গোলযোগ খুবই বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। আপনি ভাল করেই জানেন এই ভাষার প্রশ্নে পূর্ব পাকিস্তানে কি পরিমাণ গন্ডগোল ঘটেছে। এটা বলা হয়েছে যে ত্রিপুরাকে আসামের অন্তর্ভুক্ত করা হলে বাঙালী জনসংখ্যা বেশ কিছুটা বাড়বে এবং সেটাই যথেষ্ট রক্ষাকবচের কাজ করবে। কিন্তু আমি বলতে চাই যে এ ধরনের ভারসাম্য তৈরী করার নীতি একটা বিপজ্জনক নীতি হয়ে উঠতে পারে কারণ এর মাধ্যমে আপনারা বাঙালী এবং অসমীয়াদের মধ্যে লড়াই করাকে উৎসাহিত করছেন। আমরা এ ধরণের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজী নই।

অনেক বাস্তুচ্যুত মানুষ রয়েছেন যারা ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। ঐ সব মানুষরা সরকারের সাহায্য নিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাসের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু যদি আসামের সঙ্গে ত্রিপুরা মিশে যায় তবে তাদের পুনর্বাসন ব্যাহত হবে। তাছাড়া যে সব মানুষ এখন আসামে রয়েছেন তাদের সঙ্গে যে সব মানুষ ত্রিপুরায় আছেন তাদের অনৈক্য বৃদ্ধি পাবে এবং তার ফলে সেই এলাকায় সবসময় একটা উত্তেজনা থাকবে যা — জাতীয় উন্নতি ও প্রগতির পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

আমি এই সভা এবং মন্ত্রীসভার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি যাতে আমাদের এই ধরনের অসুবিধার মধ্যে পড়তে না হয়। আমরা চাই না এরকম একটা অসন্তোষজনক পরিবেশ এবং খারাপ আবহাওয়ার মধ্যে পড়তে। সেজন্যই নিবেদন জানাচ্ছি যে আপনারা ত্রিপুরাকে আসামের সাথে যুক্ত না করে একে আলাদা রাখুন এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ দায়িত্বশীল সরকার করে তুলুন।

এখন আমি আসামের উপজাতি মানুষের কথায় আসি। সেখানকার উপজাতি জনগণ প্রতিনিয়ত একটা দাবী করে আসছিলেন যে তাদের স্বশাসিত এলাকার মধ্যে বর্তমানে যেসব জেলা পরিষদ আছে তাদের আরো ক্ষমতা দিতে হবে। আমি মনে করি যে ঐ দাবী সঠিক এবং যথেষ্ট যুক্তিযুক্ত। বর্তমানে জেলা পরিষদের সামান্যই ক্ষমতা আছে এবং যেটুকু সামান্য ক্ষমতা আছে তা তাদের সমাজের উন্নতির পক্ষে যথেষ্ট নয় — কারণ বাস্তবে তাদের কোনরকম আর্থিক ক্ষমতা নেই। তাদের আর্থিক ক্ষমতা এতই সঙ্কুচিত যে তারা উপজাতি জনগণের স্বার্থে বিশেষভাবে তা ব্যবহার করতে পারে না। জেলা পরিষদকে যাতে আরো ক্ষমতা দেয়া হয় যাতে অর্থব্যবস্থার ওপর তাদের পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ থাকে, যাতে তারা উপজাতিদের শিক্ষার মান উন্নত করতে পারে এবং অন্যান্য জনকল্যাণমূলক কাজে এগিয়ে যেতে পারে — তা যেন এই সভা দেখেন, এটাই আমার আবেদন। এই প্রসঙ্গে আমি উল্লেখ করতে চাই যে আসামের উপজাতি জনগণ আসাম সরকারকে কিছুটা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখেন। আমি জানি না এরকম সন্দেহ করাটা কতখানি যুক্তিযুক্ত, কিন্তু আমি জানতে পেরেছি যে আসামের উপজাতিদের কল্যাণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদিত অর্থের কিছু অংশ আসামের সমতলবাসী মানুষের জন্য খরচ করার চেষ্টা করেছিলেন আসাম সরকার। যেভাবেই হোক বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের নজরে এসেছিল এবং সম্ভবত মনে হয় কেন্দ্রীয় সরকারের বাধাদানের ফলেই ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যায় এবং সমতলের মানুষদের জন্য ঐ অর্থ খরচ করা সম্ভব হয়নি। যদি এই ধরনের ঘটনা ঘটতে থাকে তবে আপনি কি করে আশা করেন যে উপজাতিরা আসাম সরকারের উপর তাদের বিশ্বাস রাখবে? সেজন্যই আসামের পাহাড় এলাকায় উপজাতিদের অর্থনৈতিক উন্নতির

জন্য জেলা পরিষদের হাতে অধিক ক্ষমতা দেয়া খুবই প্রয়োজন।

কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা প্রসঙ্গে আমি দু-একটা কথা বলতে চাই। আমরা কোনরকম কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মর্যাদা চাই না। আমাদের এ ব্যাপারে অনেক বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা আছে। 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্য হিসেবে মণিপুর এবং ত্রিপুরা এই শাখার তালিকায় রয়েছে। চীফ কমিশনার এবং তাঁর পরামর্শদাতাদের আমাদের রাজ্য শাসনের ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট তিক্ত অভিজ্ঞতা রয়েছে। এমনকি এই সভাতেও বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে আমরা কয়েকটি ঘটনার কথা জানতে পেরেছি যেখানে মহিলারা লাঞ্ছিত ও ধর্ষিত হয়েছেন। এখনও এই সভার কাছে একটি কেস ঝুলে আছে এবং তার তদন্ত চলছে। যেসব 'ইয়েসম্যান'দের মধ্যে থেকে পরামর্শদাতারা মনোনীত হন তাদের চীফ কমিশনার যা বলেন তাই পালন করতে হয়। এরকম দুর্নীতিপরায়ণ সরকারী ব্যক্তি ও আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনের পক্ষে জাতীয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি গড়ে তোলার কাজ করা একরকম অসম্ভব।

রিপোর্টের এক জায়গায় বলা হয়েছে যে, যদি মণিপুর বিধানসভায় তাদের প্রতিনিধিত্ব চায় তবে তাকে আসামের সঙ্গে যুক্ত হবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। আর যদি মণিপুর আলাদা থাকতে চায় তবে তার ভাগ্যে জুটবে আঞ্চলিক শাসনের মর্যাদা। আমি এখানে বলতে চাই যে মণিপুর বা ত্রিপুরার জনগণ কোন অবস্থাতেই আসামের মধ্যে যেতে চায় না। আমরা স্বতন্ত্র রাজ্য হিসেবেই থাকতে চাই।

সবশেষে এই সভার কাছে আমার আবেদন আপনারা ত্রিপুরার সব অংশের মানুষের অনুভূতির কথা বিবেচনা করুন এবং দেখুন যাতে আমাদের রাজ্যে একটি গণতান্ত্রিক কাঠামোর সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়। আমাদের বিষয়টি বিবেচনা করে আমাদের রাজ্যকে স্বতন্ত্র রাজ্য হিসাবে রাখার জন্য আবার আমি সভার কাছে অনুরোধ জানাচ্ছি।

লোকসভায় আঞ্চলিক পরিষদ বিল এর উপর বক্তব্য

২০ ডিসেম্বর , ১৯৫৬

দশরথ দেব (ত্রিপুরা পূর্ব) ঃ আমি কি একটা প্রশ্ন করতে পারি? জানতে পারি কি— পরিষদের কোন মনোনীত সদস্য রাজ্য পরিষদের এক সদস্য নির্বাচনে ভোট দেবার অধিকারী কি না? ....

অনেক দ্বিধায় পরে এবং অনেক দেরী করে কেন্দ্রীয় সরকার এই বিলটি — আঞ্চলিক পরিষদ বিলটি পেশ করেছেন। আমি এই বিলটির মূলসুরটিকে স্বাগত জানাচ্ছি কারণ এতে আঞ্চলিক পরিষদের হাতে স্থায়ীভাবে, খুবই সীমিত এলাকায় কাজ করার জন্য কিছু ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছে। আশা করতে পারি এখন থেকে এইসব এলাকার জনগণ উন্নয়নের কাজে, যদিও সীমিতভাবে, অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তাহলেও আমরা এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাই, কারণ কমপক্ষে আমাদের জনগণের জন্য এটা একটা এগিয়ে যাবার পথ। এই সভার সকলেই জানেন যে এইসব এলাকার জনগণের দাবী হচ্ছে বিধানসভার দাবী। প্রস্তাবিত পরিষদ বিধানসভার মত কাজ করতে পারবে না। সেজন্যই আমি মনে করছি এই এলাকার জনগণ পুরোপুরি সন্তুষ্ট হবেন না। তবু বিধানসভার দাবী মেনে নেওয়া সাপেক্ষে এই পদক্ষেপকে সাময়িক পরীক্ষামূলক ব্যাপার হিসেবে আমি মেনে নিচ্ছি এবং আশা করি আমাদের জনগণও এই দৃষ্টিভঙ্গীতেই এই পদক্ষেপকে গ্রহণ করবেন।

এই সঙ্গে আমাদের ভুললে চলবে না যে এই বিলের কিছু কিছু ধারায় স্বাগত জানানো গেলেও কিছু গুরুতর ত্রুটি এবং অগণতান্ত্রিক প্রস্তাব রয়েছে। এই সবকিছু বিল থেকে বাদ দিতে হবে। তা না হলে মসৃণভাবে এবং কার্যকরীভাবে কাজ করা সম্ভব হবে না। আমি এক এক করে এই বিলের ধারার ত্রুটিগুলো ধরছি। প্রস্তাব করা হয়েছে যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম চেয়ারম্যানের নাম ঠিক করবেন— যিনি তিনবছর কার্যকালের মেয়াদে নিযুক্ত হবেন। আমি বুঝতে পারছি না আঞ্চলির পরিষদের জন্মলগ্নেই কেন কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম চেয়ারম্যান মনোনীত করবেন এবং শুরু থেকেই কেন পরিষদ সদস্যদের নিজেদের চেয়ারম্যান নির্বাচন করার ক্ষমতা ছেঁটে দেবেন? আশংকা, এটার নানারকম ব্যাখ্যা হতে পারে। বলা যেতে পারে যে যখন শাসকদলের লোকজন পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি তখন সরকার তাদের দলের লোকদের এবং ইয়েসম্যানদের জন্য দরজা খোলা রেখেছেন চেয়ারম্যান পদের জন্য। আবার দেখা যাচ্ছে পরিস্থিতি অনিবার্য হলেও

চেয়ারম্যানকে সরিয়ে দেবার কোন ব্যবস্থা বিলে নেই। আমাদের দাবী এরকম কিছু ধারা থাকা দরকার যাতে পরিস্থিতি সামাল দিতে পরিষদ চেয়ারম্যানকে — যিনি বিলের ধারা অনুসারে একজন সর্বক্ষণের কর্মকর্তা— তাকে সরাতে পারে। চেয়ারম্যান সরাবার কোন ব্যবস্থা যে রাখা হয়নি তারও একটা বিশেষ তাৎপর্য আছে। আশংকা করা যেতে পারে যে সরকার চাইছেন না কোন অবস্থায় চেয়ারম্যানকে তার কার্যকালের মেয়াদ ফুরিয়ে যাবার অগে সরানো হোক ; এতে পরিষদের বা অঞ্চলের জনগণের প্রতি যে অপরাধ বা ক্ষতিসাধনই করে থাকুন না কেন। আমি প্রস্তাব করছি পরিষদকে অন্ততঃ পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে চেয়ারম্যানকে সরাবার ক্ষমতা দেয়া হোক। তা না হলে পরিষদের সদস্যদের গণতান্ত্রিক রীতিতে চলা কঠিন হয়ে উঠবে। অবশ্য আমি বলতে চাই না যে সাধারণ অবস্থায় জনগণ চেয়ারম্যান সরিয়ে দেবার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করবেন। এটা আকাংখিতও নয়। কিন্তু কোন অস্বভাবিক পরিস্থিতিতে পরিষদের সদস্যদের হাতে চেয়ারম্যান সরাবার ক্ষমতা দেয়া উচিত।শুধু মনোনীত চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে নয় নির্বাচিত চেয়ারম্যানদের ক্ষেত্রে ও এই ক্ষমতা থাকা উচিত। কারণ পরিষদকে যদি চেয়ারম্যান সরিয়ে দেবার ক্ষমতা দেয়া না হয় তাহলে একটা বিপদ হতে পারে। কোন চেয়ারম্যান সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিষদ সদস্যদের ইচ্ছাকে অবহেলা করার প্রবণতা দেখাতে ও পারেন অথবা তিনি প্রশাসক ও দুর্নীতিগ্রস্ত আমলাদের ইয়েসম্যানে পরিণত হতে পারেন অথবা তিনি পরিষদ সদস্যদের প্রতি উদ্ধত আচরণ করার প্রবণতা দেখাতেও পারেন। পরিষদের সদস্যদের দিক থেকে তার চাকরি বজায় রাখার জন্য অথবা তার অন্যান্য কাজের জন্য ভয় করার কিছু আর থাকবে না। যদি এই ক্ষমতা না দেয়া হয় তবে এই বিলটি আপত্তিকর এবং একই সঙ্গে হাস্যকর ও অগণতান্ত্রিক হবে। তার জন্যই আমি এরকম একটি সংশোধনী উত্থাপন করছি। (সংশোধনী উত্থাপন)।

............এই সংশোধনীটি খুবই সরল এবং তা গণতান্ত্রিক রীতি অনুযায়ী। আশা করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এটা ভাল করে দেখবেন।

নির্বাহী অফিসার নিযুক্তির ব্যাপারে আর একটা ত্রুটি রয়ে গেছে কারণ এই বিলে পরিষদের হাতে পরিষদেরই নির্বাহী অফিসার নিযুক্তির ক্ষমতা দিতে চাওয়া হয়নি। মুখ্য নির্বাহী অফিসার তার কাজের জন্য অবশ্যই পরিষদের কাছে দায়ী থাকবেন এবং একই সঙ্গে পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা সেই সময় চেয়ারম্যানের পক্ষে দায়িত্বপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নিযুক্ত হবেন। আমি বুঝতে পারছি না কেন সরকার চাইছেন যে মুখ্য নির্বাহী অফিসার অবশ্যই প্রশাসকের দ্বারাই নিযুক্ত হবেন। এটা একটা অদ্ভুত ধারণা। এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে কিনা আমার জানা নেই।

পরিষদের মনোনীত সদস্যদের ব্যাপারে আর একটি কথা আছে। উদ্বোধনী ভাষণে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন যে মনোনয়নের ব্যবস্থা সাধারণভাবে অনুসরণ করা হবে না কিন্তু তফশিল জাতি ও উপজাতি সদস্য যদি ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত না হতে পারেন তবেই তা বিবেচনা করা হবে। এই ব্যবস্থাটাই বিলের মধ্যে রাখার ব্যাপারে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী কেন স্পষ্ট করে বলছেন না? যদি তাই তাঁর ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে সভায় তিনি যা বলেছেন সেটাই বিলের মধ্যে রাখা হোক। তাহলে কোনরকম আশংকা থাকবে না। তা না হলে এরকম ও হতে পারে যে তফশিল জাতি অথবা উপজাতি থেকে কোন সদস্য পবিষদে নির্বাচিত হলেও অন্য কোন সদস্যকে পরিষদে নেয়া হতে পারে। তিনি যা বলেছেন তা ত্রিপুরা ও মণিপুরের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হবে কিন্তু হিমাচল প্রদেশের ব্যাপারে এরকম মনোনয়নের ব্যবস্থা রাখার কি প্রয়োজন আছে যখন বিলে বলাই আছে যে ১২ টি আসন তফসিল জাতির জন্য সংরক্ষিত ? ঐ সম্প্রদায় থেকে কেউ নির্বাচিত হয়ে আসবেন না বা নাও নির্বাচিত হতে পারেন এরকম ভয়টা কিসের ? আমি এটা বুঝতে পারছি না। আমার মনে হয় এরকম মনোনয়নের অধিকার থাকার দরকার নেই কারণ যদি এরকম কিছু থাকে তবে তা শাসকদলকেই সাহায্য করবে ফায়দা তুলতে।

আমি আরো একটা ত্রুটি নির্দেশ করছি। যদিও বিলে স্থানীয় সমস্যার ব্যাপারে পরিষদকে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিতে চাওয়া হচ্ছে তবু রাজ্যের জনগণের স্বার্থে ভূমি সংস্কার ইত্যাদি বিষয়ে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে কমপক্ষে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সুপারিশ করার ক্ষমতা পরিষদের হাতে দেয়া হোক। এরকম সুপারিশ করার ক্ষমতা অবশ্যই পরিষদকে দিতে হবে যাতে বিষয়গুলো পরিষদ সরকারের নজরে নিয়ে আসতে পারেন। আমি মনে করি এটা অবশ্যই প্রয়োজনীয় এবং তা বিলের মধ্যেই যুক্ত হওয়া উচিত।

পরিষদের অর্থসংস্থানের ব্যাপারে আমি বলতে চাই যে পরিষদের নিজস্ব অর্থভান্ডার গড়ে তুলতে খুব সামান্যরকম সংস্থানের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে মাত্র। এই বিলে কেবলমাত্র ভূমি রাজস্বের শতকরা দশভাগ পরিষদের হাতে দেবার প্রস্তাব রয়েছে এবং এছাড়া প্রমোদকরের মত দু-একটি ক্ষেত্র থেকে সামান্য অর্থ আসতে পারে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ভাল করেই জানেন যে ত্রিপুরা এবং মণিপুর পিছিয়ে পড়া রাজ্য এবংএইসব উৎস থেকে আয় খুবই সামান্য হবে। আমি চেয়েছিলাম সংশোধনী প্রস্তাব আনতে কিন্তু রাষ্ট্রপতির অনুমোদন লাভ করার ক্ষেত্রে কতগুলো অসুবিধার জন্য তা করা যাচ্ছে না। বিলটিও এত দ্রুত পেশ করা হয়েছে যে আমি সময় করে উঠতে পারিনি। যাই হোক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে আমার অনুরোধ তাদের আর ও অর্থসংস্থানের ব্যবস্থা করা হোক। তা না হলে বাস্তবে পরিষদের নিজস্ব

অর্থসংস্থানের কোন উপায় সরকার রাখছেন না। পরিষদকে তাহলে শুধুমাত্র কেন্দ্রের অনুদানের ওপরই নির্ভর করতে হবে এবং কেন্দ্রীয় অনুদান ছাড়া তা কোনরকম কাজ মসৃণভাবে বা কার্যকরীভাবে করতে পারবে না। স্বাভাবিকভাবেই একটা প্রশ্ন আমার মনে আসছে। কেন্দ্রীয় সরকারের কি এটাই ইচ্ছা যে পরিষদ তার অর্থসংস্থানের ব্যাপারে সরকারের দয়ার প্রত্যাশায় থাকবে তীর্থের কাকের মত? আমি মনে করি ঐ অবস্থায় পরিষদকে রাখা উচিত হবে না। তাকে আরো আয়ের সুযোগ করে দিতে হবে।

যে সব বিষয় আঞ্চলিক পরিষদের হাতে হস্তান্তরিত করতে হবে সে সবের ব্যাপারে আমি কিছু সংশোধনীর মাধ্যমে ইতিমধ্যেই আরো একটু উন্নতি ঘটাবার চেষ্টা করেছি। সেজন্য সভায় বেশী সময় আর আমি নিতে চাই না। আমার সংশোধনীগুলো সভার সামনে এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সামনে। এগুলো খুবই সহজ সরল তবে খুবই দরকারী এবং আশাকরি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এদিকে নজর দেবেন।

আমি সরকারকে অনুরোধ করছি এই সমস্ত পরিষদকে যথেষ্ট পরিমাণ অর্থ দেবাব জন্য যাতে তারা তাদের সীমিত এলাকায় মসৃণভাবে এবং দ্রুত উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে পারে। আশা করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দ্বিতীয়বার আমার প্রস্তাবিত সংশোধনীগুলো পড়বাব সময় ভালো করে নজর দেবেন।

সংশোধনীতে বলা হচ্ছে যে এই অঞ্চলের জনগণের স্বার্থবিরোধী কোন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের কোন প্রস্তাব কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রশাসকের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠাবার অধিকার থাকবে। এই পরিষদের সদস্যরা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এসেছেন। স্বাভাবিকভাবেই জনগণেব কাছে তাদের কিছু দায়িত্ব রয়ে গেছে কারণ মানুষরা তাদের ভোট দিয়েছেন এবং যথার্থভাবেই তাদের কাছ থেকে দাবী করতে পারেন। ভূমি সংস্কার, সরকারী নীতি, অন্যান্য অনেক বিষয় ইত্যাদির মতো অনেক কিছুই আছে যা জনগণের দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করে। জুমিয়া পুনর্বাসন, শরণার্থী পুনর্বাসন এবং অন্যান্য সমস্যাও রয়েছে। আমরা চাই এসব বিষয়েও পরিষদের কিছু বলার অধিকার থাকুক। যদি এরকম কোন ক্ষমতা তাকে না দেয়া হয় কবে অন্ততঃ প্রস্তাবের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রশাসকের কাছে বিষয়টা জানাবার অধিকাব দেয়া হোক। তা না হলে পরিষদ তার নির্বাচনে এক বিশ্রী অবস্থার মধ্যে পড়বে। সেজন্য আমি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে তাদের ব্যাপারটা বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এটা কোন কার্যকরী ক্ষমতা নয় - এটা একরকম পরামর্শ দেবার ক্ষমতা যা তারা গ্রহণ করবে তাদের অঞ্চলের সমস্যার নিরিখে। আশা করি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এই সংশোধনীটি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবেন।

—————————আমার সংশোধনীতে বলা হচ্ছে যে প্রশাসকের অনুমোদন নিয়ে পরিষদের চেয়ারম্যান অথবা ভাইস চেয়ারম্যান মুখ্য নির্বাহী অফিসারকে নিযুক্ত করবেন। যদি মুখ্য নির্বাহী অফিসার নিযুক্তির বিষয়টি পরিষদের ক্ষমতার মধ্যে না থাকে তাহলে মনে হয় একটা সংঘাত সৃষ্টি হতে পারে, আবার নির্বাহী অফিসার পরিষদের সিদ্ধান্তকে নাও মানতে পারেন, আবার পরিষদের পক্ষে ও নির্বাহী অফিসারের সিদ্ধান্তকে মানা কষ্টকর হবে।

মুখ্য নির্বাহী অফিসার অপসারণের বিষয়ে একটি কথা; আমার প্রস্তাব তিন-চতুর্থাংশ গরিষ্ঠতার জায়গায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা হবে। যদি আঞ্চলিক পরিষদের সভায় কমপক্ষে দুই-তৃতীয়াংশ উপস্থিত সদস্য মুখ্য নির্বাহী অফিসার অপসারণের প্রস্তাব পাশ করেন তাহলে তখন থেকেই তিনি অপসারিত হবেন।

রাষ্ট্রের নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের রূপায়ণ বিষয়ে কমিটির নিযুক্তি প্রসঙ্গে বক্তব্য

৩১ আগস্ট, ১৯৫৬

নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের ব্যাপারে অনেক ভালো ভালো কথা বলা হয়েছে যা সকলেই বুঝতে পারেন। কিন্তু সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে এই সমস্ত নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ বাস্তবে প্রয়োগ করা হচ্ছে কি না। এটা খতিয়ে দেখা দরকার। এটা একটা মস্ত বড় বিষয়, আমি ও এর পুংখানুপুংখ ব্যাপারে যেতে চাইছিনা, কিন্তু নির্দেশাত্মক নীতির সেই অংশ সম্পর্কে — যেখানে উপজাতি এলাকা বিশেষ করে তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতির প্রসঙ্গ রয়েছে সেই অংশ সম্পর্কে কিছু বলতে চাই।

সংবিধানেই বলা আছে যে তফশিল জাতি ও তফশিল উপজাতিদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতিবিধান করাই সরকারের নীতি। তা কি শিক্ষাক্ষেত্রে, কি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে, কি জীবনের অন্যান্য সবরকম ব্যাপারে। এখন দেখা যাক ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতি মানুষের শিক্ষার ক্ষেত্রে এই নীতির রূপায়ণ কিরকম ভাবে ঘটেছে। আমার বলা উচিত ত্রিপুরায় এই নীতি পুরোপুরি লংঘিত হয়েছে। একটা নীতি রয়েছে যে একটা নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সরকারকে উপজাতিদের শিক্ষিত করে তুলতে হবে। কিন্তু দ্রুত উন্নতি ঘটাবার ক্ষেত্রে যে প্রধান বাধাটি রয়েছে ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সেই বাধাটিকে সম্পূর্ণ পাশ কাটিয়ে যাওয়া হয়েছে।

শিক্ষার ক্ষেত্রে উপজাতি মানুষের অন্যতম প্রধান সমস্যা হচ্ছে ভাষা সমস্যা। এখনও পর্যন্ত এই সমস্যা দুর করা হয়নি — এমন কি কোন চেষ্টাও করা হয়নি। উপজাতি জনগণের থেকে সবসময়ই এই দাবী উঠেছে যে অন্ততঃ প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত উপজাতি ছাত্রদের শিক্ষা তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমেই হোক। কিন্তু তা গৃহীত হয়নি। শুধু তাই নয়। ত্রিপুরা রাজ্যে আরো একটি সমস্যা আছে। ত্রিপুরার ভারতভুক্তির পর থেকে প্রায় সমস্ত প্রাথমিক শিক্ষক নেয়া হয়েছে অনুপজাতিদের মধ্যে থেকে এবং একজন শিক্ষক ও উপজাতিদের মধ্যে থেকে নেয়া হয়নি যেহেতু শিক্ষাগত যোগ্যতার বাধা রয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক হতে গেলে কমপক্ষে ম্যাট্রিক পাশ হতে হবে— নন -ম্যাট্রিক হলে শিক্ষক হওয়া যাবে না এই নিয়ম আছে। উপজাতি এলাকায় ৭-৮ বছরের উপজাতি বালক তার মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভাষাই বুঝতে পারে না। সেজন্য আমাদের এলাকায় শিক্ষা একটা প্রহসনের পর্যায়ে এসে দাঁড়িয়েছে। কমপক্ষে একজন করে উপজাতি শিক্ষক- নন ম্যাট্রিক হলে ও প্রতিটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে নেয়া উচিত যাতে তারা অল্পবয়স্ক ছাত্রছাত্রীদের

বুঝিয়ে দিতে পারে তাদের কি শেখানো হচ্ছে। অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই আমরা দেখেছি যে নন-ম্যাট্রিক উপজাতি শিক্ষকরা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক পাশ শিক্ষকদের চাইতে অনেক বেশী উপজাতি ছাত্রদের পক্ষে উপকারী হয়েছে ও সুবিধাজনক হয়েছে।

আরেকটি বিষয় হচ্ছে উপজাতিদের পুনর্বাসন। অবশ্য সরকার থেকে ত্রিপুরা রাজ্যের যে সব উপজাতি মানুষ বাস্তবে গ্রামে জুম চাষ করে তাদের জন্য একটি নীতি রূপায়ণ করা হয়েছে তাদের পুনর্বাসনের জন্য। এই পাঁচ বছরের মধ্যে মাত্র ২০০০ টি উপজাতি পরিবারকে পুনর্বাসন দেয়া হয়েছে; আর এ ধরণের পুনর্বাসন সন্তোষজনক ও নয়। আপনি লক্ষ্য করে দেখবেন যে উপজাতিদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে বৈষম্যমূলক আচরণ করা হয়েছে। যেখানে শরণার্থীদের ক্ষেত্রে ২,৪৫০ টাকা কৃষিঋণ হিসেবে দেয়া হয়েছে সেখানে উপজাতিদের জন্য মাত্র ৫০০ টাকার অনুদান দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। এইসব মানুষদের একই ধরণের জমিতে পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে এবং সেই সব জমিকে তাদের কৃষির উপযুক্ত করে তুলতে হবে যাতে খরচ একইরকম পড়বে। তবু ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে উপজাতিদের প্রতি এই বৈষম্য দেখানো হচ্ছে কেন? উপজাতিদের পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ জুমিয়া পুনর্বাসন প্রকল্পে শুধু জমির ওপরই পুনর্বাসন দেয়া হচ্ছে, যদিও কৃষিঋণ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে তবু কোন ক্ষেত্রে ব্যবসায়িক ঋণ দেবার বা ব্যবসায়সহ কৃষিঋণ বা ব্যবসায়সহ শিল্পঋণ দেবার কোনরকম ব্যবস্থাই নেই। এর অর্থ হচ্ছে সরকার হতভাগ্য উপজাতিদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে ও তাদের ব্যবসায়িক ক্ষেত্রে অংশ নিতে দিতে চান না।

এখানে একটা মস্তবড় সমস্যা রয়েছে। এমনকি শরণার্থীরা যারা ব্যবসায়িক ঋণ পেয়েছে তারা উপজাতি অঞ্চলের বাজারগুলিতে দোকান খুলে বসছে, কিন্তু একটি ও উপজাতি মানুষ সেখানে অর্থের অভাবে দোকান দিয়ে বসতে পারেনি— কারণ সে দরিদ্র। এটা একটা গুরুতর সমস্যা। সংবিধানে নির্দেশাত্মক নীতিতে বলা আছে যে সব ধরণের শোষণ বন্ধ করতে হবে। আপনার জানা আছে যে উপজাতি মানুষরা খুবই গরীব এবং তাদের জীবিকানির্বাহের কোনরকম উপায় নেই। তারা গ্রামের মহাজনদের হাতে নির্মমভাবে শোষিত-বিশেষত দাদন প্রথায় যেখানে সুদের হার শতকরা ৩০০ থেকে ৪০০। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় এ বছরে — যে বছরটা ত্রিপুরা রাজ্যের কাছে একটি সংকটময় বছর — কৃষকরা অথবা উপজাতি কৃষিজীবীরা পাঁচ টাকা মণে আগাম পাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হয়েছে আর এখন পাটের দর হচ্ছে মণ প্রতি ২০ থেকে ২৫ টাকা। কল্পনা করে দেখুন মহাজনদের কাছে তাদের কি পরিমাণ টাকা ফেরত দিতে হবে আর আগাম পাট বিক্রি করে দিতে বাধ্য হওয়ায় তাদের কি পরিমাণ অর্থের ক্ষতি হবে।

আর একটি বিষয় আমি এখানে তুলে ধরতে চাই — সেটা হচ্ছে জমির নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়। কাঞ্চনপুর এলাকার উপজাতি-দের সঙ্গে স্বস্তি সমিতি নামে অনুপজাতিদের একটি বেশ বড় সংগঠনের জমি সংক্রান্ত দীর্ঘদিনের বিরোধ রয়েছে। এই বিরোধ চলছে প্রায় ৭-৮ বছর ধরে। আমরা যখনই মন্ত্রীর কাছে যাই কিংবা সংসদে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করি তখনই আমাদের বলা হয় যে বিষয়টির দ্রুত নিষ্পত্তি হবে। সবরকমের চেষ্টা ও ব্যবস্থা করা হয়েছে কিন্তু সেখানে এই বিরোধ এখনও চলছে। এটাই হচ্ছে উপজাতি মানুষের ভাগ্য।

মহারাজার আমলে - সম্ভবত ১৩৫৩ ত্রিপুরাব্দে — ভূমি জরিপ করা হয় এবং ১৯৫০ বর্গ মাইল এলাকা উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত করা হয়। মহারাজার সার্কুলারে স্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে কোন অনুজাতিকে ঐ এলাকায় পুনর্বাসন দেয়া যাবে না। সেই সংরক্ষিত এলাকা থেকে ৩০০ বর্গ মাইল অঞ্চল ছেড়ে দেয়া হয়েছে অন্যদের পুনর্বাসনের জন্য। বর্তমানে অবস্থা হচ্ছে এই যে বেশীর ভাগ জমিই হয় অনুপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্য অথবা সরকারের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের জন্য ছেড়ে দেয়া হয়েছে। বাস্তবে উপজাতিদের জন্য বর্তমানে ১৯৫০ বর্গ মাইল এলাকার কোন অস্তিত্বই নেই। উপজাতিদের প্রতি এ ধরণের আচরণই করা হচ্ছে।

আমাদের অনুরোধ সরকার শিক্ষাদানের জন্য, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ক্ষেত্রে সুবিধা-দানের জন্য, এমনকি পুনর্বাসনের জন্য ও বিশেষ ধরণের ব্যবস্থা নেবেন কারণ এইসব নির্দেশাত্মক নীতিসমূহ সংবিধানের আলংকারিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে পারে কিন্তু যদি এইসব নীতি ঐসব অঞ্চলে যথার্থভাবে রূপায়িত না হয় তাহলে উপজাতিদের কোন উপকারেই তা আসবে না।

লোকসভায় সংবিধানের নবম সংশোধনী বিলের উপর আলোচনা

৪ ঠা সেপ্টেম্বর, ১৯৫৬

যখন এই বিল লোকসভায় পেশ করা হল তখন তা 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলো বিশেষ করে ত্রিপুরা ও মণিপুর যে দুটো রাজ্যকে কেন্দ্র শাসিত রাজ্যের বিভাগে রাখার সংস্থান হয়েছে তার জনগণের মনে দারুণ হতাশার সৃষ্টি করেছে। এমন কি আজকে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বিবৃতি শুনেও আমি খুশী হতে পারিনি। আমি নিশ্চিত যে ত্রিপুরা এবং মণিপুরের জনগণ ও এই ধরনের ঘোষণায় পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারবেন না। তিনি বলেছেন যে ত্রিপুরা এবং মণিপুরে এক ধরণের পরিষদ গঠনের সংস্থান রাখা হচ্ছে। তিনি পরিষ্কার করে বলেননি এই পরিষদের কাঠামো কি রকম হবে বা পরিষদকে কি কি ক্ষমতা দেয়া হবে। তিনি সভায় এটা ব্যাখ্যা করে বলেননি।

আপনি জানেন যে বারেবারে আমাদের আশ্বাস দেয়া হয়েছে — এমন কি এই সভাতেও — যে আমাদের রাজ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামো'র প্রতিষ্ঠা ঘটবে এবং রাজ্যের আশা-আকাঙ্খার প্রতি সম্মান জানানো হবে। এখনও পর্যন্ত আমরা কিছুই পাই নি। এমন কি এখনও তিনি প্রশাসনিক কাজকর্মের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে কিছুই বলেননি — আমাদের আশংকা যে তিনি রাজ্যে কোনভাবেই বিধানসভা দিতে চাইছেন না।

আপনার নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে আমরা যখন 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোর জন্য পূর্ণাঙ্গ বিধানসভার দাবীতে সভায় প্রশ্ন তুলতাম তখন সরকারী বেঞ্চ থেকে আমাদের প্রতি কি ধরণের ব্যবহার করা হত। সম্ভবত লোকসভার অথবা তৃতীয় অধিবেশনে আমরা ত্রিপুরা মণিপুর ইত্যাদির মত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোতে পূর্ণাঙ্গ বিধানসভা দেবার দাবীতে 'পার্ট সি ষ্টেটস বিল' নামে একটি বিল পেশ করতে চেয়েছিলাম তখন ঐ বিল পেশ করার সময় বাধা দেয়া হয়েছিল। তখনকার স্ববাষ্ট্রমন্ত্রী, ডাঃ কাটজু বলেছিলেন যে তিনি তার বিরোধিতা করছেন এই কারণে যে ঐসব রাজ্যে গণতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে তোলারজন্য সরকার নিজেই উদ্যোগী হবে। তার পরে কিন্তু কিছুই হয়নি। এমনকি আজকেও যখন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিলটি বিবেচনার জন্য পেশ করলেন তখনওতিনি জানালেন না ঐসব আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠান বা পরিষদ যা তিনি কেন্দ্র শাসিত রাজ্যগুলোতে গড়ে তুলতে চান তার কতখানি ক্ষমতা ও কিরকম প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে। এটা যে খুব হতাশা সৃষ্টি করেছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। একই সঙ্গে আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলছি যে ঐসব রাজ্যে পূর্ণাঙ্গ বিধানসভা গড়ে তোলার

লক্ষ্যে সরকার ও মন্ত্রিপরিষদের স্পষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে আর কোন-রকম দেরী করা ঠিক হবে না। আমরা তাদের কাছ থেকে ত্রিপুরা মণিপুরের মত ছোট রাজ্যগুলোতে কেন বিধানসভার দাবী মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত নয় তার অনেক ব্যাখ্যা শুনেছি। যুক্তি হিসেবে বলা হয়েছে যে ঐসব রাজ্য ছোট রাজ্য, লোকসংখ্যা ও কম আর তাছাড়া ঐসব রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থানের মত অন্যান্য বিষয় বিবেচনা করা দরকার। আমি বলব যে এইসব বিবেচনার জন্য ঐসব রাজ্যের জনগণকে গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করা অনুচিত।

সবরকম ক্ষেত্রে দক্ষতা সত্ত্বেও এই সংসদ সমস্ত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোর প্রতি সুবিচার করতে পারেনি। গত সাড়ে চার বছরের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখছি যে আমাদের অনেক সমস্যাই রয়েছে কিন্তু একটি সমস্যার ও এখানে পুংখানুপুংখ আলোচনা হয়নি। এমন কি বাজেট সেশনের সময় স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে সমস্ত 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোকে একটি গুচ্ছে একত্রিত করা হয়েছে এবং তাদের আলোচনার জন্য নিশ্চিতভাবেই এক ঘন্টার ও কম সময় বরাদ্দ করা হয়েছে। আমাদের মত ছোট রাজ্যগুলোর অন্যান্য সমস্যাও ছিল এবং স্বাভাবিকভাবেই সেসব এখানে তুলে ধরা যায়নি। এই ধরণের ছোট রাজ্যগুলোর সমস্যা কি সেটা অন্যান্য সদস্যরা বোঝার মত অবস্থায় ছিলেন না। এই পরিস্থিতিতে এটাই কাম্য যে ঐসব রাজ্যগুলোতে বিধানসভা গঠনে অনুমতি দেবার প্রয়োজন আছে যাতে তারা সেখানে তাদের সমস্যা নিয়ে পুংখানুপুংখ আলোচনা করতে পারেন — এর গভীরে যেতে পারেন।

সংসদের পক্ষে এই সমস্ত সমস্যার প্রতি সুবিচার করা সম্ভব নয় কারণ সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসছেন এবং তাদের নিজের রাজ্যের সমস্যাও রয়েছে; তাছাড়া এটাও আশা করা যায় না যে সদস্যরা এই সমস্ত রাজ্যের সমস্যার খুঁটিনাটি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন। এই সমস্ত রাজ্যগুলোকে আপনারা এখনও কেন সংসদের শাসনাধীন রাখবেন? আমার মতে আমরা তাদের প্রতি অবিচার করছি। 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যের বিধানসভার জন্য দাবী —এটা কোন নতুন ঘটনা নয়। এটা কোন আকস্মিক ঘটনা ও নয়। এমনকি যখন কনষ্টিটুয়েন্ট এসেম্বলিতে (গণপরিষদে) সংবিধানের খসড়া প্রণীত হচ্ছিল এবং তার ওপর আলোচনা চলছিল, কিছু কিছু সদস্য এই প্রশ্নটি সভায় তুলেছিলেন। গত সভায় আমাদের মাননীয় বন্ধু শ্রী এম বি এল ভার্গব এই সভাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে 'গ' শ্রেণীর সমস্ত রাজ্যগুলোতে বিধানসভা দেবার পক্ষে গণপরিষদের সদস্যদের প্রবল সমর্থন ছিল। গৃহীত সংবিধানের মূল সুরটি ছিল এই সমস্ত রাজ্যে বিধানসভা গঠন করার দিকেই।

আপনার জানা আছে কিভাবে গত ৪-৫ বছর ধরে ত্রিপুরাও মণিপুরের জনগণ ও অন্যান্য 'গ' শ্রেণীর রাজ্যগুলো এই অধিকারের দাবী জানিয়ে এসেছে স্মারকপত্র প্রদান, জনসভা, বিক্ষোভ কর্মসূচী ও অন্যান্য নানারকম উপায়ে। ত্রিপুরা এবং মণিপুরের প্রতিনিধিরা তাদের দাবী জানিয়েছেন বার বার। কিন্তু এখনওপর্যন্ত সরকার এই সমস্ত রাজ্যে বিধানসভা দেবার ব্যাপারে প্রস্তুত নন। এটাই কিন্তু উপযুক্ত সময় এবং আমি অবশ্যই এই সভায় বলব —যেমন আমি আগেও বারবার বলেছি — যে যদি 'গ' শ্রেণীভুক্ত রাজ্যগুলোতে বিধানসভা দেবার সংস্থান এই বিলে না রাখা হয় তবে এই সমস্ত রাজ্যের জনগণের প্রতি সুবিচার না করার জন্য সরকার-ই দায়ী থাকবেন। কেন্দ্রের শাসনাধীন রাজ্যগুলোতে এক বিরাটসংখ্যক মানুষ রয়েছেন যার সংখ্যা ৫০ লক্ষের ও উপরে হতে পারে। আপনারা এই পঞ্চাশ লক্ষ মানুষকে তাদের গণতান্ত্রিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না এবং তাদের নিজের রাজ্যের প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনায় তাদের অংশ নেয়া থেকে ও তাদের বঞ্চিত করতে পারেন না।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনা করার সময় বলেছেন যে কেন্দ্রীয় শাসনাধীন এলাকার জনগণ যাতে তাদের রাজ্যের প্রশাসনে অংশগ্রহণ করতে পারে সরকার তার সুযোগ রাখতে ইচ্ছুক। কিন্তু কিভাবে তারা তাদের অংশগ্রহণ করার অধিকারকে বাস্তবায়িত করবেন তা কিন্তু এখানে বলা হয়নি।

গতবার বন্যার সময় জেলা -ম্যাজিস্ট্রেট এবং চীফ কমিশনার 'বন্যাত্রাণ কমিটি' নাম দিয়ে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন এবং জনসাধারণের সহযোগিতা ও তাদের পরামর্শ চেয়েছিলেন। আমাদের সদস্য এই সংস্থার মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন এবং তাদের কাছে কিছু সমস্যার বিষয় তুলে ধরেছিলেন — কিন্তু বাস্তবে কোন কিছুই গৃহীত হয়নি। যদি এটা মাত্র পরামর্শদানকারী 'এডভাইসরি কাউন্সিল' হয়, যদি এটা প্রত্যক্ষভাবে জনগণের প্রতি দায়বদ্ধ না থাকে, যদি জনগণের সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করার ক্ষমতা এর না থাকে, যদি এই ধরনের পরিষদ বা সংস্থার সদস্যদের প্রশ্ন করার অধিকার দেয়া না হয়ে থাকে এবং সংস্থা থেকে অথবা মন্ত্রিপরিষদের কাছ থেকে সদুত্তর পাবার অধিকার দেয়া না হয়ে থাকে তাহলে এ ধরণের পরামর্শদানকারী সংস্থা গঠন করা বাস্তবে একটা প্রহসনেরই নামান্তর হবে।

আপনি অবশ্যই মনে রাখবেন যে আমাদের দেশ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় হাত দিতে যাচ্ছে। এটা করতে গিয়ে দেশগঠনের কাজে জনগণের অংশগ্রহণের জন্য নতুন নতুন রাস্তা খুলে দেয়া উচিত আমাদের। যদি আপনি জনগণকে পূর্ণ সুযোগ না দেন এই কাজে

অংশগ্রহণ করার জন্য তাহলে দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় সাফল্যলাভ করতে পারবেন না। যদি এই পরিষদ গঠন বাস্তবে পরামর্শদাতা সংস্থার মত— ই হয় তবে তা দেশগঠনের কাজে জনগণকে উৎসাহিত করতে পারবে না। একে অবশ্যই কিছু নির্দিষ্ট ক্ষমতা দিতে হবে। নাহলে শুধু পরামর্শ অর্থহীন। আমি জানি কেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং মন্ত্রিপরিষদ এখনও বিধানসভা দেবার ব্যাপারে ইতস্তত করছেন। কিছু অসুবিধা রয়েছে। মন্ত্রিসভার ও জানা আছে যে যদি মণিপুর ও ত্রিপুরায় বিধানসভা দেয়া হয় তবে এটা নিশ্চিত যে তাদের দল অর্থাৎ কংগ্রেস দল বিধানসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা রাখতে সক্ষম হবে না ....যদি ত্রিপুরা রাজ্যে বিধানসভা দেয়া হয় তবে এটা অবধারিত যে আমাদের পার্টি, কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় আসবে এবং কংগ্রেস পার্টি কোনভাবেই এই রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে না। মণিপুরে ও কংগ্রেস ক্ষমতায় আসতে পারবে না, সোস্যালিষ্ট এবং অন্যান্য দল যদি ঐক্যবদ্ধ হয় তবে হয়ত তারাই ক্ষমতায় আসবে।.........

আমি বারবার এই সভার কাছে আমাদের বিষয়টি বিবেচনার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। এই সব রাজ্যে বিধানসভা গড়ে তোলার লক্ষ্যে আমি কয়েকটি নির্দিষ্ট সংশোধনী ও পেশ করেছি।

অন্য যে বিষয়টি সম্পর্কে আমি উল্লেখ করতে চাই সেটি হচ্ছে সংখ্যালঘুগোষ্ঠীর ভাষার বিষয়। এই প্রশ্নে সরকারী সংশোধনীতে ও 'সংখ্যালঘু' কথাটি সীমিত অর্থে ব্যবহৃত — কারণ সংবিধানে যেসব ভাষার উল্লেখ রয়েছে সেইসব গোষ্ঠীর জনগণকেই এর আওতায় আনা হয়েছে। এইসব ভাষা ছাড়াও ত্রিপুরায় অনেকগুলো ভাষা রয়েছে, উপভাষা রয়েছে যার একটি নির্দিষ্ট সংস্কৃতি রয়েছে— কিন্তু এগুলোকে বাদ দেয়া হয়েছে। আমি চাই যে এই সমস্ত সংখ্যালঘু ভাষাগুলোর যথোচিত বিকাশের সুযোগ দেয়া হোক। আমাদের রাজ্যে রয়েছে উপজাতি ভাষা, তাব একটা বিশিষ্ট সংস্কৃতি ও আছে এবং আমরা এখন এই ভাষাকে বিকশিত হবার প্রয়াস নিয়েছি। কিন্তু আমাদের ভাষা সংবিধানের মান্যতা পায়নি আর সেজন্যই কোনরকম সুযোগসুবিধা আমাদের দেয়া হচ্ছে না। সংবিধানে সং খ্যালঘু ভাষার ক্ষেত্রকে আরো প্রসারিত করা দরকার এবং সংখ্যার দিক থেকে তা বাড়ানো উচিত। হতে পারে সংবিধান যখন প্রণীত হয়েছিল তখন কিছু ভাষা হয়ত বিকশিত হয়ে ওঠেনি। তার পরে, হতে পারে কিছু ভাষা বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং ভবিষ্যতে ও আরো কিছু ভাষার বিকশিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং সংবিধানে উল্লিখিত ১৪ টি সংখ্যালঘু ভাষার মধ্যে আপনি সীমিত রাখতে পারেন না। অন্যান্য ভাষাকেও এর সুযোগ দিতে হবে।

ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতিদের পক্ষে শিক্ষালাভ খুব কঠিন একটা ব্যাপার ।আমাদের

ছাত্রদের যদিও মাতৃভাষা ত্রিপুরী তবু তাদের বাংলা-ভাষার মাধ্যমেই লেখাপড়া শিখতে হয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষালাভ করা তাদের পক্ষে কঠিন হয়ে ওঠে। এমনকি ম্যাট্রিক ক্লাসের ছাত্রদের ও অর্থ না বুঝে মুখস্থ করে শিক্ষালাভ করতে হয়। শুধু তাই নয়, ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেনের ক্ষেত্রে, দলিলপত্র ইত্যাদি পেতে গেলে অথবা সইসাবুদ করতে গেলে তাদের অনেক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। উপজাতিরা সাধারণত গরীব; দারিদ্র্যে জর্জরিত তারা; তাদের দলিলপত্রের মাধ্যমে মহাজনদের থেকে ধার নিতে হয়, আর এইসব দলিলপত্র আমাদের উপজাতি ভাষায় নয় - বাংলায় লেখা। অনেকসময় দলিলপত্রে কি লেখা আছে তা না জেনেই উপজাতিরা দলিলে সইসাবুদ করে দেয়। একবার দলিলে সই হয়ে গেলে আপনি ঐ সব মানুষদের আইনগতভাবে সুরক্ষা দিতে পারেন না- এমন কি দলিলে যদি সাংঘাতিক বদ মতলবও থাকে। কখন কখন দেখা গেছে মহাজনরা মৌখিকভাবে তাদের যেভাবে বলেছে সেভাবে চুক্তির শর্ত ইত্যাদি লেখা হয়নি। কখন কখন তারা মহাজনের থেকে যে টাকা নিয়েছে দলিলপত্রে টাকার পরিমাণ সেভাবে লেখা হয়নি। এ ভাবে শত শত নিরীহ উপজাতি বঞ্চিত হচ্ছে এবং তারা তাদের জমি জমা সম্পত্তি সব হারিয়েছে। যদি একটা কমিটি গঠন করে ত্রিপুরা রাজ্যে এইসব বিষয়ে অনুসন্ধান চালানো হয় তবে দেখতে পাওয়া যাবে যে আমি যা এখানে বলছি তা কতখানি সত্য।

ত্রিপুরাতে কোন মিউনিসিপ্যালিটি বা পঞ্চায়েত নেই। আমি ত্রিপুরায় পঞ্চায়েত ব্যবস্থার দাবী জানাচ্ছি। যদি পঞ্চায়েত ব্যবস্থা আমাদের রাজ্যে চালু হয় তবে ভৌগোলিকভাবে এমন কিছু কিছু অঞ্চল আছে যেখানে আমরা উপজাতি ভাষার মাধ্যমে কাজ চালাতে পারব, পঞ্চায়েত অফিস ও উপজাতি ভাষায় কাজ চালাতে পারবে। যদি সংবিধানে এরকম করার কোন ব্যবস্থা না থাকে তবে এভাবে কাজ করতে আমরা বাধার সম্মুখীন হচ্ছি।

সবশেষে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি এই সমস্ত কেন্দ্রীয় শাসনাধীন রাজ্যে বিধানসভা দেয়া হোক। ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু গোষ্ঠীকে যথেষ্ট রক্ষাকবচ দেয়া হোক। এইসব ব্যাপারে কিছু বিধিবদ্ধ সংস্থা থাকা দরকার। সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর মানুষ যেসব সমস্যায় পীড়িত এবং তাদের যেসব অভিযোগ তা খতিয়ে দেখার জন্য কিছু অফিসার নিয়োগ করতে হবে এবং তারা রাষ্ট্রপতিকে রিপোর্ট পাঠাবেন। ঐ রিপোর্ট লোকসভায় আলোচনা করতে হবে এবং তারপরে রাষ্ট্রপতি রাজ্যগুলোকে নির্দেশ পাঠাবেন যা অবশ্যই পালনীয়। তা না হলে ঐসব রাজ্য ও কেন্দ্রীয় শাসনধীন রাজ্যগুলো কিছুই করবে না। আমরা জানি তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি কমিশনারের রিপোর্টটির ভাগ্যে কি ঘটেছে। রিপোর্টে খুব ভালো এবং মূল্যবান পরামর্শ রয়েছে— কিন্তু তার একটিও রূপায়িত হয়নি। বাস্তবায়িত করার অধিকার ও কমিশনারের নেই। এভাবে তা ফেলে রেখে দেয়া উচিত

হবে না।

সংশোধনী প্রস্তাব (নবম সংশোধনী বিল)

আমি বলতে চাই , ১০ ও ১১ পাতায় ২১ নম্বর অনুচ্ছেদের () জায়গায় বসাতে হবে ঃ

২১/৩৫০ ক থেকে ৩৫০ ছ নতুন ধারার অন্তর্ভুক্তি সংবিধানের ৩৫০ ধারার পর নীচের ধারাগুলি সংযোজিত হবে —

"৩৫০ ক— প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে সেই রাজ্যের সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর জন্য নিম্নে উল্লিখিত পদ্ধতিতে শিক্ষাক্ষেত্রে সুযোগ-সুবিধাদানের ব্যবস্থা করতে হবে ঃ

(১) সংখ্যালঘু ভাষাগোষ্ঠীর ছাত্রসংখ্যা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০ জন ও উচ্চ বিদ্যালয়ে ১০০ জন হলে অথবা বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার শতকরা পনের ভাগ হলে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ও উচ্চ বিদ্যালয়ে অথবা চলতি বিদ্যালয়গুলোতে আলাদা ক্লাসের মাধ্যমে সংখ্যালঘুদের ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার ব্যবস্থা করতে হবে। এবং

২) যেখানে প্রয়োজন এবং বাস্তবসম্মত সেখানে সংখ্যালঘুদের জন্য কলেজের ব্যবস্থা করতে হবে যার শিক্ষার মাধ্যম হবে তাদের ভাষা।

৩৫০ খ — জনসংখ্যার শতকরা ১৫ থেকে ২০ জন হয় এমন ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের জন্য প্রত্যেক রাজ্যসরকারকে যতদূর সম্ভব সরকারি বিজ্ঞপ্তি সংখ্যালঘুদের ভাষায় প্রচারের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তারা যাতে তাদের অভাব- অভিযোগ নিজেদের ভাষায় জানাতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩৫০ গ — আদালতের এলাকাধীন জনসংখ্যার ২০ শতাংশ যদি সংখ্যালঘু হয় তবে আদালতের কাজের ক্ষেত্রে সেই সংখ্যালঘুদের ভাষাকে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩৫০ ঘ — শহর, নগর ও অন্যান্য স্থানীয় এলাকায় সেই সেই এলাকার প্রায় শতকরা ২০ ভাগ ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘুদের ভাষাকে স্থানীয় সংস্থার প্রশাসনের কাজের ক্ষেত্রে স্বীকৃতি দিতে হবে।

৩৫০ ঙ — কোনো দ্বিভাষিক এলাকায় সংখ্যালঘুদের ভাষায় যদি শতকরা ৩০ বা তার বেশী মানুষ কথা বলেন তবে সেই এলাকার প্রশাসনিক কাজকর্ম ওই এলাকার দুটি ভাষাতেই করতে হবে।

৩৫০ চ — কোন দ্বিভাষিক এলাকায় ভাষাভিত্তিক সংখ্যালঘু মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫০ ভাগের কম না হলে সেখানে একটি সংখ্যালঘু পরিষদ প্রতিষ্ঠা করতে হবে এমনভাবে যাতে লোকসভা সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা এবং তাদের জীবনমানও ভাষার উন্নতির স্বার্থে আইন তৈরী করে পরিষদকে সেই ক্ষমতা দিতে পারে।

৩৫০ ছ—(১) সংখ্যালঘুদের অভাব অভিযোগের ব্যাপারে, তাদের প্রতি প্রতিশ্রুতি-মত সুরক্ষার কাজ হচ্ছে কিনা সেই ব্যাপারে রাজ্যে এবং কেন্দ্রে যথাযোগ্য কর্তৃত্বসম্পন্ন একটি সংস্থা স্থাপন করতে হবে যে সংস্থা রাষ্ট্রপতির কাছে এইসব বিষয় জানাবে। এরকম প্রত্যেকটি রিপোর্ট সংসদে পেশ করতে হবে।

২) রিপোর্ট সংসদে আলোচিত হবার পর কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্ত সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কাছে রাষ্ট্রপতির নির্দেশ হিসেবে পাঠাতে হবে যা পালন করা রাজ্য সরকারের কাছে হবে বাধ্যতামূলক।

লোকসভায় 'সেচ ও শক্তি মন্ত্রক' এর উপর আলোচনায় অনুদানের দাবী তুলে বক্তব্য

৩১ জুলাই ১৯৫৭

দশরথ দেব ঃ আমরা একটা গুরুত্বপূর্ণ দপ্তর নিয়ে আলোচনা করছি। আমাদের দেশে এই দপ্তরকে খুবই দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হবে। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ও তার রূপায়ণে দপ্তরকে আরো বিশেষভাবে মনোযোগ দিতে হবে।

আমি বিশেষ করে আমার ছোট্ট রাজ্য ত্রিপুরা সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই। ভৌগোলিক আয়তনের দিক থেকে এই রাজ্যটি খুবই ছোট। কিন্তু আমাদের রাজ্যে অনেক বিরাট সমস্যা রয়েছে যার সমাধান হয়নি। আপনি জানেন যে আমাদের রাজ্যটি একটি পাহাড়ী রাজ্য। আমাদের রাজ্যে উৎপাদন বাড়াতে গেলে আমাদের প্রয়োজন সুষ্ঠু জলসেচ ব্যবস্থার। এই রাজ্যে দু ধরণের মানুষ রয়েছেন ঃ এক ধরনের মানুষ সমতলবাসী, অন্যরা পাহাড়ে বসবাস করেন। যে সব মানুষ পাহাড়ে থাকেন তাদের জন্য একরকম এবং সমতলবাসীদের জন্য আরেক রকম জলসেচ ব্যবস্থার প্রয়োজন। পরিকল্পা রূপায়ণ করতে গিয়ে দপ্তরকে একথা মনে রাখতে হবে।

আমি জলসেচ ও শক্তি দপ্তরের পরিকল্পনাগুলো দেখছিলাম। তাতে দেখেছি প্রথম পরিকল্পনায় আমাদের রাজ্যের জন্য কোন জলসেচ পরিকল্পনা ছিল না। দ্বিতীয় পরিকল্পনাতে ও আমাদের রাজ্যের জন্য বেশী কিছু জলসেচ প্রকল্প নেই। খুব সামান্য পরিমাণ অর্থ শুধু বাজেটে রাখা হয়েছে এবং সেটাও কেবল অনুসন্ধানের কাজের জন্য। গত বছরও আমরা জলসেচ ও শক্তি দপ্তরের মন্ত্রীর সঙ্গে এই সমস্যা নিয়ে কথা বলেছিলাম। সে সময় ও আমাদের কাছে কতগুলো পরিকল্পনা পাঠানো হয়েছিল। আমরা দেখলাম নির্দিষ্ট কতগুলো প্রকল্পের কাজ শুধু করা হবে যার জন্য বাজেটে নির্দিষ্ট কিছু অর্থ রাখা হয়েছে শুধু অনুসন্ধানমূলক কাজের জন্য। আমার জানা নেই দপ্তরের কাজে কতদূর অগ্রগতি হয়েছে। মনে হয় তাদের কাজ এখন পর্যন্ত অনুসন্ধানের কাজের বেশী এগোয় নি।

আমাদের রাজ্যটি খাদ্যের দিক থেকে একটি ঘাটতি অঞ্চল। সংসদের প্রত্যেক সাংসদেরই জানা আছে যে আমাদের রাজ্যে প্রতিবছরই কেন্দ্রকে চাল সরবরাহ করতে হয়। এমন কি এ বছরেও আমাদের রাজ্যে কিছু চাল পাঠাতে হবে। কিন্তু সরকারের দিক থেকে

এখন পর্যন্ত কোন সক্রিয় পদক্ষেপ নেয়া হয়নি, জলসেচ ব্যবস্থা — যার সাহায্যে জমির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে — তার ক্ষেত্রে ও কোন পদক্ষেপ নেয়া হয়নি। আমাদের কেন্দ্রীয় দপ্তরের সেদিকে কোন চিন্তাভাবনা নেই।

আমি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে চাই যে আমাদের রাজ্যের জন্য এক গুচ্ছ ক্ষুদ্র জলসেচ প্রকল্প একান্তই দরকার। আগে বলেছিলাম যে আমাদের রাজ্যটা পাহাড়ী রাজ্য। যতদূর আমি জানি- একজন প্রযুক্তিবিদের ধারণা থেকে নয়, একেবারে সাধারণ ধারণা থেকেই যে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে বৃহৎ জলসেচ প্রকল্প যেমন সম্ভব নয় তেমনি বাঞ্ছনীয় ও নয়। আমি মনে করি সে সব ক্ষেত্রে ছোট ছোট সেচ প্রকল্প গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পাহাড়ী এলাকার মানুষের মধ্যেও বেশ উদ্যোগ রয়েছে। তারা পাহাড়ী নদীগুলোতে ছোট ছোট বাঁধ দেয় আর বাঁধে সংগৃহীত জল তাদের খেতে নেবার ব্যবস্থা করে থাকে। অর্থের অভাবের জন্য এবং দারিদ্র্যের জন্য তারা ঐসব নদীতে শক্তপোক্ত বাঁধ তৈরী করতে পারে না। তারা বাঁধের কাজে কেবলমাত্র মাটিই ব্যবহার করে থাকে। ইট, সিমেন্ট ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারে না। বৃষ্টি হলেই কখন কখন বাঁধগুলো ভেঙে পড়ে। সারা বছর ধরে জল পাওয়া সম্ভব নয় — ফলে খেতগুলো অবহেলিত অবস্থায় পড়ে থাকে। বাঁধ ছাড়া পাহাড়ে কোন কিছুরই চাষ করা সম্ভব নয়— কারণ জল ধরে রাখার ব্যবস্থা নেই সেখানে। এই হচ্ছে সেখানকার অবস্থা। বেশ কয়েকবার আমি সেচ দপ্তর ও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি এ ব্যাপারে। আমি জানিয়েছি যে আমাদের রাজ্যের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হোক, কমপক্ষে কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেয়া হোক। কৃষকদের যদি আর্থিক সাহায্য দেয়া হয় তবে কৃষকরা ও কিছু পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে পারবে। এভাবে এগোলে পাকাপোক্ত বাঁধ নির্মাণের কাজ সহজ হবে। যদি তা করা যায় তবে আরো অনেক জমিতে জলসেচ করা যাবে। তাতে আমাদের উৎপাদনের পরিমাণ ও অনেকটা বাড়বে।

এবার আমি বন্যানিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার প্রশ্নে আসছি। গত তিন চার বছর ধরে আমাদের রাজ্য বন্যার বিপর্যয়ের মুখে পড়ছে। গত বছরে বিশেষ করে, বন্যা খুব খারাপ চেহারা নিয়েছিল, আমাদের রাজধানী শহর ও কয়েকদিন জলের তলায় ছিল। বন্যার জন্য আমাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বন্যায় আক্রান্ত এলাকার নদীগুলোতে বাঁধ তৈরীর কিছু কিছু পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে — বিশেষ করে মহকুমা শহরগুলোকে বাঁচানোর জন্য। তবে, এখনো পর্যন্ত জমি এবং শস্য রক্ষার জন্য কোন পরিকল্পনা নেয়া হয়নি। আমি এদিকে মনোযোগ দেবার জন্য মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। কারণ ফসল রক্ষা করা না গেলে আমাদের রাজ্যের খাদ্য সমস্যার ও সমাধান করা যাবে না। আমরা পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্য ভান্ডার গড়ে

তুলতে চাই। ১৯৪৭ এর আগে ত্রিপুরা ছিল খাদ্যে উদ্বৃত্ত রাজ্য। ১৯৪৯ এর পর থেকে এখানে শরণার্থীরা ব্যাপক সংখ্যায় আসায় রাজ্যের জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। আবার জনসংখ্যা বৃদ্ধির তুলনায় কর্ষণযোগ্য জমির অনুপাত মোটেই বাড়েনি। এর ফলে আমাদের রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব ও নয়। যদি কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়, যদি আরো বেশী পরিমাণ জমি জলসেচের আওতায় আনা যায় তাহলে আমাদের জমির উৎপাদন ক্ষমতা নানাভাবে বৃদ্ধি পাবে।

নদী বাঁধ পরিকল্পনার ব্যাপারে যতদূর আমি জানি আগরতলা ছাড়া আর কোথাও বাস্তবিকভাবে কাজ ধরা হয়নি। কেবলমাত্র এটুকুই আমরা জানি যে কিছু কিছু অনুসন্ধানের কাজ চলছে। এটাও আমাদের বলা হয়েছে যে টেকনিক্যাল যোগ্যতাসম্পন্ন লোকের অভাবের জন্য এই কাজ করা যায়নি। কিন্তু কথা হচ্ছে কতদিন পর্যন্ত এ রকম টেকনিক্যাল লোকের অভাব থাকবে তা আমার জানা নেই। কিন্তু এই অজুহাতে এই পরিকল্পনা বাতিল করা উচিত হবে না। বরঞ্চ দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই কাজ রূপায়িত করা এবং সম্পূর্ণ করা উচিত হবে বলে মনে করি।

আমাদের রাজ্যে এমন কিছু কিছু পাহাড়ী নদী আছে যেগুলো পাহাড় থেকে সমতলে এসে প্রচন্ড গতিবেগ অর্জন করে। আমি দপ্তরকে অনুরোধ করছি এরকম ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার সম্ভাব্যতা খতিয়ে দেখতে। এরকম একটি মাত্র পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে এবং তার জন্য এই বছরের বাজেটে মাত্র ৪১,০০০ টাকা ধরা হয়েছে। এত কম পরিমাণ অর্থে কি কাজ করা যাবে আমার জানা নেই।

সমগ্র রাজ্যে সেচব্যবস্থা অবহেলিত। বর্তমানে বৎসরে মাত্র ৯০০০ টাকা ধরা হয়েছে। সমষ্টি উন্নয়ন পরিকল্পনা খাতে ২,২০০ টাকা এবং সেচের জন্য এন ই এস ব্লকের ক্ষেত্রে ৭,০০০ টাকা দেয়া হয়েছে। এই অর্থ অতি সামান্য। এত সামান্য অর্থে আমরা কি ভাবে এগোব আমার জানা নেই। দপ্তরকে ব্যাখ্যা করতে হবে আমাদের রাজ্যের জন্য কেন এত সামান্য পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে।

প্রথম পরিকল্পনার পর্যালোচনা পড়ে আমি খুবই দুঃখিত হয়েছি এজন্য যে সেখানে কোথাও আমাদের রাজ্যের প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। যেহেতু দপ্তরের কোন কাজ এখানে হয়নি যেহেতু এই রাজ্যের প্রসঙ্গ ও বাদ গেছে। কেবলমাত্র কোন কোন জায়গায় একটা লাইন আছে যেখানে বলা হচ্ছে যে ত্রিপুরা, কুর্গ ও অন্যান্য জায়গায় বিভিন্নরকম সেচের কাজ হাতে নেয়া হচ্ছে। কেবলমাত্র এ রকম প্রসঙ্গই আছে যা কি না আমাদের কোন হদিশ দিতে পারে না।

বিদ্যুৎ সরবরাহের ক্ষেত্রে আগরতলা পাওয়ার স্টেশন এক্সটেনশন স্কিমের জন্য কিছু পরিমাণ অর্থ অনুমোদিত হয়েছে। প্রথম পরিকল্পনাকালেই এটার পরিকল্পনা হয়েছিল এবং কাজ ও শুরু হয়েছিল। যতদূর আমি জানি এক্সটেনশনের কাজ এখন পর্যন্ত শুরু হয়নি এবং আমরা রাজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ পাচ্ছি না।

আরেকটি প্রধান শহরে বাইশ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার উল্লেখ দেখছি কিন্তু আমার জানা নেই সেটি কোন শহরে হতে যাচ্ছে। মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে আমার অনুরোধ পরিকল্পনা যা-ই হোক না কেন, তা যেন যত্ন সহকারে বাস্তবায়িত হয় তা যেন কাগজেই না থেকে যায়। আমার আরেকটি অনুরোধ এ রাজ্যে কিছু পাম্পিং সেট বসানো হোক এবং পরীক্ষা করে দেখা হোক সেগুলো পাহাড়ী জায়গায় সেচ দেবার পক্ষে কার্যকর কিনা। যদি এটা করা সম্ভব হয় এবং সেটগুলো কার্যকরী হয় তবে দপ্তরকে অনুরোধ জানাচ্ছি সেগুলো সরবরাহ করতে এবং আমাদের রাজ্যে তার প্রচলন ঘটাতে।

রেল সংক্রান্ত বক্তব্য

১৯ জুলাই, ১৯৫৭

অন্য রাজ্যের চাইতে আমাদের রাজ্যের সমস্যার প্রকৃতি ভিন্ন। যেসব মাননীয় সদস্যরা দাবী জানাচ্ছেন তাঁদের রাজ্যে রেললাইন রয়েছে এবং তাঁরা রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে রেল সম্প্রসারণের দাবী করছেন। কিন্তু আমাদের রাজ্যে কোন রেল সংযোগ নেই, কোন রেললাইন ও নেই। লোকসভার প্রথম অধিবেশনের সময় থেকেই আমরা আমাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়েছি এবং ত্রিপুরার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে অন্ততঃ একটি রেললাইন করার জন্য ত্রিপুরার মানুষের আকাঙ্ক্ষার কথা জানিয়ে আসছি। যখন প্রথম পরিকল্পনা রচিত হয়েছিল তখন আসামের মধ্যে দিয়ে সংযোগসূত্র রাখার জন্য কিছু ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। প্রথম পরিকল্পনা চলাকালেই এই ব্যবস্থা গ্রহণ পিছিয়ে দেয়া হয়। এখন প্রথম পরিকল্পনা শেষ। দ্বিতীয় পরিকল্পনার কাজ শুরু হয়েছে। এমনকি এই দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেও এ জন্য কোন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার আমাদের রাজ্যে কিছু উন্নয়নমূলক কাজ নেবার পরিকল্পনা করছেন। রেল যোগাযোগ স্থাপন না করে কেন্দ্রীয় সরকার এ সব কাজ কিভাবে করবেন আর ত্রিপুরাই বা কিভাবে সমৃদ্ধি লাভ করবে? রেল যোগাযোগ আমাদের রাজ্যে নেই বলে আমাদের সমস্যা প্রতি বছর তীব্র আকার ধারণ করছে। আপনি জানেন যে আমাদের রাজ্যটি একটি সীমান্ত এলাকা যার তিনদিক পাকিস্তান দিয়ে ঘেরা। আসামের সঙ্গে একটা সংকীর্ণ যোগাযোগ মাত্র রয়েছে আমাদের। একটি জাতীয় সড়ক রয়েছে সেখানে। কিন্তু রাস্তাটি সবরকম ঋতুর পক্ষে উপযুক্ত নয়। কেবলমাত্র গরমের সময়ই সড়কটি ব্যবহার করা যায়। শীতের সময় এমনকি একটা জিপ-গাড়ী ও সেই রাস্তায় চালানো কষ্টকর।

গত তিন-চার বছর ধরে ত্রিপুরা খাদ্য সংকটে ভুগছে। এমনকি এ বছরেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যের জন্য ২০,০০০ টন খাদ্য অনুমোদন করেছে। এই চাল সঠিক সময়ে রাজ্যে এসে পৌঁছায় নি। ৬-৭ দিন আগে আমি চীফ কমিশনার এবং জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করেছিলাম— তাদের সঙ্গে আমার এ ব্যাপারে কথা হয়েছিল। রাজ্যের মানুষ ভুগছে। এমন কি এখনও গ্রাম এলাকায় চালের মন ২৬, ৩৬ অথবা ৩৮ টাকা। সবচেয়ে কম হচ্ছে ২৫ টাকা মণ। কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদিত চাল সঠিকসময়ে রাজ্যে পৌঁছতে পারেনি কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যা। পাকিস্তান সরকার আমাদের চাল বহন করার জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ওয়াগন সরবরাহ করতে পারেনি। যদি যানবাহনের এই সমস্যা অবহেলা করা হয়, যদি আমাদের রেল সংযোগ না দেয়া হয় তাহলে এই সমস্যা থেকে

মুক্তি নেই। আমাদের আরো বেশী করে ভুগতে হবে তাহলে। এমনকি অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র ও ভারত থেকেই আমাদের আমদানী করতে হয়। আর সেজন্য বিমান পরিবহন — যেটা অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ — তার উপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। ত্রিপুরাতে মূল্যসূচক এত ওপরে যে গরীব মানুষের পক্ষে তা বহন করা সম্ভব হয় না। ত্রিপুরাতে আমাদের কিছু কাঁচা মাল রয়েছে — পাট, আনারস, বাঁশ ও অন্যান্য জিনিষ। অন্য রাজ্যে আমাদের তা রপ্তানি করতে হবে। কিন্তু যোগাযোগ ব্যবস্থার সমস্যার জন্য তা রপ্তানি করা সম্ভবপর নয়। যদি রেল যোগাযোগ না হয় আমাদের দুরবস্থা আরো বাড়বে, আর জনগণ ও অসন্তুষ্ট থাকবে। ত্রিপুরার মানুষের পক্ষে আমি রেলমন্ত্রীকে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি রেলের ব্যাপারে একটু ভাবতে যাতে দ্বিতীয় পরিকল্পনাতেই রেল যোগাযোগের বিষয়টির অন্তর্ভুক্তি ঘটে।

ত্রিপুরার কিছু মানুষ ইতিমধ্যেই রেলওয়ে কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করেছে যাতে কংগ্রেস, অ-কংগ্রেস এবং সবরকম রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা রয়েছেন। এই কমিটি পাঁচ বছর আগে ভারত সরকারের কাছে একটি স্মারকলিপি পেশ করেছে। তখন থেকে বারবারই তারা কেন্দ্রীয় সরকারকে রেলের ব্যাপারে মনে করিয়ে দিচ্ছে। সেই স্মারকলিপিতে আমরা যথেষ্ট কারণ দেখিয়ে রেলের প্রয়োজনীয়তার কথা এবং কিভাবে সেই সমস্যার মোকাবিলা করতে হবে ও সমস্যার সমাধান করতে হবে তার উল্লেখ করেছি। এখন পর্যন্ত সরকারের কাছ থেকে আমরা কোন অনুকূল উত্তর পাইনি। যতবারই আমরা লোকসভায় আমাদের আকাংক্ষার কথা ব্যক্ত করি ও দাবী জানাই ততবারই আমাদের বলা হচ্ছে যে অর্থের অভাব রয়েছে এবং ত্রিপুরার মত একটি পশ্চাদ্পদ এলাকায় রেল যোগযোগ প্রতিষ্ঠা করতে গেলে বিরাট খরচের বোঝা বহন করতে হবে সরকারকে। বিরাট খরচের অজুহাতে ত্রিপুরাকে রেল যোগাযোগথেকে বঞ্চিত করা এবং দ্বিতীয় পরিকল্পনার সুফল থেকে বঞ্চিত করা উচিত হবে না।

এখন পর্যন্ত বিশেষ কয়েকটা জাতীয় সড়কের কাজ চলছে। কেন্দ্রীয় সরকার একাজের দায়িত্ব নিয়েছে এবং কিছু কিছু কাজ শেষ হবার পথে। জাতীয় সড়কের মধ্যে বেশ কিছু নদীও পড়েছে। এইসব পাহাড়ী নদীর ওপর পাকা সেতু নির্মাণ করা যায়নি কারণ যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকার জন্য সেতু নির্মাণের সামগ্রী ত্রিপুরাতে আনা সম্ভব পর হয়নি। এ রকম সব সমস্যাই রয়েছে। এইসব সমস্যার কথা বিচার করে আমি রেলদপ্তরকে অনুরোধ জানাচ্ছি খুব সহানুভূতির সঙ্গে আমাদের বিষয়টা বিচার করতে। দ্বিতীয় পরিকল্পনা চলার সময় ও যাতে এই বিষয়টার প্রয়োজনীয়তা প্ল্যানিং কমিশনকে বোঝানোর প্রয়াস চালানো হয় তার জন্যও রেলদপ্তরকে অনুরোধ জানাচ্ছি। ত্রিপুরা রাজ্যে রেললাইনের কাজ শুরু করতে হবে — এটাই আমার বক্তব্য।

একটি মৌলিক অধিকার

বিধান সভার দাবী ত্রিপুরার জনগণের দীর্ঘদিনের দাবী। এই দাবী নিয়া ত্রিপুরার মানুষ বহু সংগ্রাম করিয়া আসিতেছেন। গণতন্ত্রকামী ত্রিপুরায় জনসাধারণের সেই সংগ্রাম আজও শেষ হয় নাই।

দীর্ঘদিনের বহু আন্দোলনের ভিতর দিয়া ত্রিপুরায় জনসাধারণ বহু গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করিতে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু বিগত বার বৎসরের চীফ কমিশনারের শাসনের তিক্ত অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে ইহাই প্রমাণ করিয়াছে যে রাজ্য শাসন ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক কতৃত্ব ও দায়িত্ব পুরাপুরিভাবে জনসাধারণের হাতে না আসিলে ত্রিপুরায় বর্তমান শোচনীয় অবস্থার অবসান ঘটাইয়া কোন মৌলিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব নয়। এই বাস্তব অবস্থার অভিজ্ঞতা আজ জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও কর্ম নির্বিশেষে ত্রিপুরা রাজ্যের সকল অধিবাসীকেই বিধানসভা লাভের জন্য আগ্রহশীল করিয়া তুলিয়াছে, বিধানসভা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন দাবীকে জোরদার করিয়া তুলিয়াছে। প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র নাগা রাজ্যেও বিধানসভা স্থাপনের সম্ভাবনা সূচিত হওয়ায় ত্রিপুরা রাজ্যের ব্যাপক জনসাধরণের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়তর হইয়াছে যে ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মাধ্যমে ত্রিপুরাতেও বিধানসভা প্রতিষ্ঠার সার্বজনীন দাবী আদায় করা সম্ভব এবং গণতান্ত্রিক পূর্ণতার রূপ দিবার জন্য তাহাই করিতে হইবে।

এই দাবীর পূর্ণতর রূপ দেওয়ার জন্য ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলনের আহ্বান দিয়াছেন ত্রিপুরায় কমিউনিস্টপার্টি, প্রজা সমাজতন্ত্রী দল, বিপ্লবী সমাজতন্ত্রী দল এবং তপশীলি ভুক্ত জাতি সমিতির নেতৃবৃন্দ, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক ও শিক্ষাবিদ, ব্যবসায়ী এবং অন্যান্য গণতন্ত্রী মানুষ। তাহারা সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন — বিধানসভা লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধ সর্বদলীয় গণআন্দোলন গড়িয়া তুলিতে।

এই বিধানসভার আন্দোলনের প্রস্তুতির শুরুতেই বিধানসভার বিরোধী অংশ নানারূপ বিভ্রান্তিকর মতামত প্রচার শুরু করিয়াছেন। শুধু তাহাই নয়, এই আন্দোলনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অংশীদার কমিউনিস্ট পার্টি সম্পর্কেও পরোক্ষ ইঙ্গিত করা হইয়াছে। তাহাদের বক্তব্য পড়িলে মনে হইবে যেন ত্রিপুরায় দ্বায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে কোন দিনই কমিউনিস্ট পার্টির কোন ভূমিকা ছিল না। প্রাক স্বাধীনতার যুগে দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের উল্লেখ করিয়া ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদকেই (পরবর্তী পর্যায়ে রাজ্য কংগ্রেসে রূপান্তরিত) দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূল নেতা হিসাবে দাবী করা হইয়াছে। ত্রিপুরাবাসীকে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে স্মরণ করাইয়া দেওয়ার খাতিরে এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও উল্লেখ করিতে হয় যে প্রাক স্বাধীনতা যুগে ত্রিপুরায়

দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের মূল নেতা এবং সবচেয়ে গণভিত্তিক সংগঠন ছিল ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডল। কমিউনিস্ট কর্মীরাই রাজ্যের প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গকে নিয়া এই সমিতি গঠন করিয়াছিলেন। এই সমিতি কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক নেতৃত্বে পরিচালিত একটি সংগঠন। দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন পরিচালনা করিতে গিয়া রাজার আমলে এবং পরবর্তী সময়ে (স্বাধীনতা লাভের পর) শাসকবর্গের রোষানলে পড়িতে হইয়াছিল এই সমিতির নেতৃবর্গকেই। দ্বিতীয়তঃ প্রাক স্বাধীনতার যুগে সারা ভারতের দেশীয় রাজ্য প্রজাসম্মেলনের শেষ অধিবেশনে (গোয়ালিয়রে অনুষ্ঠিত) ত্রিপুরা রাজ্য প্রজামন্ডলের প্রতিনিধি শ্রী বীরেন দত্ত, শ্রী বীরচন্দ্র দেববর্মা এবং শ্রী সুধন্না দেববর্মা যোগদান করেন। তাহারাই সম্মেলনের স্বীকৃত প্রতিনিধি হিসাবে সম্মেলনে যোগদান করেন। ত্রিপুরা রাজ্য গণপরিষদের (স্টেট কংগ্রেস) প্রতিনিধিরা সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে স্বীকৃতি পান নাই।

স্বাধীনতা উত্তরযুগে ত্রিপুরায় পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ত্রিপুরার কোন রাজনৈতিক দলের কি ভূমিকা তাহা উল্লেক করা নিষ্প্রয়োজন। ১৯৫৬ সালে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন ত্রিপুরার আসাম অন্তর্ভুক্তির সুপারিশ করেন। ত্রিপুরায় একধরনের রাজনীতিজ্ঞরা – রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা তখন প্রথম প্রথম রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের বক্তব্যের সাথ একমত হইয়া প্রচার করিয়াছিলেন যে, গণতন্ত্রের স্বাদ ভোগ করিতে হইলে ত্রিপুরাবাসীদের আসাম অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাবকে বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখা কর্তব্য।

এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যের মাটিতে গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতির দাবী রাজনৈতিক বিলাসিতা ছাড়া আর কি হইতে পারে এমন বক্তব্যও তাহাদের কেহ কেহ জনগণের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ত্রিপুরার আয় কম, তদুপরি পাকিস্তান কর্তৃক পরিবেষ্ঠিত – কাজেই দেশরক্ষার প্রশ্ন জড়িত।

এই সব প্রশ্নগুলি উত্থাপন করিয়া ত্রিপুরার জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির প্রয়াস পাইয়াছিলেন। কিন্তু বিধানসভাসহ স্বতন্ত্র ত্রিপুরায় অস্তিত্ব রক্ষার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি সমেত ত্রিপুরার অন্যান্য বামপন্থী দল ও ব্যক্তিত্ব সেই দিনের সেই গৌরবময় সংগ্রামের কথা নিশ্চয়ই ত্রিপুরাবাসী এত সহজে ভুলিয়া যাইতে পারেন না। প্রবল জনবিরোধীতার সম্মুখীন হওয়ায় রাজ্য কংগ্রেসের নেতারা পরবর্তী সময়ে এই বিধানসভাসহ স্বতন্ত্র ত্রিপুরার অস্তিত্ব রক্ষার আন্দোলনের প্রকাশ্য বিরোধীতার কাজ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য হন – সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতারাও আংশিকভাবে ত্রিপুরার দাবী মানিয়া লইতে বাধ্য হন। বিধানসভা পাওয়া যায় নাই একথা ঠিক। কিন্তু ত্রিপুরাকে স্বতন্ত্র রাখা সম্ভব হইয়াছে। গণ বিক্ষোভের হাত হইতে সাময়িকভাবে হইলেও শাসক গোষ্ঠীর আত্মরক্ষার উপায় হিসাবে সীমাবদ্ধ ক্ষমতা সম্পন্ন একটি আঞ্চলিক পরিষদ ত্রিপুরায় চালু করিতে হইয়াছিল। ইহাকে আমরা গণতান্ত্রিক শক্তির বিজয়রূপেই দেখিয়াছিলাম। এখনও তাই দেখি। এই

বিজয়কে খাটো করিয়া দেখার কোন প্রশ্নই উঠেনা। তখন কংগ্রেস নেতাদের রাজনীতি মানিয়া নিলে এতক্ষণে ত্রিপুরা আসাম প্রদেশের একটি জেলায় পরিণত হইত। বর্তমানে দেখা যায় ত্রিপুরার সেই আংশিক বিজয়কে পূর্ণতর রূপ দেওয়ার জন্য ত্রিপুরায় গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দল ও ব্যক্তিবর্গ আবার সম্মিলিতভাবে আন্দোলনের ডাক দিয়াছেন। দৃঢ় আন্দোলন পরিচালনার জন্য সংকল্প গ্রহণ করিতেছেন।

প্রথমতঃ প্রশ্ন কার হইয়াছে যে "যেখানে উন্নয়নের জন্য ত্রিপুরাকে প্রতি পদক্ষেপে কেন্দ্রীয় সরকারের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হয় সেখানে কতখানি গণতান্ত্রিক অধিকার ভোগ করা সম্ভব হইবে তাহা ভাবিয়া দেখা দরকার"।

এই প্রশ্নটি আদৌ নূতন নয়। অনগ্রসর এলাকাগুলির পূর্ণতর বিকাশ সাধণের জন্য আর্থিক ও অন্যান্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের মূল দায়িত্ব সকল সময়েই কেন্দ্রীয় সরকারকেই বহন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকার সেই দায়িত্ব কখনও অস্বীকার বা অবহেলা করিতে পারেন না। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ইহাই স্বভাবিক নিয়ম। দেশের সম্পদ প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন রাজ্য সমূহে বিতরণ কারিয়া, ভারত রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্নরাজ্য সমূহের অসম বিকাশের রূপান্তর সাধন করিয়া সকল রাজ্যকে সমপরিমাণে বিকাশশীল করিয়া তোলার দায়িত্ব কেন্দ্রীয় সরকারের। কেন্দ্রীয় সরকার এই দায়িত্ব এড়াইতে পারেন না। ত্রিপুরাকে আর্থিক সাহায্য দিলে কেন্দ্রীয় সরকার তাহার দায়িত্বই পালন করিবেন। দায়িত্ব পালনের মধ্যে দয়া বা অনুকম্পার প্রশ্নই আসেনা। এই সাহায্য পাইবার অধিকার ত্রিপুরাবাসীর আছে।

ত্রিপুরাকে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আরো বেশী পরিমাণে সাহায্য লইতে হইবে। কিন্তু তার জন্য ত্রিপুরাবাসীকে তাহাদের সকল গণতান্ত্রিক অধিকার কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সমর্পণ করিয়া দিতে হইবে বা বিক্রয় করিয়া দিতে হইবে কেন? আর্থিক সাহায্য দেওয়ার বিনিময়ে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরাবাসীর সেই মৌলিক অধিকার হরণ করিবেন কেন? ইহা কোন গণতন্ত্রের নির্দশন? আর্থিক সাহায্য পাওয়ার মূল্য হিসাবে যাহারা আজ ত্রিপুরাসাবীকে গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচন বা বিসর্জনের পরামর্শ দেন তাহাদের সেই চিন্তাধারা কত প্রতিক্রীয়াশীল ও অগণতান্ত্রিক তাহা আর ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন পড়ে না। এই যুক্তির সাথে সাম্রাজ্যবাদীদের ঔপনিবেশিকতা বাঁচাইয়া রাখার বা পরাধীন সমূহের স্বাধীনতা না দেওয়ার যুক্তির সাথে অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। যার আর্থিক সঙ্গতি নাই তার পক্ষে অন্যের নিকট - কিছু গণতান্ত্রিক অধিকার ছাড়িয়াই দিতে হইবে — দেওয়া প্রয়োজন এইরূপ তত্ত্ব খাড়া করিয়া ত্রিপুরাবাসীকে চীফ কমিশনারী শাসনেই তুষ্ট থাকার জন্য প্রবোধ দিতেছেন। এই ধরনের মতবাদের প্রবক্তারা গণতান্ত্রিক অধিকারের সংজ্ঞার পরিবর্তন হইতে চলিয়াছে এইরূপ ইঙ্গিত প্রশ্ন তুলিয়াছেন "ত্রিপুরার মত সর্ব বিষয়ে অনগ্রসর অঞ্চলের পক্ষে কতটুকু অধিকার ভোগ করা সম্ভব। তাই বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে স্বেচ্ছায়

গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচনের জন্য তৈরী হইতে ত্রিপুরাবাসীকে উপদেশ দিতেছেন।

আকারে ছোট বা আর্থিক দুর্বলতা বা অনগ্রসরতার জন্য কোন রাজ্য বা প্রদেশ বা জাতি বা জাতিসমূহের স্বাধীনতাকে অস্বীকার করা যায় না — তাহাদের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্বকরা যায় না। এই অধিকার খর্ব করার মতবাদ হইল প্রতিক্রিয়াশীল ও প্রগতি বিরোধী মতবাদ। তাহা গণতন্ত্র বিরোধী ও বৃহত্তর স্বার্থ বিরোধী।

দেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচন অনিবার্য নয় — জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করিয়া সমাজ ও রাষ্ট্রগঠনে দেশের জনগণকে অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ ও কর্তৃত্ব দিয়াই দেশকে গড়িয়া তুলিতে হয়। এই পথেই বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষিত হইবে। দেশের বৃহত্তর জনসমষ্টি গণতান্ত্রিক অধিকার সঙ্কোচন বা খর্ব করিয়া দেশের বৃহত্তর স্বার্থ রক্ষা করা যায় না। তাহাতে মুষ্টিমেয় কায়েমী স্বার্থের স্বার্থ অধিকতর নিরাপদ করা যাইবে মাত্র। দেশের বৃহত্তর জনস্বার্থ রক্ষা করিতে হইলে, দেশ ও জাতিকে গড়িয়া তুলিতে হইলে দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তাই সমধিক। দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করা এবং দেশের প্রভুত জনশক্তির সদ্ব্যবহার করার সঠিক ও যুগোপযোগী পদ্ধতি গ্রহণের উপরই নির্ভর করে দেশকে দ্রুত অগ্রসর করিয়া নেওয়ার সাফল্য। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ভিন্ন, দেশ গঠনের কাজে জনগণের অংশ গ্রহণের পূর্ণ সুযোগ দান ভিন্ন, দেশের জনশক্তিকে ঐ কাজে আশানুরূপভাবে উদ্বুদ্ধ করা যাইবে না। চীফ কমিশনারী শাসন ব্যবস্থায় আমলাতান্ত্রিক শাসনের মাধ্যমে ত্রিপুরার জনশক্তিকে কজে উদ্বুদ্ধ করিয়া তোলা সহজ নয় সম্ভবও নয়। ত্রিপুরার শাসন ব্যবস্থায় যেভাবে আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারীতা, ব্যভিচার ও দুর্নীতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, যেভাবে আমলাবর্গের ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইতেছে তাহাতে ত্রিপুরার জনগণের কোন সমস্যাই সমাধান সম্ভব নয়। আমলাতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গিতে ও আমলাতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতি কখনও জনগণের মনে দেশাত্মবোধ জাগাইতে পারে না — দেশবাসীর সাথে আন্তরিকভাবে সহযোগিতা করিতে পারে না। দেশ গঠনের বরাদ্দকৃত অর্থের বিরাট অপচয় সাধন করা হইতেছে আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে বজায় রাখিয়া। উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যর্থতা, জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যর্থতা, ত্রিপুরার ভূমি সমস্যা সমাধানে ব্যর্থতা, অর্থাৎ ত্রিপুরাকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া লইবার শত প্রকার ব্যর্থতার মধ্যেই চীফ কমিশনারী একনায়কত্ব শাসন ব্যবস্থার অপদার্থতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের সম্পদ ভাগ বাটোয়ারার কাজে কায়েমী স্বার্থের সাথে, দেশের মুষ্টিমেয় দুর্নীতিগ্রস্ত ব্যক্তি হাত মিলাইতে পারে মাত্র। গত বার বৎসরের ত্রিপুরার চীফ কমিশনারী শাসনের ইতিহাস অন্ততঃ সেই বক্তব্যের সমর্থনে সাক্ষ্য দিবে।

'স্বাধীনতা গড়িয়া তোলার জন্য স্বাধীনতার স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণের' শ্লোগন, স্বাধীনতা

ও গণতন্ত্রের মৌলিক নীতি বিরোধী শ্লোগান। এই শ্লোগানের আড়ালে লুক্কায়িত আছে -- দেশের অগনিত জনসাধারণের বহু সংগ্রামলব্দ — স্বাধীনতাও গণতন্ত্রকে অপহরণ করায় — দেশের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকে একটা শ্রেণীর (ধনিকশ্রেণী) কুক্ষিগত করার দেশের একনায়কত্ব শাসন প্রতিষ্ঠার পরোক্ষ ইঙ্গিত। ইহা প্রতিক্রিয়াশীল মতবাদ। নেপাল ও পাকিস্তানে তাহাই ঘটিতেছে। স্বাধীনতার স্বেচ্ছা নিয়ন্ত্রণ নহে — স্বাধীনতাকে ব্যাপক জনসাধারণের নাগালের মধ্যে আনিয়া ইহার সদব্যবহার করার প্রশ্নই আজিকার দিনে সব চেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

'পরিকল্পনায় পরিধির যতই বিস্তৃতি লাভ ঘটিবে ততই অধিকার বোধ স্বেচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত করিয়া আনিতে হইবে' মর্ম্মে উক্তি করা হইয়াছে। এখানে সঙ্গত কারণেই একটা প্রশ্ন উঠে - এই পরিকল্পনা কাহাদের জন্য ? এই পরিকল্পনাকে স্বার্থক রূপ দেওয়ার দায়িত্ব কাহাদের ? জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষার জন্য তাহাদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ সাধণের নিমিত্তই দেশগঠনের জন্য পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে। কাজেই পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃতির অর্থ হইবে — দেশের জনসাধারণের মুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি — তাহাদের সুযোগ সুবিধা ও কর্মক্ষেত্র বৃদ্ধি, তাহাদের সামজিক নিরাপত্তা বৃদ্ধি। অধিকারবোধ সঙ্কোচনের বা অধিকার খর্ব করার প্রশ্ন আসে কোথা হইতে ? পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য যদি হয় — সাধারণ মানুষের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি না হইয়া অল্প সংখ্যক উপরতলার জনসমষ্ঠির অধিকার সম্প্রসারণের, তাহাদের ক্ষমতা ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধি করার — তখনই ঐসব মুষ্টিমেয় ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর ধনবৃদ্ধি, ক্ষমতা বৃদ্ধি ও একচেটিয়া কায়েমী দখলের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেওয়ার জন্য দেশের বিরাট সংখ্যক জনগণের অধিকার সঙ্কোচিত করার প্রশ্ন আসে। তাহা হইলেই প্রশ্ন উঠিবে — আমরা কি দেশকে সেই অবস্থায় ঠেলিয়া দিব ? না, তাহা হইতে দিব না। দেওয়া উচিত নয়। তাই পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃতির সাথে সাথে জনগণের অধিকার বোধ নিয়ন্ত্রণের এই মতবাদ অত্যন্ত মারাত্মক। ইহা গণতন্ত্রকে হত্যা করার মতবাদ। পরিকল্পনার পরিধি বিস্তৃত এবং ইহার সাফল্য ও গণতন্ত্রের বিকাশের সাথে সাথে দেশের জনসাধারণের দ্বায়িত্ববোধ ও কর্তব্যবোধ বাড়িতে থাকিবে। তাহা প্রতিষ্ঠার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা ও দৃঢ়তাও আরও বাড়িতে থাকিবে। ইহাই সমাজ বিকাশের সাধারণ নিয়ম। এই প্রক্রিয়ার পূর্ণ বিকাশ ঘটাইবার জন্যই গণতন্ত্রের সম্প্রসারণ অপরিহার্য।

'ত্রিপুরার মানুষের বর্তমান আর্থিক দুরবস্থায় জনপ্রতিনিধির দায়িত্ব পালন কিভাবে সম্ভব হইতে পারে' এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া ত্রিপুরার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করার ভার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বেচ্ছাধীনে ছাড়িয়া দেওয়ার ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এখানে মনে রাখা দরকার যে ত্রিপুরাকে গড়িয়া তোলার দায়িত্ব একক ত্রিপুরার নয়। তবে ত্রিপুরাবাসীর দায়িত্ব এখানে স্বভাবতই বেশী হইবে — একথা ঠিক। কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকারেরও তাহাতে বিরাট দায়িত্ব রহিয়াছে। কিন্তু তাছাড়া সেই দায়িত্ব পালন করিবেন কিভাবে ? রাজ্যে চীফ কমিশনারী

শাসন জিয়াইয়া রাখিয়া, আমলাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাঁচাইয়া রাখিয়া, তাহাদের সাথে সমঝোতা করিয়া, তাহাদের সাথে কাজের দায়িত্ব বন্টন করিয়া, রাজ্যে বিভিন্ন স্তরে গণতন্ত্রেরভিত্তিতে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্ম দিয়া? গণতন্ত্রের বিকাশ সাধনই যদি সমাজের লক্ষ্য হয় তাহা হইলে নিঃসন্দেহে বলিতে হইবে যে রাজ্যে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করিয়া, জনপ্রতিনিধিদের হাতে দায়িত্ব অর্পণ করিয়া দেশের জনসাধারণের সাথে দায়িত্ব ও কর্তব্য বন্টন করিয়া নিয়া, দেশ গঠনের সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক পন্থা অনুসরণ করিয়াই কেন্দ্রীয় সরকারকে রাজ্যের পূর্ণতর বিকাশ সাধন করিতে হইবে। কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতায় ত্রিপুরায় জন প্রতিনিধিরা সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণসক্ষম। চীফ কমিশনারের হাতে কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার উন্নয়নে অর্থ তুলিয়া দিতে পারেন, কিন্তু বিধানসভা প্রবর্তিত হইলে জনপ্রতিনিধিদের হাতে সেই অর্থ তুলিয়া দিতে পারেন না — ইহা কোন যুক্তি হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ ত্রিপুরার জন্য দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পরোক্ষ বিরোধিতা হিসাবে আরও একটি ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টির চেষ্টা করা হইয়াছে। আগে সংবিধানের পরিবর্তন না করিয়া ইউনিয়ন টেরিটরিতে কিভাবে বিধানসভা দেওয়া যাইবে তাহা ভাবিয়া দেখার জন্য বলা হইয়াছে। এই যুক্তিকে বালখিল্য ছাড়া আর কি বলা যায়। এই যুক্তির উত্থাপনকারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য বলা প্রয়োজন যে সংবিধান রচিত হইবার পর আজ পর্যন্ত নয় বারেরও বেশী সংশোধন করা হইয়াছে। কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে দেশের শাসক গোষ্ঠী প্রতিবৎসর ইচ্ছামত সংবিধান সংশোধন করিয়া চলিয়াছেন। বেরুবাড়ী হস্তান্তরের জন্য সংবিধান সংশোধন ইহার আধুনিকতম প্রমাণ। ত্রিপুরাবাসীর গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে ভারতের সংবিধানে কোন অন্তরায় থাকিলে তাহা সংশোধন করা হইবে না কেন? আগে সংবিধান সংশোধন বা আইনের প্রনয়ণের প্রশ্ন বড় নহে — বড় প্রশ্ন হইল নীতি নির্ধারণ। নীতি নির্ধারণ হইয়া গেলে তাহার ব্যবহারিক প্রয়োগের অনুকূলে সংবিধান সংশোধন ও আইন প্রণয়নের কোন বাধা থাকিতে পারে না। বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাহাই করা হইয়াছে। ভারতে ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাজ্য পুর্নগঠন কমিশনের সুপারিশ আসার পর তদ অনুকলে সংবিধান সংশোধন ও আইন প্রণয়ন করিয়া সেই সুপারিশকে কার্য্যত রূপ দেওয়া হয়। ত্রিপুরাকে আঞ্চলিক পরিষদ দেওয়া হয়। আইন বা সংবিধান ধর্মীয় বিধানের মত অপরিবর্তনীয় নয়। সংবিধান বা আইনের প্রয়োজনে রাষ্ট্র বা মানুষ নহে — রাষ্ট্র বা মানুষের প্রয়োজনেই সংবিধান বা আইন রচিত হয়। কাজেই মানুষের গণতান্ত্রিক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য সেগুলির সংশোধন সময় সময় অবশ্যম্ভাবী। সংবিধানের যে ধারা মানুষের কাজে লাগে না — উপকারের বিনিময়ে অপকার করে তাহা সংশোদন করার বা মুলগ্রন্থ হইতে সম্পূর্ণ মুছিয়া ফেলিবার পূর্ণ অধিকার দেশের মানুষের আছে। এই অধিকারকে অস্বীকার করার অর্থ নিজের অস্তিত্ব বা সত্ত্বাকে অস্বীকার করা। ১৯৫৬ সালের

ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রগঠনের চূড়ান্ত আইন প্রণিত হইবার পরও মহারাষ্ট্রবাসীদের গণতান্ত্রিক দাবী পুরণের জন্য সেই আইনের সংশোধন করিয়া সংযুক্ত মহারাষ্ট্র ও স্বতন্ত্র গুজরাট প্রদেশ গঠন করিতে হইয়াছে। স্বতন্ত্র নাগা রাজ্যগঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কাজেই ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য সংবিধান সংশোধনের প্রশ্ন বড় কথা নয়, ইহা নেহাৎ মামুলী কথা। যাহারা এই অসুবিধার কথাকে বড় করিয়া দেখাইতে চাহেন - তাহাদের ভয় আসলে গণতন্ত্রের সম্প্রসারণে।

ট্যাক্স বসিবার হুমকীও দেওয়া হয়েছে। বলা হইয়াছে যে ত্রিপুরায় এখন বিক্রয় কর নাই। বিধানসভা প্রবর্তিত হইলে ত্রিপুরাকে স্বাধীনভাবে বাজেট তৈয়ার করিতে হইবে। আপন আয়ের উপর নির্ভর করিয়াই তাহা করিতে হইবে। কাজেই জনগণের উপর নতুন নতুন ট্যাক্সের বোঝা না চাপাইয়া রাজ্যের আয় বাড়াইবার উপায় নাই — এই যুক্তি দেখাইয়া ট্যাক্সের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য বিধানসভায় দাবী না করিয়া চীফ কমিশনারী শাসনেই সন্তুষ্ট থাকার জন্য ত্রিপুরার জনগণকে প্রবোধ দেওয়া হইতেছে। বুর্জোয়া শাসকেরা জনগণের উপর ট্যাক্স না বসাইয়া, কৃষক, মজুর ও মধ্যবিত্তদের জীবন - জীবিকা খর্ব না করিয়া দেশের অর্থ বাড়াইবার চিন্তা করিতে পারে না। কেন না দেশের সাধারণ মানুষের জীবনের মান উন্নত করা তাহাদের লক্ষ্য নয় — লক্ষ্য হইল মুষ্টিমেয় ধনিক গোষ্ঠীর ধনবৃদ্ধি সাধনের, ত্রিপুরার যে অব্যবহৃত প্রাকৃতিক সম্পদ রহিয়াছে তাহার সদব্যবহার করিয়া, দেশের আমলা তান্ত্রিক অপচয় নিবারণ করিয়া, মাথাভারী শাসনের অবসান করিয়া, বড় বড় মুনাফাখোরদের একচেটিয়া মুনাফার শিকার বন্ধ করিয়া, পুঁজিপতিদের আয়ের উপর ট্যাক্স বাড়াইয়া, কৃষক মজুর ও মধ্যবৃত্ত সাধারণ মানুষের উপর পরোক্ষ এবং প্রতক্ষ্য করের মাত্রা কমাইয়াই ত্রিপুরার আয় বৃদ্ধি করা সম্ভব। কাজেই গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থ নতুন নতুন কর ভার নয়। গণতন্ত্রের মুখোশপড়া ধনীক গোষ্ঠীর একনায়কত্বের শাসনের স্বার্থেই জনগণের ঘাড়ে নিত্য নতুন কর বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়া জড়িত। ক্ষমতা পাইবার আগে দায়িত্ব পালনের কথা ভাবিবার জন্যও উপদেশ বর্ষণ করা হইয়াছে। ত্রিপুরার মানুষ দায়িত্ব পালনে মোটেই অক্ষম নয়। ত্রিপুরায় বিধানসভা প্রবর্তিত হইলে তাহারা সেই দায়িত্ব পালনে সম্পূর্ণ সক্ষম ও যোগ্য। যে কোন চীফ কমিশনার বা আমলার চেয়ে তাহাদের যোগ্যতা বেশী। ব্যক্তির চেয়ে সমষ্টির যোগ্যতা সকল সময়েই বেশী। কাজেই দায়িত্ব দেয়ার আগেই ত্রিপুরাবাসী সেই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন কিনা সেই চিন্তায় যাহারা নুইয়া পড়েন আসলে তাহারা অতীতে ভারতকে স্বাধীনতা দেওয়ার আগে ব্রিটিশ শাসকরা স্বাধীনতা না দেওয়ার জন্য যেসব যুক্তি উপস্থিত করিতেন তাহারই পুনরাবৃত্তি করিতেছেন মাত্র। ত্রিপুরার জনগণের যোগ্যতা আছে কি নাই তাহা নিয়া তাহারা এত চিন্তিত নন। তাহাদের সকল চিন্তা হইল — ত্রিপুরার মানুষ গণতান্ত্রিক অধিকার লাভ করিলে আরও অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করিয়া কয়েমী স্বার্থের উপর আরও সজোরে আঘাত হানিতে

থাকিবে। তাহাদের আসল ভয় সেইখানে। দেশে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক চেতনা বৃদ্ধি তাহাদের অধিকার বোধ বৃদ্ধি, স্বাভাবিকভাবেই কায়েমী স্বার্থের হৃদকম্প উপস্থিত করে। তাহাদের স্বার্থ বিপন্ন হইবার সম্ভাবনা দেখা দিলে বুর্জোয়ারা জনগণের সীমাবদ্ধ গণতন্ত্রকে টুটি টিপিয়া মারিতেও কুণ্ঠাবোধ করেন না। বৃহত্তর স্বার্থের নামাবলীর আড়ালে গণতান্ত্রিক অধিকার সংকোচনের প্রস্তাব যে কত মারাত্মক, ইহা যে চীফ কমিশনারী একনায়কত্ব শাসনকে ত্রিপুরায় স্থায়ীরূপ দেওয়ার প্রস্তাব, ত্রিপুরার জনসাধারণের উপর আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্ব বজায় রাখার, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচারিতা ও ব্যভিচার জিয়াইয়া রাখার পরোক্ষ প্রস্তাবের নামান্তর — তাহা ত্রিপুরাবাসীকে ভাবিয়া দেখিতে হইবে। কেন্দ্রের প্রদত্ত সাহায্যের সঠিক প্রয়োগ করিতে চীফ কমিশনারী একনায়কত্ব শাসন বেশী সক্ষম হইবে, না জন প্রতিনিধিত্ব মুলক দায়িত্বশীল শাসন ব্যবস্থা বেশী সক্ষম হইবে তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই ক্ষেত্রে ইহা সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে — চীফ কমিশনারী একনায়কত্ব শাসন ব্যবস্থার চেয়ে দায়িত্বশীল সমষ্টিগত শাসন ব্যবস্থা অনেক বেশী কার্যকরী হইবে।

নাগারাজ্যের সাথে ত্রিপুরার অবস্থার পার্থক্য রেখা টানার হীন প্রচেষ্টা করা হইয়াছে — যদিও বক্তব্যের মধ্যে সেই পার্থক্যটা কোথায় সেই বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করা হইয়াছে। কিন্তু আমাদের ভুলিলে চলিবে ন যে বিধানসভা না দেওয়ার স্বপক্ষে যেসব যুক্তির অবতারণা করা হইয়াছে যেমন, ভৌগলিক অবস্থান, স্বল্প লোকসংখ্যা, আয়ের সল্পতা ও উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রের উপর একান্ত নির্ভরশীলতা ও রাজ্যের অনগ্রসরতা — সব গুলিই নাগা রাজ্যের বেলায় সমভাবে প্রযোজ্য। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে আরও বেশী প্রযোজ্য। কিন্তু নাগাদের বেলায় তাহাদের সেই যুক্তি খাটান যাইতেছে না বলিয়া আজ তাহারা নাগা রাজ্যের বেলায় এই পার্থক্য রেখা টানিয়া ত্রিপুরার জনমতকে বিভ্রান্ত করার প্রয়াস পাইতেছেন। নাগাদের দুর্বার ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের মুখে তাহাদের ঐসব যুক্তি যেমন টিকান যায় নাই, ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও তাহা টিকান যাইবে না যদি ত্রিপুরার ঐক্যবদ্ধ প্রবল গণআন্দোলন গড়িয়া তোলা যায়।

আঞ্চলিক পরিষদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়া বিধানসভার প্রয়োজন মিটান যায় না। বিধানসভার প্রয়োজন মিটাইতে হইলে ইহাকে আঞ্চলিক পরিষদে সীমাবদ্ধ না রাখিয়া পূর্ণ বিধানসভার স্তরেই উন্নীত করিতে হইবে।

বিধানসভার দাবীর নায্যতা এবং ব্যবহারিক কার্যকারিতা সম্পর্কে বিন্দু মাত্র সন্দেহ ঘোষণা না করিয়া বিরুদ্ধবাদীদের মতবাদে বিভ্রান্ত না হইয়া বিধানসভা লাভের জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়াই আজ ত্রিপুরাবাসীর অন্যতম প্রধান ও জরুরী কর্তব্য হওয়া উচিত।

(ত্রিপুরার কথা, ১০ম বর্ষ - ৩৫শ সংখ্যা ৮ই মাঘ - ২২শে জানুয়ারী, ১৯৬১ ইং)

কংগ্রেসী মহলের কয়েকটি কুৎসার জবাব

(কংগ্রেসী মহল নির্বাচনী আসরে নামিয়া কমিউনিস্ট পার্টি ও আমার বিরুদ্ধে নানবিধ কুৎসা প্রচার চালাইতেছেন। নির্বাচনী যুদ্ধে ভোটদাতাদের মনে নানা সন্দেহ ও ভীতি প্রদর্শন করিয়া — ভোট কুড়াইবার জন্যই কংগ্রেসী এইরূপ হীন কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহাদের শত কুৎসার জবাব এই অল্প লেখায় দেওয়া সম্ভব নয়। তথাপি তাহাদের কয়েকটি কুৎসার জবাব এখানে দিতে চেষ্টা করিব।)

কংগ্রেসী মহল প্রচার চালাইতেছে যে গত বছর দশরথ দেব পার্লামেন্টের সদস্য থাকিয়া ত্রিপুরাবাসীর উন্নতির কি প্রতিবিধান করিয়াছেন? দশরথ বাবু এই দশ বৎসরে ত্রিপুরায় কোন একটি সমস্যারও সমাধান করেন নাই। কাজেই তাহাকে ভোট দিয়া কি হইবে?

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ত্রিপুরাবাসীর ভাল বা মন্দ করার ক্ষমতা তাহাদেরই আছে যাহাদের হাতে শাসন ক্ষমতা আছে। তাহা হইলে দেখুন গত চৌদ্দ বৎসর ধরিয়া দিল্লীর কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা চীফ কমিশনারের নামে ত্রিপুরা রাজ্যশাসন করিতেছেন। ত্রিপুরাবাসীর সকল প্রকার সমস্যা সমাধানের দায়িত্ব ও সর্বময় কতৃত্ব এযাবৎ কংগ্রেসীদের হাতেই। কাজেই ত্রিপুরাবাসী সকল দুঃখ, দুর্দশা ও দারিদ্র্যের জন্য কংগ্রেসীরাই সম্পূর্ণ দায়ী।

পার্লামেন্টে ত্রিপুরায় জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে আমারও অনেকগুলি দায়িত্ব আছে। সেই দায়িত্ব আমি অস্বীকার করিতেছি না। ত্রিপুরাবাসীর প্রত্যেকটি দাবি দাওয়া ভারতের সর্বোচ্চ আইনসভা পার্লামেন্টে উপস্থিত করা, তাহা আদায়ের জন্য তথায় লড়াই করার দায়িত্ব আমার আছে। ত্রিপুরাবাসীর নিকট আমার বিনীত নিবেদন যে আমার সাধ্যানুযায়ী সেই দাবিগুলি আমি পার্লামেন্টে উপস্থিত করিয়াছি। তাহা আদায়ের জন্য আপ্রান লড়াই করিয়াছি। আমি যেসব দাবি বা বক্তব্য পার্লামেন্টে উপস্থিত করিয়া ছিলাম তাহার প্রায় সবগুলিই 'ত্রিপুরার কথা' পত্রিকায় যথাসময়ে প্রাকশিত হয়েছিল। এখানে সেই ফিরিস্তি পুনর্বিবৃত করা আদৌ সম্ভব নয়।

ত্রিপুরার ধর্মনগর হইতে সাব্রুম পর্যন্ত রেলগাড়ী চলাচলের ব্যবস্থা করা, পুরাতন ভূমি আইনের সংশোধন করিয়া ত্রিপুরার কৃষকদের ভূমিতে উৎকৃষ্ট শর্তদান, ব্যক্তিগত চাষে রাখার সর্বোচ্চ পরিমাণ ভূমির সীমারেখা নির্ধারণ ক্রমে জমিদার ও বড় বড় জোতদারদের বাড়তি জমি সরকারের দখলে আনিয়া গরীব ও ভূমিহীনদের মধ্যে তাহা বিলি করিয়া দেওয়া। বিনা মাশুলে জোতের জমির গাছ কাটার অধিকার জোতদারকে দান,

বর্তমান বন আইনের জন বিরোধী ধারাগুলি সংশোধন করিয়া জনগণের উপর বন বিভাগের জুলুমের অবসান করা, ত্রিপুরার সর্বত্র ছোট বড় জলসেচের বাঁধ নির্মাণ করিয়া চাষীদের জমিতে জল তোলার সুযোগ করিয়া দেওয়া, বন্যা নিয়ন্ত্রণে বাঁধ নির্মাণ করা, কৃষিঋণ এবং কৃষিদাদন আদায় স্থগিত রাখা এবং প্রয়োজন বোধে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এই সম্পূর্ণ মুকুব করা, উদ্বাস্তুদেরে প্রদত্ত পুনর্বাসন ঋণ সম্পূর্ণ মুকুব করা, সুষ্ঠু পুনর্বাসন না হওয়া পর্যন্ত উদ্বাস্তু দপ্তর চালু রাখিয়া উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য দিয়া সুষ্ঠুভাবে পুনর্বাসন দেওয়া, জুমিয়া পুনর্বাসন তরান্বিত করা, পুনর্বাসন না পাওয়া পর্যন্ত কোন জুমিয়াকে জুম কাটা বন্ধ না করা এবং সুযোগ খোলা রাখার জন্য আপাততঃ কোন জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা বন রির্জাভ না করা। বেকার সমস্যা সমাধানের জন্য ছোট ও মাঝারী ধরণের শিল্প গড়িয়া তোলা, শিক্ষা বিস্তারের জন্য গ্রামে গ্রামে স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং শহরগুলিতেই নয় পল্লী অঞ্চলেও হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করা, উপজাতি এবং তপশীলি সম্প্রদায়ের বালক - বালিকাদের জন্য বোর্ডিং স্থাপনে সরকারী ব্যয়ে অধ্যায়ন করার সুযোগ দান, ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা দান, ভোটার লিস্টে নাম উঠানোর সময়ে বা সরকারী সাহায্য বিলির সময় কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের বা ধর্মাবলম্বীদের উপর কোন রকম বৈষম্যমূলক আচরণ না করা। কৃষক উচ্ছেদ সম্পূর্ণ বন্ধ করা, সকল সম্প্রদায়ের গরীব ও মাঝারী কৃষকদের কৃষিঋণ ও দাদন পাইবার সুব্যবস্থা করা প্রভৃতি আরও অনেক দাবী আমি পার্লামেন্টে উপস্থিত করিয়াছি।

শুধু দাবী তুলিয়াই নীরব থাকি নাই এই দাবীগুলি পূরণ করার জন্য গত দশ বৎসর পার্লামেন্টে সংগ্রাম চালাইয়াছি। এই দশ বৎসরে ত্রিপুরার জনজীবনকে আসক্ত করে এমন কোন সমস্যা সম্ভবত বাদ নই যাহার প্রতিকার চাহিয়া আমি পার্লামেন্টে উঠাই নাই। কিন্তু দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হয় যে সংখ্যা গরিষ্ঠতার জোরে কংগ্রেসী সদস্যরা এবং কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা আমার ঐ দাবীগুলি আংশিকভাবেও পুরণ করেন নাই। ত্রিপুরায় বিধানসভা প্রবর্তনের দাবী আমি তুলি, কংগ্রেসীরা ভোটের জোরে তাহা বাতিল করিয়া দেন। যোগাযোগ বিহীন ও অর্থনীতি অত্যন্ত পিছনে পড়া ত্রিপুরায় ট্যাক্স বৃদ্ধির বিরুদ্ধে লড়াই করি, আর কংগ্রেসীরা আমার বক্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া ট্যাক্সের বোঝা বাড়াইয়া চলিয়াছে। তথাপি মনে করি সরকারী দুর্নীতি আমার পার্টি এবং আমার তীব্র বিরোধীতার জন্যই কংগ্রেস সরকার পার্লামেন্টে ত্রিপুরার জনজীবনকে নিষ্পেষিত করিতে, আরও অনেক খারাপ আইন পাশ করিতে সাহস করিতেছে না। যদি পার্লামেন্টে কমিউনিস্টরা না থাকিত তবে কংগ্রেস সরকার আরও অনেক জনবিরোধী কার্যকলাপ চালাইয়া যাইত। কাজেই বিরোধী দলের শক্তি বৃদ্ধি করা ভারতের তথা ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনগণের অপরিহার্য বক্তব্য।

কংগ্রেসীরা প্রচার করেন দশরথবাবু পার্লামেন্টে গিয়া খাজনা বৃদ্ধি করিয়াছেন, জুম

কাটা বন্ধ করিয়াছেন, উদ্বাস্তু দপ্তর বন্ধ করিয়াছেন, উদ্বাস্তুদের সাহায্যের টাকা কাটিয়া জুমিয়াদের পুনর্বাসন দেওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছেন।

প্রথমতঃ পার্লামেন্টে সকল আইন বা প্রস্তাব পাস হয় বেশী সংখ্যক ভোটে। কংগ্রেসীরাই পার্লামেন্টে গত নির্বাচনে বেশী সংখ্যক আসন পাইয়া সরকার দখল করিয়াছেন, কাজেই দশরথ একা বা তাহার পার্টির সামান্য সংখ্যক ভোটে পার্লামেন্টে কোন আইন বা প্রস্তাব পাশ হইতে পারে না। কংগ্রেসীরাই বেশী হাতের জোরে তাহা পাস করেন। কাজেই সকল প্রকার জনবিরোধী আইন ও প্রস্তাব পাস হইবার জন্য কংগ্রেসীরাই দায়ী।

আমি প্রস্তাব তুলি ঃ ত্রিপুরার কৃষকদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়, কাজেই আগামী দশ বৎসরে ত্রিপুরায় কোন খাজানা বৃদ্ধি করা চলিবেনা এই মর্মে ভূমি আইনে একটি সুস্পষ্ট ধারা রাখিতে হইবে। কংগ্রেসীরা ভোটের জোরে আমার প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেয়। উৎপন্ন ফসলের আট ভাগের এক ভাগ খাজানার হার নির্দ্ধরণ করার ক্ষমতা ভূমি আইনের মারফত চীফ কমিশনারকে দেন।

আমি প্রস্তাব করি যে সমস্ত কৃষক এক দ্রোন পর্যন্ত খাসের জমি দখল করিয়া চাষাবাদ করিতেছেন তাহাদের কোন অজুহাতেই জমি হইতে উৎখাত করিতে পারিবে না। কংগ্রেসীরা ভোটের জোরে সেই প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন। বন্দোবস্ত ছাড়া দখল করা জমি হইতে কৃষকদেরে উচ্ছেদ করার ক্ষমতা ভূমি আইনের ১৫ ধারায় লিপিবদ্ধ করেন।

আমি প্রস্তাব করি যে পুনর্বাসন না পাওয়া পর্যন্ত কোন জুমিয়াদের বাসস্থানের আগে পাশের জমি রিজার্ভ করা বা তাহাদের জুম কাটা নিষেধ করা চলিবে না। কংগ্রেসীরা সেই দাবী অগ্রাহ্য করিয়া ত্রিপুরার জুমিয়া অধ্যুষিত এলাকা রিজার্ভ করেন এবং সর্বত্র জুম কাটার নিষেধ জারী করেন।

আমি প্রস্তাব করি পাঁচ কানি পর্যন্ত জমি বন্দোবস্ত দিতে কাহারও নিকট হইতে নজরান নেওয়া চলিবে ন এবং কোন অবস্থাতেই কানি প্রতি পাঁচ টাকার উর্দ্ধে জমির নজরানা হইতে পারিবেন না। কংগ্রেসীরা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করিয়া যথেষ্ট পরিমাণ নজরানা আদায় করার পথ খোলা রাখেন। আমার এই বক্তব্য পার্লামেন্টের রেকর্ড হইতে ছাপান অক্ষরে লিপিবদ্ধ আছে।

পশ্চিম বাংলার হারে ত্রিপুরায় উদ্বাস্তুদের ঋণ দেওয়ার জন্য লোকসভায় আমি বহুবার প্রস্তাব উত্থাপন করি। কংগ্রেসীরা ভোটের জোরে তাহা বাতিল করেন। কাজেই উদ্বাস্তুদের মন্জুরীকৃত ঋণের টাকা হস্তান্তর করিয়া জুমিয়া পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করিয়াছি বলিয়া আমার বিরুদ্ধে কংগ্রেসীরা যে অভিযোগ তুলিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনাদের মনে রাখা দরকার যে, আমি যদি এইরূপ প্রস্তাব উত্থাপনও করিতাম তাহা আমার একার ভোটে কি করিয়া পাস হইত? আমি জুমিয়া পুনর্বাসনের সাহায্যের টাকা বাড়াইবার জন্য দাবী তুলিয়াছি। এখনও তুলি ভবিষ্যতেও তুলিব। আমার মতে এই অল্প

টাকায় বর্তমানে কাহারো পুনর্বাসন হইতে পারে না।

কিন্তু তাহা করিতে হইবে — কাহারো ভাগ কমাইয়া নহে, সরকারী মোট বাজেটের অঙ্ক বাড়াইয়া। উদ্বাস্তু দপ্তর বন্ধের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টে জোর প্রতিবাদ করিয়াছি। এখনও করি। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাই — কংগ্রেস সদস্যদের ভোটের জোরে প্রস্তাব বাতিল করিয়া দেন।

কংগ্রেসী মহল ধর্মনগরে প্রচার করিতেছেন যে দশরথ বাবু পাহাড়িয়া। দশরথ ভোট পাইয়া পার্লামেন্টে গেলে মন্ত্রী হইবে। দশরথ মন্ত্রী হইলে রাজ্যে পাহাড়িয়াদের রাজত্ব শুরু হইবে। ফলে এই রাজ্যে কোন বাঙ্গালী আর থাকিতে পারিবে না।

প্রথম কথা হইল — আমি লোকসভার রিজার্ভ আসনে নির্বাচন প্রার্থী লোকসভায় এইবারও কমিউনিস্টদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের সম্ভাবনা নাই। সরকার গঠনের নিয়ম হইল, যে দল আইন সভায় বেশী আসন পান সেই দলের লোকেরাই সরকার গঠন করেন। কাজেই আমার মন্ত্রী হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। এখানে তর্কের খাতিরে বলিতে হয় যে ত্রিপুরাবাসীর ভাল কাজ করিয়া আমি যদি মন্ত্রী হইবার সুযোগ পাই তাহাতে আমার বাঙ্গালী বন্ধুদের এত ইষা বা আক্রোশের কি কারণ থাকিতে পারে। ঐ সব প্রচারকারীদের কি এই মত যে, যোগ্যতা থাকিলেও ত্রিপুরা রাজ্যে বাঙ্গালী ছাড়া কোন অবাঙ্গালী লোক কখনও মন্ত্রীর গদীতে বা উচ্চাসনে বসিতে পারিবে না?

কংগ্রেসীদের এই জঘন্য মনোভাব কি ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক ও চিন্তাশীল জনগণ সমর্থন করিবেন? যদি করেন তবে ত্রিপুরা রাজ্যের সামগ্রীক উন্নতি দারুণভাবে ব্যাহত হইবে।

দ্বিতীয়ত ঃ পাহাড়ী লোক মন্ত্রী হইলেই ত্রিপুরায় পাহাড়িয়াদের রাজত্ব কায়েম হয় তাই যদি হইত তবে পশ্চিমবঙ্গে সকল বাঙ্গালীরাই রাজত্ব করিতেন। কেননা সেখানের মন্ত্রীসভা বাঙ্গালী জাতির লোকদের দ্বারাই গঠিত।

কিন্তু ঘটনাটা তার বিপরীত। পশ্চিম বাংলার বাঙ্গালী মন্ত্রী নেতাই বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের দন্ডকারণ্যে এবং আন্দামানে পাঠাইয়া দিতেছেন। কলিকাতার রাজপথে অনাহারী ৮০ জন বাঙ্গালীকে বাঙ্গালী মন্ত্রীসভার হুকুমেই বাঙ্গালী পুলিশ গুলি করিয়া হত্যা করিয়াছে।

তৃতীয়ত ঃ আমার পার্টি — অর্থাৎ কমিউনিস্ট পার্টি সাম্প্রদায়িক নহে। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তির স্থান হইতে পারে না। স্নেহ কুমার চাকমার নেতৃত্বে ট্রাইবেল ইউনিয়ন যখন আগরতলায় প্রকাশ্য জনসভা ও মিছিল করিয়া প্রথমে 'বাঙ্গাল খেদা' আওয়াজ তুলেন তখন প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়া আমিই সেই আন্দোলনের বিরোধিতা করিয়াছিলাম। কংগ্রেস নেতারা আজ পর্যন্ত সেই আওয়াজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিবৃতি দিয়া বিরোধীতা করেন নাই। বরং অনেক কংগ্রেস নেতাকেই এই

আন্দোলন পরোক্ষে সমর্থন করতে দেখা যায়।

আমার বিগত ১৬/১৭ বৎসরের সক্রিয় রাজনীতির জীবনে ইতিহাস ও কার্যকলাপই আমার যথার্থ পরিচয়। মুসলিম সংখ্যালঘুর উপর সরকারী আক্রমণের সময়, আসামের দাঙ্গার সুযোগ নিয়া ত্রিপুরায় সাম্প্রাদায়িক দাঙ্গা উস্কানী চলাকালীন এবং উদ্বাস্তুদের ২৬ দফা দাবী আদয়ের আন্দোলনে আমার ভূমিকা আপনারা দেখিয়া থাকিবেন।

চতুর্থ ঃ আমি লোকসভায় যে আসনের জন্য প্রার্থী সেই আসনে উপজাতি সম্প্রদায়ের লোক ছাডা অন্য কোন সম্প্রদায়ের লোক প্রার্থী হইতে পারিবেন না। কংগ্রেস সরকার সেই আইন পাস করিয়া রাখিয়াছেন। কাজেই পাহাড়ীকে ভোট দিলেই যদি বাঙ্গালীদের সর্বনাশের কারণ ঘটে, তবে সেই নির্বাচন কেন্দ্রে বাঙ্গালী ভোটারগণ কোন বাঙ্গালী কে ভোট দিবেন? কোন বাঙ্গালী প্রার্থীও তথায় দাঁড়াইতে পারিবেন না। যাহাকেই ভোট দিবেন একজন পাহাড়ীকেইত ভোট দিবেন।

কংগ্রেসীরা ভয় দেখান যে কমিউনিস্টরা জিতিলে কেন্দ্রের সাহায্য বন্ধ হইয়া যাইবে। ত্রিপুরার উন্নয়ন মূলক কাজ কর্ম ব্যাহত হইবে।

আমি বলি, দেশের রাজনীতিতে কংগ্রেসের এক চেটিয়া প্রভাব এতদিন বজায় ছিল বলিয়াই ভারতের জনসাধারণের অশেষ দুঃখ দুর্দশার কারণ ঘটিয়াছে। কংগ্রেস বৃহৎ পুঁজিপতি ও বড়লোকদের প্রতিভূ। কাজেই দেশের অর্থের বেশীরভাগ কংগ্রেস সরকার ধনীকদের স্বার্থে খরচ করেন। কংগ্রেস দলে ভারী বলিয়াই দেশের জনগণের মতামতের উপর গ্রাহ্য করেন না। তাহাদের খুশীমত আইন কানুন রচনা করেন। কংগ্রেসের একচেটিয়া ক্ষমতা খর্ব করিতে পারিলেই জনগণের সুযোগ সুবিধা আদায় করা সম্ভব। কমিউনিস্ট পার্টি ভোটে জিতিলে পার্লামেন্টেও রার্জ্য বিধানসভা ও আঞ্চলিক পরিষদে বেশী সংখ্যক আসন লাভ করিলেই কংগ্রেসীদের দর্পচূর্ণ হইবে। লড়াই করিয়া জনগণের দাবী আদায় করা সম্ভব হইবে। ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তিশালী বলিয়াই কেন্দ্রীয় শাসিত হিমাচল প্রদেশও মণিপুর রাজ্যের তুলনায় প্রতি বৎসর বেশী পরিমাণ আর্থিক সাহায্য পাওয়া সম্ভব হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে লডাই করিয়া বেশী দাবী দাওয়া আদায় করিয়া আনার জন্যই কমিউনিস্টদের পার্লামেন্টেও নির্বাচিত হওয়া দরকার। আঞ্চলিক পরিষদ দখল করা দরকার। এই কাজ ত্রিপুরায় কংগ্রেসীদের দ্বারা করানো সম্ভব হইবে না। দিল্লীর বড় নেতাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে একটি কথা বলার বা প্রতিবাদ করার মত সাহস বা মনোবল ত্রিপুরায় কংগ্রেসীদের নাই।

কাজেই সর্ববিষয় বিবেচনা করিয়া ভোটের অধিকার প্রয়োগ করার জন্য আমি ত্রিপুরাবাসীকে অনুরোধ জানাইতেছি। কংগ্রেসী বা কাহারও অপপ্রচারে বিভ্রান্ত না হইবার জন্য আমি অনুরোধ করিতেছি।

(ত্রিপুবাব কথা, ১১ বর্ষ - ৩৬শ সংখ্যা ১২ই মাঘ - ২৬শে জানুয়ারী ১৯৬২ ইং)

একটি মন্তব্য

'এই যে সত্যেন বাবু, কেমন আছেন? কাজ কারবার কেমন চলছে? জিজ্ঞাসা করলেন জনৈক রেলযাত্রী।

' আর বলবেন না মশায়, তিপরারা মানুষ খারাপ হয়ে গেছে, কাজ কারবার কি আর আগের মতন চলে' — জবাব দিলেন সত্যেনবাবু

মন্তব্য শুনে ক্ষুণ্ণ হলেন আমার সহপাঠী হরিচরণ দেববর্মা। তর্ক করতে যাচ্ছিলেন সত্যেনবাবুর সাথে। আমি তাঁকে থামিয়ে বললাম —এতে তর্ক করে কি লাভ? হরিচরণবাবু ক্ষুণ্ণ হয়ে বললেন —মশায় দেখছেন না, ওঁরা আমাদের তিপ্রা বলে কত হেয় চক্ষে দেখেন। তর্ক করব না? আমি হরিচরণবাবুকে বললাম, তর্ক করে এর সমাধান হবার নয়। ওরা মহাজন শ্রেণীর লোক। তার উপর অগ্রসর বাঙ্গালী সমাজের লোক। ওঁরা আমাদের অসভ্য বলে ঘৃণা করে, আবার আমাদের শোষণ করে ফুলে ফেঁপেও উঠেন। ওরা আমাদের ঘৃণা করে কিন্তু আমাদের বিষয় সম্পত্তি আত্মসাৎ করতে, আমাদের উৎপাদিত ফসল গুদামে মজুত করে টাকা লুটতে কখনও কুণ্ঠাবোধ করে না। ওদের সাথে এভাবে রাস্তাঘাটে ঝগড়া করে কি লাভ? এর প্রতিকারের পথ অন্যত্র। সত্য কথা বলতে কি তখন সবেমাত্র আমাদের জনশিক্ষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল। এ আন্দোলনের সুফল ফলতে শুরু করতে দেখে আনন্দে এবং গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছিল। আত্মবিশ্বাস দৃঢ়তর হয়ে উঠেছিল।

ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৪৫ সালের অক্টোবর মাসে। বাংলা মাস আশ্বিন। বার ছিল মঙ্গলবার। খোয়াই শহরের হাটবার। সারা বিভাগের সবচেয়ে বড় হাট। সপ্তাহে মাত্র একদিন এই হাট বসে। এই হাটবারে বহু দূর-দূরান্ত থেকে নানান জাতির নানান শ্রেণীর দশ বারো হাজার লোকের এই হাটে সদাই করতে ভীড় জমে। যেদিনের ঘটনার কথা বলছি সেই দিনটি তেমনই একটি হাটবার ছিল। বাল্লা রেলষ্টেশন থেকে রেলযাত্রীরা দলে দলে খোয়াই ঘাটের খেয়া পার হচ্ছিলেন। আমার সহপাঠী হরিচরণ দেববর্মা এবং আমি খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে লোক সমাগমের ভিড় দেখছিলাম। পাড়ে উঠতেই সেই রেলযাত্রীটি উপরোক্ত কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন সত্যেনবাবুকে।

সত্যেনবাবু ছিলেন খোয়াই এর তখনকার দিনের অন্যতম ডাকসাইটে মার্চেন্ট অর্থাৎ বড় ব্যবসায়ী। আগন্তুক রেলযাত্রীটি ছিলেন সত্যেনবাবুদের মহাজন। এটা পরে খবর নিয়ে জানতে পারলাম। ভৈরব, আশুগঞ্জ ও হবিগঞ্জ প্রভৃতিতে নাকি এই ভদ্রলোকদের

জম-জমাট কারবার।

সত্যেনবাবুর এই মন্তব্যের তাৎপর্য্য বুঝতে হলে তখনকার খোয়াই বিভাগের একটা আংশিক চিত্র কিছুটা তুলে ধরলে ভাল হয়। তখন ছিল খোয়াই বিভাগের অধিবাসীদের শতকরা ৮০/৮৫ ভাগ ছিলেন উপজাতি জনসমষ্টি। আবার উপজাতিদের মধ্যে ত্রিপুরী সম্প্রদায়ই সংখ্যাগরিষ্ঠ। বাঙ্গালী হিন্দু এবং বাঙ্গালী মুসলমান জনসংখ্যা সবে মাত্র বাড়তে শুরু করেছিল। বাঙ্গালী মুসলমানদের প্রায় সকলেই কৃষক অর্থাৎ উৎপাদনের সহিত সম্পর্কিত। বাঙ্গালী হিন্দুদের বেশীর ভাগই হলেন —দোকানদার, সুদখোর মহাজন, ব্যবসায়ী। অর্থাৎ কৃষকদের উৎপাদিত সম্পদ নাড়া চাড়া করে রুজি রোজগার করেন। এক কথায় মিডলম্যান। আর বাকী অংশ হলেন সরকারী কর্মচারী, উকিল ও মোহরার। কর্মচারীদের সংসার চলত ঘুষের উপর — বেতনের উপর নয়। মোদ্দা কথা বাঙ্গালী হিন্দু জনসংখ্যার সংখ্যা গরিষ্ঠ অংশই ছিলেন উৎপাদনের সাথে সম্পর্কহীন। তাদের মধ্যে স্বচ্ছল অংশে ক্রমশ: সমতল অঞ্চলের বড় বড় জঙ্গলাকীর্ণ প্লটগুলি জোত বা তালুকী বন্দোবস্ত নিয়ে প্যারাসাইট জোতদার বা তালুকদারে পরিণত হচ্ছিলেন। ব্রিটিশ ভারত অর্থাৎ বর্তমান বাংলাদেশ থেকে মুসলমান কৃষকরা এসে তাদের প্রজা হয়ে সেই জমিগুলি আবাদ করতে থাকেন। খোয়াই বিভাগের বাঙ্গালী হিন্দু জোতদারদের প্রায় সব জমিই মুসলমান কৃষকদের আবাদীকৃত।

উপজাতি এলাকা সমূহ খুবই দুর্গম ছিল। রামচন্দ্রঘাট মৌজার বড়তলী গ্রামে আমার জন্ম। তখন আমাদের গ্রামের চতুর্দিক ঘন বনজঙ্গলে ঘেরা। ঘরে বসে দিন -দুপুরে বন্য হস্তী ও বাঘ-ভাল্লুকের আওয়াজ শুনা যেত। কখনও কখনও দিন-দুপুরে বন্য হস্তীর দল মাঠের উপর দিয়ে গজেন্দ্র গমণে চলে যেত। বাড়ীর উঠানে দাঁড়িয়ে সেই দৃশ্য আমি বহুবার দেখেছি। উপজাতি এলাকায় কোন যানবাহন চলাচল করা ত দূরের কথা এমনকি স্থলপথে পায়ে চলার পথও বিরল ছিল। পাহাড়ী ছোট ছোট নদীগুলির গতিপথই ছিল তখনকার দিনের লোক চলাচলের প্রধান পথ। খোয়াই টাউন থেকে বের হলেই এখন যে বড় বড় শস্য ক্ষেত্র চোখে পড়ে তার বেশীর ভাগই ছিল তখন ঘন বনজঙ্গলে আবৃত। বাঘ ভাল্লুকের বাসা। দিন-দুপুরে প্রায়ই বন্যহস্তীর আওয়াজে বনভূমি কেঁপে উঠত। উপজাতিদের প্রধান জীবিকা ছিল জুম চাষ। সামান্য অংশ উপজাতিরা হাল চাষে নামলেও বেশীর ভাগই জুম চাষী। জুমে প্রচুর ধানের ফলন হত। জুমে প্রচুর তিল ও কার্পাস উৎপন্ন হত। জুম চাষীদের মোটা ভাত ও মোটা কাপড়ের তেমন কোন অভাব ছিল না। ঘরে ঘরে তিলের তেল তৈরী হয়। কার্পাস থেকে সূতো তৈরী হয়। উপজাতি রমণীরা নিজ নিজ পরিবারের পরিধেয় নিজেরাই বয়ন করেন। অভাব ছিল টাকা পয়সার।

জুমের ধানের বাজার ছিল না। জুম ধানের কোন ব্যবসাই চলত না। জুমের নূতন ধান পেলে জুমিয়ারা আগের বৎসরের বাড়তি মজুত ধান জঙ্গলে ফেলে দিতেন। এভাবে ধানের প্রচুর অপচয় হত।

পণ্য বা মনি ক্রপস বলতে তখন পাট, সরিষা, তিল ও কার্পাস । পাট ও সরিষা খুব কম সংখ্যক উপজাতিরাই উৎপাদন করতেন। তাদের উৎপাদিত পণ্য ছিল —প্রধানত: তিল ও কার্পাস। আর জঙ্গলের বাঁশ বিক্রয় ছিল সাধারণ উপজাতিদের রোজগারের অন্যতম উপায়।

তখন খোয়াই বিভাগে ব্যবসায়ীরা প্রায় সকলেই বাঙ্গালী হিন্দু। কোন অবাঙ্গালী ব্যবসায়ী তখন পর্যন্ত খোয়াই বিভাগে ব্যবসায় গদী খুলেন নাই। ছোট বড় সব দোকানদার ও ব্যবসায়ী সকলেই 'মহাজন নামে পরিচিত'। ব্যবসায়ী অর্থাৎ মহাজনরা সমগ্র উপজাতি এলাকাকে কয়েকটি মহলে ভাগ করে নিয়েছিলেন। চলতি কথায় এই মহালকে 'ময়াল' বলা হয়। এক একজন মহাজন (ব্যবসায়ী) এক একটি ময়ালের মালিক সেজে বসেছিলেন। এক ময়ালের কাঁচা মাল সেই ময়ালের নির্ধারিত মহাজন ছাড়া অন্য কোন মহাজন কিনতেন না। এই একচেটিয়া অধিকার কিন্তু ত্রিপুরা সরকারের দেওয়া নয়। এটা মহাজনদের নিজস্ব সৃষ্টি। ব্যবসায়ীদের সংখ্যা সীমাবদ্ধ ছিল বলে তাদের মধ্যে ব্যবসায়ের ময়াল নিয়ে তেমন পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বা দ্বন্দ্ব ছিল না। ব্যবসায়ীরা তখন তাদের নিজস্ব সৃষ্ট এই কড়াকড়ি শৃঙ্খলা মেনে চলতেন । এর ফল দাঁড়াত উপজাতিদের কাঁচামাল বেচার জন্য একমাত্র সেই ময়ালে নির্দিষ্ট মহাজনের মুখের দিকে চেয়ে থাকতে হত। অনেক সময়ে দেখা যেত তিল কার্পাস ও বাঁশ প্রভৃতি কাঁচামাল বিক্রেতা উপজাতিরা খোয়াই শহরে গিয়ে তাদের ময়ালের মহাজন বা তার গোমস্তাদের ডেকে আনতেন মাল বেচার জন্য।

পাট, সরিষা, তিল ও কার্পাস প্রভৃতি ফসল উঠার মাস দেড়েক আগেই মহাজনের গোমস্তা বা কর্মচারীরা নিজ নিজ ময়ালে দু'একবার পাক দিয়ে আসতেন। কিছু দাদন দিয়ে আসতেন। এই দাদনের হার ছিল খুবই কম। ফসলের মরসুমের দামের চেয়ে বহু কম। মহাজনরা আবার কখনও কখনও গ্রামের কিছু মাতব্বরদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে ফসল উঠার দু'এক মাস আগেই কাঁচামালের দর মোটামুটি নির্ধারণ করে ফেলতেন। বলা বাহুল্য সেই দর মরসুমের আড়ং (বাজার) দর থেকে বহু কম। ধর্ম ভীরু বোকা উপজাতিরা জবানে আবদ্ধ হয়ে যেতেন। মরসুমে মালের মূল্য যাই হউক না কেন পূর্বের কন্ট্রাক মতে সস্তায় মহাজনকে মাল দিতে হত। চতুর ব্যবসায়ীরা এই কৌশলে সরল ও অজ্ঞ উপজাতিদের দু'হাতে লুণ্ঠন করতেন।

কাঁচামাল আমদানীর মরুসুমে মহাজনেরা বড় বড় নৌকা নিয়ে উজানে উঠতেন। তখন খোয়াই নদীর গভীরতা এখানকার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। সারা বৎসর বড় নৌকাগুলি চলাচল করতে পারত। পাহাড়ী ছোট নদীগুলি যে সব স্থানে খোয়াই নদীতে এসে মিলেছে সেই সংযোগ স্থানগুলিতে মহাজনদের নৌকাগুলি রাখা হত। উপজাতিরা কেউ বা ছড়া দিয়ে বাঁশের চালীতে করে, আবার কেউবা মাথায় বা পিঠে বহন করে যখনকার যে পণ্য, যেমন — পাট, সরিষা, তিল ও কার্পাস নৌকা বোঝাই করে দিতেন। অধিকাংশ সময়েই কাঁচামালের মূল্য নগদ পাওয়া যেত না। সহরে গিয়ে মহাজনদের গদী থেকে আনতে হত। দাম পেতে এক দেড় মাস লেগে যেত। ব্যবসায়ীরা নৌকা পথে ত্রিপুরার বাইরে মাল চালান দিতেন এবং তা বিক্রয় করে টাকা এনে তবে ট্রাইবেল বিক্রেতার মালের দাম দিতেন। এভাবে অল্প পুঁজি নিয়োগ করে খোয়াই এর মহাজনরা হাজার হাজার টাকার কারবার করতেন। মুনাফাও করতেন প্রচুর। তখনকার বাঙ্গালী হিন্দুদের অধিকাংশ ত্রিপুরায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার মতলবে ত্রিপুরায় আসেন নাই। ওদের অনেকের কাছেই শুনেছি— এখানকার রোজগারের টাকায় ওদের অনেকেই নাকি স্বদেশে ঘরবাড়ী করেছেন। কিন্তু ত্রিপুরায় ওদের কেউ ভাল ঘরবাড়ী করেন নাই। কন্ট্রাক্টরদের শিবিরের মত ঘরবাড়ী করে থাকতেন। ভারত বিভক্ত হবার পূর্ব পর্যন্ত বাঙ্গালীদের অনেকেই ত্রিপুরাকে আপন দেশ হিসেবে গ্রহণ করেন নাই। কর্মস্থল হিসেবে ধরে নিয়ে বাস করতেন।

মহাজনরা ট্রাইবেলদের কাছ থেকে কাঁচামাল কেনার সময় ওজনে ঠকাতেন। হিসাবে ঠকাতেন। দরে ঠকাতেন। উপজাতিরা নিরক্ষর এবং বেশীর ভাগ লোকই ঠিকমত টাকা পয়সা হিসাব করে নিতে পারতেন না। মহাজনরা হিসাব করে যা দিতেন ওদের তাই নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হত। প্রায়ই দেখা যেত ঘর থেকে ৪০ সের কাঁচামাল নিয়ে এলে মহাজনদের মাপে তা ৩০সেরের বেশী টিকত না। ওজনে ৩০ সের টিকলেও খাতায় লিখা হত ২০/২৫ সের। পরে দাম নেবার সময় বেচারাকে ৪০ সেরের জায়গায় ২০ /২৫ সেরের মূল্য নিয়ে বাড়ী ফিরতে হত। এ ধরণের কারসাজি করার মতলবে মহাজনরা প্রায় ক্ষেত্রেই ট্রাইবেলদের কাঁচা মালের মূল্য পুরা নগদ দিতেন না। এই ছিল তখনকার বাঙ্গালী মহাজনদের উপজাতিদের শোষণের নমুনা।

অন্য ময়ালের মহাজনেরই কাছে কার্পাস বিক্রয় করতে গিয়ে গঙ্গারামের কি হাল হয়েছিল এখানে তা উল্লেখ করব। গঙ্গারাম দেববর্মা সমরুছড়ার লোক। নরেনের পিতা। নরেন তখন আমাদের বোর্ডিং-এর ছাত্র। সেদিন গঙ্গারাম ও তার মেয়ের জামাই দু'জনে মিলে ৬০ সের কার্পাস খোয়াই বাজারে বেচতে নিয়ে আসেন। নিবারণ মহাজনের

গদীর সামনে কার্পাসের বোঝা নিয়ে যেতেই কার্তিকবাবু (নিবারণ মহাজনের গোমস্তা) বললেন — ঐ বেটা কার্পাস, তুই কোন ময়ালের মানু? সেই গঙ্গারাম বললেন— 'সমরুছড়ার ময়ালের'। অমনি কার্তিকবাবু বলে উঠলেন — যা বেটা বাণীবাবুর গুদামে। ইখানে আইছ কিরে? বেটা তুমি জানছ নানি তোমাগ মহাজন বাণীবাবু? এই কথা বলে এক টুকরো লেখা কাগজ গঙ্গারামের হাতে দিয়ে কার্তিকবাবু বললেন— নে, এটা বাণী বাবুর গুদামে দিবা। অগত্যা গঙ্গারামকে তার কার্পাসের বোঝা নিয়ে বাণীবাবুদের গুদামে চলে যেতে হল। মাথার বোঝা নামিয়ে কেশববাবুর হাতে কাগজটি দিলেন। এই কেশব দে হলেন বাণীবাবুর গোমস্তা। চিঠি পড়েই কেশববাবু ধমক দিয়ে উঠলেন— শালা তিপ্‌রা ভূত। আমাগ বাদ দিয়া গেছলি নিবারণ মহাজনের গুদামে? বেশী চালাক হইছ, কেমন? ধমক খেয়ে গঙ্গারাম আমতা আমতা করতে লাগলেন। প্রতিবাদ করার উপায় নেই। সম্পূর্ণ নিরূপায়।

কেশববাবুর ওজনদার গঙ্গারামের কার্পাস ওজন করে ঘোষণা করলেন— বাবু লিখুন ৪০ সের। ঘোষণা শুনে গঙ্গারাম বেকুব বনলেন। আমতা আমতা করে বললেন — বাবু, হাঁসা হাঁসাই ৪০ সের হইছে নি? নিজের হাতে ৬০ সের মাইপ্যা আনলাম, অত কম অইছে কেমনে বাবু। কেশববাবু ধমক দিয়ে উঠলেন— 'বেটা জংলী, তুই কবের থাইক্যা মাপ দিত জানছে। অমন তালি বালি কথা কইছ না আমার লগে। তোমারে ঠকাইয়া আমি রাজা অইবনি, বেটা।' এই ছিল অজ্ঞ ট্রাইবেলদের প্রতি তখনকার দিনে বাঙ্গালী মহাজনদের আচরণ। শোষণের জুলুম তো রয়েছেই। ট্রাইবেলরা ঠিকমত বাংলা ভাষা বলতে পারেন না তা নিয়েও ট্রাইবেলদের সাথে বিকৃত উচ্চারণ করে তাঁরা বাংলা বলতেন। এই জাত্যাভিমানী বাঙ্গালী মহাজনরা একটি কথা ভুলে যান যে, বাংলা ভাষা ট্রাইবেলদের মাতৃভাষা নয়, তাদের উপর এই ভাষা চাপানো হয়েছে মাত্র। এই বিদ্রুপে বাঙ্গালীদের কৃতিত্ব বাড়ে না। এতে অগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জনগণের উন্মাসিকতাই প্রকাশ পায় মাত্র।

সেদিন কার্পাসের দর ছিল মন প্রতি ৫ (পাঁচ) টাকা। কিন্তু গঙ্গারামকে দেওয়া হল মন প্রতি ৪ টাকা। দরে এবং ওজনে উভয় ক্ষেত্রে গঙ্গারামকে ঠকান হল। বেণীবাবুদের গুদামে সরাসরি না গিয়ে নিবারণদের গুদামে কার্পাস বেচতে গিয়েই নাকি গঙ্গারাম মহা অপরাধ করেছেন। তারই শাস্তি স্বরুপ নাকি তাকে মণ প্রতি একটাকা কম দেওয়া হয়েছে। এটা গঙ্গারামের কাছেই শোনা কাহিনী। ঘটনাটি ঘটেছিল ১৩৪৮ ত্রিপুরাব্দের ২৭শে পৌষ। তারই কাছে শুনলাম— গঙ্গারাম নাকি ইতিপূর্বে বাণীবাবুদের গুদামে ৫ মণ কার্পাস জমা দেন। তার দাম তখন পর্যন্ত পান নাই। ২৯শে পৌষ উত্তরায়ণ সংক্রান্তির

দিন নাকি তাঁর পৈতৃক বার্ষিক শ্রাদ্ধ। নগদ টাকার প্রয়োজনেই নাকি সেদিন গঙ্গারাম অন্য ময়ালের মহাজনের কাছে গিয়েছিলেন কার্পাস বেচতে। কিন্তু বেচারা গঙ্গারাম জানতেন না যে— তাদের মত অজ্ঞ ট্রাইবেলদের গলাকাটার জন্য নিবারণবাবু, বাণীবাবু ও সত্যেনবাবুদের দল নানান ফাঁদ পেতে বসে আছেন।

যে সময়কার কথা বলছি তখন ত্রিপুরার স্থানে স্থানে 'জনশিক্ষা সমিতি'র আন্দোলন চলছিল। ১৩৫৬ ত্রিপুরাব্দের ১১ই পৌষ ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতি জন্মলাভ করে, ইংরাজী ১৯৪৪ সালের জানুয়ারীর শেষ দিকে। তখনকার দিনের স্কুল ও কলেজে অধ্যয়নরত ১১জন ত্রিপুরী ছাত্র ও যুবক এই সমিতি গঠন করেন। সমিতির প্রেসিডেন্ট, ভাইস - প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী ছিলেন যথাক্রমে —সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা। এই জনশিক্ষা সমিতির আদর্শ ও কর্মসূচী তখনকার দিনে উপজাতি ছাত্র যুবক এবং সাধারণ জনগণের মধ্যে একটা নূতন জাগরণ এনে দিয়েছিল।

এই ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির প্রথম ছাপানো ইস্তাহারে সমিতির আদর্শ ও লক্ষ্য ঘোষণায় বলা হয়—'সমিতির লক্ষ্য হইতেছে যে ত্রিপুরার উপজাতি সমাজের নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করা' এবং ' সকল প্রকার সামাজিক কুসংস্কার ও অনগ্রসর ধ্যানধারণার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিয়া ত্রিপুরা সমাজের সংস্কার সাধন করা।' এই তিনটি প্রধান লক্ষ্য সামনে রেখে জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা দারুণ উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে গ্রামে গ্রামে কাজ শুরু করে দিয়েছিলেন।

এই সমিতির প্রচারের মধ্যে ছিল— ' রাজার মুখের দিকে চাহিয়া না থাকিয়া নিজেদের উদ্যোগে গ্রামে গ্রামে স্কুল প্রতিষ্ঠা কর, কচ্ছপের মত হাত পা গুটাইয়া বসিয়া না থাকিয়া বিভিন্ন বৃত্তি অবলম্বন কর ইত্যাদি।' এই সমিতির প্রভাব অতি অল্প সময়ের মধ্যেই খোয়াই, সদর ও কমলপুরে বিস্তৃতি লাভ করেছিল। জনশিক্ষা সমিতিব প্রভাব সদর দক্ষিণাঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছিল। মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যেই এই সমিতির কর্মীদের উদ্যোগে ৪৮৮টি বে-সরকারী প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠেছিল। সেই স্কুলগুলির প্রায় তিন শতের মত পরে সরকার গ্রহণ করেছিলেন। ইতিপূর্বে সমগ্র ত্রিপুরায় উপজাতি অঞ্চলে প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা ছিল মাত্র ৩৬টি।

এই নিরক্ষরতা বিরোধী প্রচার অভিযানের সাথে সাথে চলতে থাকে দারিদ্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত সংগ্রামের আহ্বান। ১৯৪৫ সালে সমিতির ভাইস প্রেসিডেন্ট দশরথ দেববর্মা কর্তৃক রচিত একটি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সেই পুস্তিকায় বলা হয়— ' যুগ যুগ ব্যাপী অবহেলিত, পদ দলিত, শোষিত, বঞ্চিত, প্রতারিত ও নির্যাতীত উপজাতি জনগণের

মুক্তির পথ হইতেছে সংগঠিত আন্দোলন এবং জনশিক্ষা সমিতি সেই পথের নিশানা দিতেছে। অন্ধকারে পথ হাতড়াইলে চলিবে না, জ্ঞানের দীপ শিখা প্রজ্জ্বলিত করিয়া সচেতনভাবে ও দৃঢ় পদক্ষেপে লক্ষ্যপথে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইবে। '

সেই পুস্তিকা সুরু করা হয় রবীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত কবিতাংশ উদ্ধৃত করে।

এই —সব মূঢ় ম্লান মূক মুখে

দিতে হবে ভাষা; এই সব— শ্রান্ত শুস্ক ভগ্ন বুকে

ধ্বনিয়া তুলিতে হবে আশা; ডাকিয়া বলিতে হবে—

'মুহূর্ত তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে

যার ভয়ে তুমি ভীত সে অন্যায় -ভীরু তোমা-চেয়ে

যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পলাইবে ধেয়ে।

নিরক্ষরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের এই সংকল্প ঘোষণা করে সংগ্রামের জন্য মানসিক প্রস্তুতির আহ্বান দিতে গিয়ে সেই পুস্তিকায় আবার রবীন্দ্রনাথকেই উদ্ধৃত করা হয় ঃ

' অন্যায় যে করে, আর অন্যায় যে সহে,

তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

পুস্তিকায় বলা হয়—'নীরবে অন্যায় সহ্য করিয়া গেলে আমরা পরবর্তী বংশধরদের কাছে তথা সমগ্র উপজাতির কাছে অপরাধীরূপে পরিগণিত হইতে থাকিব। তাহারা আমাদের ক্ষমা করিতে পারিবেন না।'

অন্যায় নীরবে মুখ বুজে সহ্য না করে প্রতিবাদের আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাষায় পুস্তিকায় উপসংহার টানা হয় ঃ

'ক্ষমা যেথা ক্ষীণ দুর্বলতা,

হে রুদ্র, নিষ্ঠুর যেন হতে পারি তথা।'

সামন্ত রাজাদের প্রতি মৃদু কটাক্ষপাত করে সেই পুস্তিকায় লেখা হয় ঃ " বংশানুক্রমে ত্রিপুরায় ১৮৪ জন রাজা রাজত্ব করিয়াছেন। উপজাতিরা এই রাজাদের একান্ত অনুগত ও বশংবদ। তাহারা রাজাদের স্বয়ং নর-নারায়ণ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। কিন্তু এই রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনের প্রতিদানে উপজাতিরা কি পাইলেন? যুগ যুগ ব্যাপী

রাজানুরক্ত থাকিয়া উপজাতিরা অজ্ঞ, নিরক্ষর, মুর্খ ও গরীব বলিয়া আজ নিজ ভূমে পরবাসীতে পরিণত হইতে চলিয়াছেন। উপজাতিদের ভাগ্যাকাশের এই কুজ্ঝটিকাকে কে অপসারণ করিবে? উপজাতিদের একথা উপলব্ধি করিবার দিন আসিয়াছে। জল কচ্ছপের মত হাত পা গুটাইয়া ভাগ্যলিপির উপর সকল দোষ চাপাইয়া দিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। কেহ তাহাদিগকে উদ্ধার করিবার জন্য আগাইয়া আসিবে না। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলিতে হইবে, আমরা সভ্যতার আলোতে প্রবেশ করিবই। ”

বিশুদ্ধ শ্রেণী-চেতনার ভিত্তিতে না হলেও শোষণ, বঞ্চনা ও মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে উপজাতি জনগণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের ভিত্তিমূলে নাড়া দিয়েছিল ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির সেই প্রচার আন্দোলন। ঘুমন্ত উপজাতিদের জাতীয় জীবনে এনে দিয়েছিল এক নতুন প্রাণস্পন্দন। জাতীয়তাবোধ ও আত্মমর্যাদাবোধ জন্ম নিয়েছিল অবচেতন উপজাতিদের জাতীয় জীবনে। এই অভূতপূর্ব নবচেতনায় উদ্বুদ্ধ উপজাতিরা শোষণ বঞ্চনা প্রতারণা এবং বিশেষত: মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে সরব হয়ে উঠেছিলেন। এই নব-চেতনাই পরবর্তী যুগে কমিউনিষ্ট আন্দোলনের পথ সহজ করে তুলেছিল। কমিউনিস্ট আদর্শের আহ্বানে বিরাট অংশ উপজাতি জনতা সক্রিয়ভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। তাই এলাকার অন্যতম বড় মহাজন সত্যেনবাবুকে সেদিন আফশোস করে বলতে হয়েছিল— ‘‘তিপ্‌রা মানুষ খারাপ হয়ে গেছে।’’ এতে বুঝা যায় যে তিপ্‌রারা আর নীরবে সত্যেনবাবুদের শোষণ ও জুলুম মেনে নিতে রাজী নন।

(জ্বালা।। জানু- ফেব্রুঃ ১৯৭৪)

কেন অটোনমাস ডিস্ট্রীক্ট কাউন্সিল চাই, ত্রিপুরায় এই কাউন্সিল গঠন কি সম্ভব ?

'অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে ছোট ও মাঝারি কৃষকরা উচ্ছেদ হইবে না তো' — এই শিরোনামে সর্বশ্রী দ্বিজেন দে, জিতেন পাল এবং বীরেশ চক্রবর্তীর যুক্ত বিবৃতি ১৯৭৪ সালের ৫ই মে জাগরণ এবং আগরতলার অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

এই বিবৃতিতে 'ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ পূর্বাপর অবহেলিত' উপজাতি জনগণ যেই তিমিরে সেই তিমিরে প্রভৃতি নেতিবাচক অভিব্যক্তি প্রকাশ করিয়া তাঁহারা যে উপজাতিদের প্রতি কম দরদী নহেন তাহা দেখাইতে চাহিয়াও ব্যক্তব্যগুলি যেভাবে উপস্থিত করা হইয়াছে তাহাতে একথা বুঝিতে আদৌ কষ্ট হইবে না তাহারা নানা যুক্তির বেড়াজাল রচনা করিয়া আসলে উপজাতিদের — ন্যায় সঙ্গত রক্ষা কবচের দাবীসমূহকেই নস্যাৎ করিয়া দিতে চান। যাহাতে এই দাবীগুলির পিছনে শক্তিশালী জনমত গঠিত হইতে না পারে এবং যাহাতে সেই দাবীসমূহ আদায়ের জন্য ত্রিপুরার সকল জাতি উপজাতি গণতান্ত্রিক জনগণের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন গড়িয়া উঠিতে না পারে সেই উদ্দেশ্যে বিবৃতিতে উদ্দেশ্যমূলকভাবে কতকগুলি বিভ্রান্তিকর বক্তব্য উপস্থিত করা হইয়াছে।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে "ত্রিপুরার উপজাতিগণ পূর্বাপর অবহেলিত। তাহাদের স্বার্থ সংরক্ষণের বা তাহাদের সার্বিক উন্নয়নের জিগির এপর্যন্ত অনেকই উঠিয়াছে; কিন্তু উপজাতি জনগণ যেই তিমিরে সেই তিমিরে। কারণ দাবী বা প্লেন প্রোগ্রামে আন্তরিকতার অভাব। দাদন প্রথা আজও রহিত হয় নাই, মহাজনী শোষণ আজও অপ্রতিহত"।

এখানেই বিবৃতিকারীগণ দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক জিনিষকে একত্রে গুলাইয়া ফেলার চেষ্টা করিয়াছেন। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ১৯৪৮ সাল হইতে ত্রিপুরার জনগণের সামনে ইহা স্পষ্টভাবে তুলিয়া ধরিয়াছেন যে কংগ্রেস সরকার দেশের পুঁজিপতি, জমিদার ও সুদখোর মহাজন প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের প্রতিভু এই সরকার ত্রিপুরার শোষিত, বঞ্চিত ও নির্য্যতীত উপজাতি জনগণের কল্যাণ সাধন করিতে পারে না। উপজাতি কল্যাণের নামে কংগ্রেস সরকার ইতিমধ্যে যতগুলি প্ল্যান প্রোগ্রাম রচনা করিয়াছে বা ভবিষ্যতে করিবেন সেগুলির বেশীরভাগই উপজাতি জনগণকে নূতনভাবে প্রতারণা। প্রতারণা করিবার কৌশল মাত্র। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের এই বক্তব্য, কি জুমিয়া পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে, কি ট্রাইবেল ডেভেলাপমেন্ট ব্লকের ক্ষেত্রে, কি ১৯৬০ সালের ভূমি আইনের ১৮৭নং ধারা প্রয়োগের ক্ষেত্রে অত্যন্ত সার্বিক বলিয়া

প্রমাণিত হইয়াছে। গণমুক্তি পরিষদের উপজাতিদের জন্য বিশেষ রক্ষা কবচ সহ অন্যান্য অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দাবী অত্যন্ত আন্তরিকতাপূর্ণ। শুধু আন্তরিকতাপূর্ণই নহে এবং ঐ দাবীগুলি আদায়ের জন্য পরিষদের নেতৃবৃন্দ অতীতে অনেক ঝুঁকি নিয়া আন্দোলন করিয়াছেন। আজও সেই বিপদের ঝুঁকি মাথায় বহন করিয়া তাহারা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন। ত্রিপুরা জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের সময় হইতে যে উপজাতি নেতারা উপজাতিদের দাবীতে আন্দোলন করিয়া আসিয়াছে এখন তাহারা ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিতে থাকিয়া উপজাতিদের জন্য মরণপণ সংগ্রাম করিয়া চালিয়াছেন। উপজাতি স্বার্থের প্রতি তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে উপজাতি জনগণের বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। বা থাকিতে পারে না। অবশ্য অধুনা অবলুপ্ত ট্রাইবেল ইউনিয়নের নেতাদের বিশেষতঃ স্নেহ কুমার চাকমার দাবীগুলির পেছনে তাহার কোন আন্তরিকতা ছিল কিনা, সেই দাবীগুলি আদায় করা যাইবে সেই বিশ্বাসেই কি তিনি পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৬৫ সালে সদলবলে কংগ্রেস দলে যোগদান করিলেন, সকল দফা বা গোষ্ঠীর ট্রাইবেলদের স্বার্থ সংরক্ষিত হইতে পারে এমনভাবে নূতন করিয়া ট্রাইবেল রিজার্ভ গঠনের কোন প্রতিশ্রুতি বা ব্যবস্থা ছাড়াই মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ অর্ডার ত্রিপুরার সকল ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করিতে পারে না এই অজুহাতে ত্রিপুরা মহারাজার ট্রাইবেল রিজার্ভ ভাঙিয়া দেওয়ার পরও কি তিনি কংগ্রেসে থাকিবেন, এই সকল প্রশ্নের জবাব শ্রীচাকমা দিবেন।

বিবৃতিতে দ্বিজেন - জিতেন - বীরেশ বাবুরা উপজাতি নেতাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে যে কটাক্ষপাত করিয়াছেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের অন্তর্ভুক্ত উপজতি নেতাদের ক্ষেত্রে তা আদৌ খাটে না। উপজাতিদের বর্তমন দুর অবস্থার জন্য কংগ্রেস সরকারই মুলতঃ দায়ী।

বিবৃতিতে বলা হইয়াছে "মহারাজার আমল হইতে এই গণাতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা পর্যন্ত উপজাতিরা শোষিত হইয়া চালিয়াছে। এর জন্য যেমন দায়ী সরকার তেমনি দায়ী উপজাতি নেতৃবৃন্দ"। সরকার উপজতি স্বার্থ নিয়া খেলিয়াছেন আর উপজাতি নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ রাজনৈতিক দলকে চাঙ্গা করিবার জন্য উপজাতিদের নিয়া টানা হ্যাচড়া করিয়াছেন। অন্যথায় স্বাধীনতার ২৬ বৎসর পরেও উপজাতি স্বার্থ একটা সমস্যা হইয়া থাকিত না।

এই বক্তব্যের মধ্য দিয়া বিবৃতিকারীরা ত্রিপুরার উপজাতিদের বর্তমান শোচনীয় অবস্থার জন্যে কংগ্রেস সরকার এবং উপজাতি নেতৃবৃন্দ উভয়কেই সমভাবে দায়ী করিয়াছেন।

গত ২৭ বৎসর ধরিয়া কংগ্রেস সরকারের কাছে উপজাতিরা পদে পদে প্রতারিত, অবহেলিত ও প্রত্যাখাত হইয়াছেন ইহার ফলে উপজাতিদের মনে কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃনা ও অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হইয়া রহিয়াছে। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে এই বিক্ষুব্ধ উপজাতি জনগণ আপোষহীন সংগ্রাম করিয়া চলিয়াছেন বাঁচার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। এই সংগ্রামের অগ্নি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের উপজাতি নেতাদের প্রতি সংগ্রামী উপজাতি জনগণের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে। তাদের আহ্বানে ত্রিপুরার সংগ্রামী উপজাতি জনগণ যেকোন সংগ্রামে নামিতে প্রস্তুত। তাহাদের আস্থাভাজন নেতাদের প্রতি উপজাতি জনগণের বিশ্বাস শিথিল করার জন্যই উপজাতি নেতাদের প্রতি এইরূপ দায়িত্ব জ্ঞানহীন উক্তি করা হইয়াছে বিবৃতিতে, আর সরকারের পর্বত প্রমাণ দোষকে লাঘব করিয়া দেখাইবার মতলবেই উপজাতি নেতাদের ঘাড়ে দোষ চাপাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। একথা আজ কে না জানে যে, উপজাতিদের বর্তমান দুরবস্থার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী হইলেন — কংগ্রেস সরকার। আর কংগ্রেস সরকারের সেই উপজাতি সংহার যজ্ঞের সমর্থন করিয়া যে উপজাতিরা কংগ্রেসকে মদত দিতেছেন তাহারা। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের উপজাতি নেতৃবৃন্দ দায়ী ত নহেনই বরং তাহারা উপজাতি জনগণের এই দূরাবস্থা লাঘব করিবার জন্য কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন আপোষহীন সংগ্রাম করিয়াই চলিয়াছেন। দ্বিজেন - জিতেন - বীরেশ বাবুদের এই বিবৃতিতে উপজাতি জনগণ কখনই বিভ্রান্ত হইবেন না।

যখন কংগ্রেস সরকার মহারাজা কর্তৃক গঠিত উপজাতি রিজার্ভ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার বিরুদ্ধে ত্রিপুরার সকল দফার উপজাতি জনগণ মর্মাহত, ব্যথিত, উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত অথচ সুসংবদ্ধ, যখন ত্রিপুরার উপজতি রিজার্ভ ঘোষণা করিয়া সেই এলাকার জন্য স্বায়ত্ব শাসনমূলক ব্যবস্থা প্রবর্তনের (ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের) দাবীতে ত্রিপুরার ৬টি উপজাতি সংগঠন মিলিতভবে আন্দোলন সংগঠন করার প্রয়াস পাইতেছে, যখন সেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের প্রতি অউপজাতি জনগণ সমর্থন জানাইতেছেন, যখন উপজাতি জনভিত্তিক সংগঠন নহে আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লকের মত দুইটি বামপন্থী রাজনৈতিক দল উপজাতিদের ঐ দাবীর প্রতি সমর্থন জানাইয়াছেন, তখন স্বাভাবিকভাবেই কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেসের ছত্র ছায়ায় পুষ্ট কায়েমী স্বার্থবাদীদের সেই জলাতঙ্কেরই ছাপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ১৯৪৫ সাল হইতে ত্রিপুরার আন্দোলনে যাহারা সক্রিয় রহিয়াছেন, তাহাদের প্রতি ত্রিপুরার জনগণের বিশ্বাস ভঙ্গ করা এবং উপজাতি রিজার্ভ ডাঙ্গিয়া দিয়া ভূমি ব্যবস্থায় উপজাতিদের জন্য এতদিনকার সংরক্ষিত বিশেষ অধিকারের উপর আঘাত হানিয়াছে ইহার বিরুদ্ধে এবং উপজাতি সংগঠন ও ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠনের দাবীতে বর্তমানে যে

আন্দোলন চলিতেছে তাহা বানচাল করিবার এবং উপজাতি জনগণ যাহাতে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতাদের আন্তরিকতার প্রতি সন্ধিহান হইয়া উঠেন এবং আর এস পি এবং ফরওয়ার্ড ব্লক যাহাতে উপজাতিদের এই দাবী সমর্থন প্রত্যাহার করিয়া নেন বা অন্তত নীরব থাকেন সেই উদ্দেশ্যেই এই বিবৃতি দেওয়া হইয়াছে। আমরা এ বিষয়ে নিশ্চিত যে তাহাদের এই বিবৃতিতে কেহ বিভ্রান্ত হইবেন না।

বিভ্রান্তমূলক প্রশ্নসমূহ

বিবৃতিতে প্রশ্ন করা হইয়াছে অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠিত হইলে ইহা দ্বারা উপজাতিদের স্বার্থ কিভাবে সংরক্ষিত হইবে?

অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠিত হইলেই উপজাতিদের সব সমস্যার সমাধান হইবে কিংবা তাহাদের স্বার্থ পুরোপুরি সংরক্ষিত হইবে এমন কথা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ মনে করে না।

ত্রিপুরার উপজাতি সমস্যা একটা জাতি সমস্যা। বুর্জেয়া শাসকগণ এই জাতি সমস্যার সঠিক সমাধান দিতে পারে ন। ছোট ছোট অবিকশিত বা অর্ধবিকশিত জাতি বা গোষ্ঠীর পূর্ণাঙ্গ আত্মবিকাশের সুযোগ বুর্জোয়া শাসকেরা কখনই দিতে পারে না। একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীর আদর্শ এবং নেতৃত্বে পরিচালিত সমাজতান্ত্রিক সরকারই সেই সমস্যার সমাধান দিতে পারে।

কেন আমরা ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল চাই

একথা জানিয়াও আমরা কেন এই বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার মধ্যে অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল বা স্বায়ত্ব শাসনমূলক ব্যবস্থা চাই। এর জবাব খুবই সুস্পষ্ট। বড় জাতির বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী চিরকালই দুর্বল, অনগ্রসর ও ছোট জাতিগোষ্ঠীর উপর জুলুম ও নির্যাতন চালাইয়া থাকে। তাহাদের জাতীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করিবার প্রয়াস পায়। ফলে নির্যাতিক ও নির্যাতীতের মধ্যে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায়।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রেও দেখা যায় যে বড় জাতির (বাঙ্গালী জাতির) বড় জোতদার, ভূমি আগ্রাসী সুদখোর মহাজন, চোরাকারবারী মজুতদার, বড় বড় কন্ট্রাক্টর ও দুর্নীতি পরায়ন বড় আমলাবাহিনী প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থবাদীর দল কংগ্রেস গঠন করিয়া সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতি গোষ্ঠীগুলির নিজ নিজ জাতীয় ঐতিহ্যের ভিত্তিত্বে এক একটি বিকশিতও পূর্ণ জাতিরূপে আত্ম প্রকাশের সকল সম্ভাবনা চূর্ণ-বিচূর্ণ

করিয়া দিয়া উপজাতিদের পুঁজিবাদী সমাজরের সস্তা মজুর বাহিনীতে পরিণত করিবার গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রহিয়াছে। গত ২৭ বছর কংগ্রেস সরকারের কার্য্যাবলীই উহার জলন্ত প্রমাণ।

উপজাতিরা এক একটা এলাকা জুড়িয়া পরস্পর পাশাপাশি বাস করিয়া নিজেদের মাতৃভাষার বিকাশ সাধন করিয়া উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় স্কুল গড়িয়া তুলিয়া নিজেদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করিয়া এক একটা পরিপূর্ণ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করুক বুর্জোয়া শাসক শ্রেণী তাহা চায় না। তাহারা চায় — ত্রিপুরার উপজাতিরা যাহাতে কোন এলাকাতেই সংখ্যাধিক্য হইয়া পরস্পর পাশাপাশি বাস করিতে না পারে, তাহারা যাহাতে বিক্ষিপ্তভাবে বাস করিতে বাধ্য হয়, ফলে, যাহাতে কোন স্কুলেই উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করিয়া তাহাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা লাভের দাবী তুলিতে না পারে এবং তুলিলেও প্রয়োজন সংখ্যক উপজাতি ছাত্র-ছাত্রী নাই এই — অজুহাত দেখাইয়া উজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের মাতৃভাষার শিক্ষালাভের দাবী চাপা দিয়া রাখা যায় আর উপজাতিরা অসম প্রতিযোগিতার স্রোতে জমিজমা হারাইয়া ভূমিহীন দিন মজুরে ও ভিক্ষুক শ্রেণীতে পরিণত হইয়া আপন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ভুলিয়া গিয়া একটা আত্মবিস্মৃত, অসহায় ও মেরুদন্ডহীন হইয়া বড় জাতির অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির কায়েমী স্বার্থের প্রয়োজনে সস্তা মজুর বাহিনীতে পরিণত হয়। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে বড় জাতির কায়েমী স্বার্থের প্রতিভু কংগ্রেস সরকার অর্থাৎ বাঙ্গালী জাতির কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার গত ২৭ বৎসর ধরিয়া সেই জঘন্য উপজাতি সংহার খেলায় মাতিয়াছেন। ত্রিপুরার উপজাতিরা আজ নিজ ভূমে পরবাসী রূপে কাল যাপন করিতে বাধ্য হইতেছেন। উপজাতি রিজার্ভ ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে ত্রিপুরায় তাহারা আদৌ বাস করিতে পারবে কিনা সেই প্রশ্নও আজ জাগিতেছে। উপজাতিরা বাঁচতে চায়। জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া বাঁচিতে হইলে তাহাদের জন্যও ত্রিপুরার অভ্যন্তরে এমন একটা নির্দিষ্ট ভূখন্ড দরকার যেখানে বড় জাতির ভূমি আগ্রাসীরা তাহাদের জমি কাড়িয়া লইতে পারিবে না। যেখানে তাহারা একত্রে পাশাপাশি বাস করিয়া উপজাতিদের জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে একটা পূর্ণ জাতিরূপে বিকশিত হইবার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ কবিবে। উপজাতি রিজার্ভ এবং অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিল সেই প্রাথমিক দায়িত্বই পালন করিবে। বড় জাতির আগ্রাসী অংশের আক্রমণ এবং জুলুমের হাত থেকে উপজাতিদের বাঁচাইতে রক্ষা কবচের কাজ করিবে।

অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলে অ-উপজাতিরা অংশগ্রহণ করিতে পারিবে কি?

এলাকার অ-উপজাতিরা ইহাতে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে তো, এই প্রশ্নের

জবাব হইল যে তাহারা অটোনমাস ডিস্ট্রিক কাউন্সিলের অংশ গ্রহণ করিতে পাবিবেন না। কিন্তু ধরিয়া লওয়া হইতেছে কেন যে ডিস্ট্রিক কাউন্সিল বাঙ্গালী গরীব অংশের স্বার্থ রক্ষা করিবে না। আমরা বলিব এই ডিস্ট্রিক কাউন্সিল হইবে - একটি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত প্রতিষ্ঠান। আমরা একথা জোর করিয়া বলিতে পারি যে, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বিশেষতঃ মহারাজা কর্তৃক ট্রাইবেল রিজার্ভ এলাকায় অ-উপজাতির জনসংখ্যা তখন শতকরা একজনও ছিল না। তবু ত্রিপুরায় কেন ৬ষ্ঠ তপসিল চালু করা হয় নাই। এ প্রশ্নের জবাব মাত্র একটিই। বাঙ্গালী পক্ষপাতদুষ্ঠ ত্রিপুরা সরকার আগেই ঠিক করিয়া নিয়েছিলেন যে প্রয়োজন হইলে উপজাতিদের স্বার্থে চরম আঘাত দিয়াও পূর্ব পাকিস্তান হইতে আগত সকল বাঙ্গালীকে ত্রিপুরায় স্থান দিতে হইবে। তাই উপজাতিদের জন্য সং রক্ষিত ট্রাইবেল রিজার্ভ রক্ষার পরিবর্তে ট্রাইবেল রিজার্ভ ভাঙ্গিয়াছেন। উপজাতি রিজার্ভের আইন কানুন লঙঘন করিয়া যেখানে শতকরা ১০০ জন উপজাতি জনসংখ্যা সেখানেও অউপজাতিদের ছলে বলে কৌশলে জমি দখল করিতে দিয়াছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় সদর বিভাগের আগরতলা সীমানা সড়কের দক্ষিনাংশ হইতে আগরতলা আসাম রোড -এর অভ্যন্তরে (আগরতলা শহর ও ইন্দ্রনগর বাদে) যে বিস্তীর্ণ ভূখন্ড রহিয়াছে তাহাতে শতকরা ৩ জন বাঙ্গালীও ১৯৪৯ সালে ছিল না। অনুরূপ আরও বহু জায়গার নাম করা যায়। প্রশ্ন এই নয় যে ট্রাইবেল রিজার্ভ ঘোষণা করার মত ত্রিপুরার কোন এলাকা ছিল না। প্রশ্ন হইল বহিরাগত সকল বাঙ্গালীকেই ত্রিপুরায় গ্রহণ করিতে হইবে। তাই উপজাতিদের যাহা কিছু ছিল বা আছে সব ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া দিতে হইবে। তাহাতে যদি উপজাতিরা চুলায় যাক যাইবে বাঙ্গালী কায়েমী স্বার্থের কুক্ষিগত কংগ্রেস সরকারের এই দৃষ্টিভঙ্গীই আজ ত্রিপুরার উপজাতি রিজার্ভ ভাঙ্গিয়াছে। বিগত ২৭ বৎসর এতগুলি কান্ড করার পরও ত্রিপুরা সরকার কর্তৃক ১৪/১২/৬৭ সালে ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রদত্ত মতে দেখা যায় ঃ

অমরপুর	টি ডি	ব্লকে	উপজাতি	শতকরা	৮১.৩১	ভাগ
কাঞ্চনপুর	”	”	”	”	৮৩.২১	”
সাব্রুম	”	”	”	”	৬৮.২০	”
ছামনু	”	”	”	”	৮২.৭০	”
ডম্বুরনগর	”	”	”	”	৮৯.৯৩	”
প্রস্তাবিত	টি ডি	ব্লকে	উপজাতি	জনসংখ্যার		হার ঃ
তেলিয়ামুড়া	”	”	”	শতকরা	৫২	”
কল্যাণপুর	”	”	”	”	৫২	”
চড়িলাম	”	”	”	”	৬০	”

বিলোনীয়া	”	”	”	”	৫০	”
ফটিকরায়	”	”	”	”	৫০.৫	”

এখনও সেই প্রস্তাবিত ব্লকগুলির অন্তর্ভুক্ত স্থানসমূহের জনসংখ্যার খুব বেশী হের ফের হয় নাই ঃ

ত্রিপুরার এই উল্লিখিত ১০টি স্থানের অউপজাতি জনবহুল স্থানগুলি বাদ দিলে (তাহা বাদ দেয়ার যথেষ্ঠ সুবিধাও রয়িাছে) শতকরা ৭৫/৮০ ভাগ উপজতি জনসংখ্যা নিয়াই ৩/৪টি ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকা গঠন করা যায়। প্রত্যেকটি এলাকার জন্য আঞ্চলিক কমিটি গঠন করিয়া সর্বোপরি একটি ডিস্ট্রিক কাউন্সিল করা যায় অথবা আঞ্চলিক কমিটি না করিয়া একটি মাত্র ডিস্ট্রিক কাউন্সিল গঠন করিবার বাস্তব অবস্থা একেবারেই নাই এমন নহে, বাঙ্গালী পক্ষপাত দুষ্ট ত্রিপুরা সরকার তাহা করিতে চান না বলিয়াই নানা বিতর্ক উপস্থিত করিয়া ১৯৫৪ সাল হইতেই এই দাবীগুলি নসাৎ করিয়া দিতেছেন।

ইতিমধ্যে ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা একরকম ধ্বংস করিয়া আনা হইয়াছে এই ভাবে যদি আরও কয়েক বৎসর চালাইয়া দেয়া যায়, তাহা হইলে এমন একদিন আসিবে এবং সেদিন বেশী দূরেও নয় যে সত্য সত্যই ত্রিপুরার ট্রাইবেল জনবহুল এলাকা বলিয়া আর কিছু থাকিবে না। শুধু ট্রাইবেল অধ্যুষিত এলাকার জনসংখ্যার চরিত্রই বদলাবে না ট্রাইবেল জনসংখ্যাও নির্মূল হইতে থাকিবে। পুঁজিবাদী শাসন ব্যবস্থা এবং ত্রিপুরার উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ ত্রিপুরার উপজাতিদের সেই দিকেই ঠেলিয়া দিতেছে। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থার ফলে উপজাতিরা দিনের পরদিন আরও গরীব ও নিঃস্ব হইতে থাকিবে। বছর বছর অনসন ও অর্দ্ধানসনে থাকিয়া তাহাদের স্থাবর (জমি) এবং অস্থাবর (থালা বাসন, হালের বলদ প্রভৃতি) সম্পত্তি অউপজাতি বিত্তবানদের নিকট স্থানান্তরিত হইতে থাকিবে। ফলে উপজাতিদের একবড় অংশই পুঁজিবাদী সমাজে পুঁজিপতিদের প্রয়োজনে সস্তা শ্রমিকে পরিণত হইবে। দ্বিজেন - জিতেন - বীরেশ বাবুদের মানস তর্পণে সেই অনাগত ভবিষ্যতের কুৎসিৎ প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হইবে কিনা জানি না, কিন্তু আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় রহিয়াছে যে, ত্রিপুরার চিন্তাশীল জনগণ ত্রিপুরার আদিম অধিবাসী উপজাতি জনগণের অনাগত ভবিষ্যতের সেই চরম দুর্গতির কথা ভাবিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিবেন এবং তাহার জন্য আগাইয়া আসিবেন।

।। 'দেশের কথা' ৮ম বর্ষ ৩৫শ সংখ্যা শুক্রবার ২৪ মে ১৯৭৪ইং।।

গণমুক্তি পরিষদের জন্ম কথা

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দ। যতটুকু মনে পড়ে তখন জ্যৈষ্ঠ মাস। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ এবং ল' ক্লাশগুলি বন্ধ। আমি বাড়ীতে ছুটি ভোগ করছি। এমন সময় রণজিৎ সেন হঠাৎ আমাদের বাড়ীতে এলেন। তিনি বললেন—"দশরথবাবু, একটু সাবধানে থাকবেন। চারিদিকে ধরপাকড় চলছে। বীরেন দত্ত আত্মগোপন করেছেন। দেবপ্রসাদ সেন, প্রভাত রায় ও বংশীঠাকুর প্রমুখ গ্রেপ্তার হয়েছেন। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি অবৈধ ঘোষিত হয়েছে।"

রণজিৎ সেন ত্রিপুরা সরকারের কর্মচারী। পশু চিকিৎসক। জনশিক্ষা সমিতির সম্মুখ সারির নেতারাও গ্রেপ্তার হতে পারেন—এরূপ আভাষও তিনি দিলেন।

সেই দিন থেকেই আমি সাবধান হয়ে গেলাম। রাত্রে আর নিজের বাড়ীতে থাকি না। এভাবে কয়েকদিন কেটে যায়।

এমন সময় একদিন মগলান বাড়ীর বীরচন্দ্র দেববর্মা আমার খোঁজে আমাদের বাড়ী এলেন। তার কাছেই জানতে পারলাম তাদের বাড়ীতে রাজঘাট সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তারামোহন দেববর্মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন।

কাল বিলম্ব না করে তার সাথেই আমি মগলান বাড়ী চলে যাই। সেখানে গিয়ে দেখি তারামোহন দেববর্মা ও বগলা প্রসাদ দেববর্মা আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। ওরা আমাকে জানালেন যে বীরেন দত্ত, হেমন্ত দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মা সদর উত্তরে আমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি তাঁদের সঙ্গেই সদর উত্তরে রাজঘাট গ্রামে চলে গেলাম।

এই তারামোহন দেববর্মা হলেন ' জনশিক্ষা সমিতি'র কর্মী এবং রাজঘাট গ্রামের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। মগলান বাড়ী থেকে রাজঘাট ১০/১২ ঘন্টা পায়ে হাঁটার পথ। বড়মুড়া পাহাড় ডিঙ্গাতে হয়। তখন এই বড়মুড়ার পথ খুবই দুর্গম ছিল। কোথাও দুই পর্বত শিখরের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত সরু ছড়া (ছোট নদী) পথে, কোথাও উঁচু পাহাড়ের গা ঘেঁষে, কোথাও ১৫/১৬ শত ফুট উঁচু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে এই বড়মুড়া পাহাড় অতিক্রম করতে হয়েছিল। পথগুলি ছিল খুবই দুর্গম। জন মানবের কোন চিহ্নও নাই। কেবল মাঝে মাঝে চোখে পড়ত উভয় পাহাড়ের মাঝ দিয়ে প্রবাহিত সরু নদীর দুই পাড়ে বাঘ, ভাল্লুক, বন্য শূকর ও হরিণের পদ চিহ্ন আর গাছের ডালগুলিতে দেখা যেত উল্লুকের নড়াচড়া। মাঝে মাঝে শুনা যেত মথুরা পাখীর (তক্কুর) ডাক। এই গভীর জঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলার সময় অজানা আতংকে মাঝে মাঝে গা ছম ছম করত। পথ ঘাট সবই

আমার কাছে নূতন। সন্ধ্যায় আমরা রাজঘাট গ্রামে পৌঁছলাম।

পরের দিন আমরা (মানে —কমরেড বীরেন দত্ত, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা এবং আমি)—রাজঘাট গ্রামের লক্ষ্মীকান্ত দেববর্মার ঘরে এক আলোচনা বৈঠকে বসলাম। আমার স্পষ্ট মনে আছে কমরেড সুধন্বা সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন না। তারামোহন দেববর্মা, জগবন্ধু দেববর্মা, বগলা দেববর্মা, ভীম দেববর্মা (এঁরা দুজনেই গামছা কবরার) এবং রাজঘাটের হরিকান্ত দেববর্মা সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কি না ঠিক ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। তবে এই জগবন্ধু দেববর্মা এবং তারামোহন দেববর্মা (উভয়েই সরকারী স্কুলের শিক্ষক) যে পরবর্তী সময়ে নানা ভাবে সাহায্য করেছিলেন এটা অনস্বীকার্য্য। আর ভীম দেববর্মা এবং বগলা দেববর্মা ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত আমাদের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। ১৯৬৩ সালে হাজারীবাগ জেল থেকে মুক্তি পেয়ে এসে বগলা দেববর্মা কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কট্টর কমিউনিস্ট বিরোধী হয়ে উঠেন।

রাজঘাট গ্রামের হরিকান্ত দেববর্মা ও রাজমণি দেববর্মা প্রভৃতি আমাদের এই বৈঠকের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরাও আমাদের নির্ভরযোগ্য এবং একনিষ্ঠ কর্মী হয়েছিলেন।

আলাপ আলোচনার পর আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে—ত্রিপুরায় এ ধরপাকড়ের বিরুদ্ধে জোরালো প্রতিবাদ করতে হবে। কংগ্রেস সরকারের এই জুলুমের মোকাবিলা করতে হবে সক্রিয়ভাবে। তার জন্য একটি জংগী সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। সেই বৈঠকে ত্রিপুরা জাতীয় মুক্তি পরিযদ গঠন করা হয়। ইহাই পরবর্তী সময়ে ধাপে ধাপে নাম পরিবর্তিত হয়ে ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদ, ত্রিপুরা রাজ্যগণমুক্তি পরিষদ এবং ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ নামে পরিচিত হয়। দশরথ দেব এবং অঘোর দেববর্মাকে যথাক্রমে এই মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক করা হয়। কেবল প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদক ঠিক করেই সেদিনের বৈঠকের সমাপ্তি ঘটে। আনুষ্ঠানিকভাবে কোন কমিটি সেদিন গঠন করা হয় নাই।

বৈঠকে এও ঠিক হয় যে, দশরথ দেব এবং বীরেন দত্ত একত্রে বসে আলোচনা করে এই মুক্তিপরিযদের রণনীতি ও রণ-কৌশল রচনা করবেন। এবং তা ছাপানো হবে। সেদিন ঠিক হয় খোয়াই বিভাগে কাজ করবেন—দশরথ দেব, সদর উত্তরে কমরেড হেমন্ত দেববর্মা এবং সদর দক্ষিণে কমরেড অঘোর দেববর্মা। কমরেড সুধন্বা সেই বৈঠকে উপস্থিত না থাকলেও আমরা সবাই ধরে নিয়েছিলাম যে তাঁকে পাওয়া যাবে। পরেও তাই হল। তিনি উমাকান্ত একাডেমীর শিক্ষকের চাকুরী ছেড়ে দিয়ে আত্মগোপন

(আন্ডারগ্রাউন্ড) করে আন্দোলনে নামেন। একথা বলা আবশ্যক যে অঘোর দেববর্মা তখন জনগণের কাছে সুধন্বার মত এত পরিচিত নন। জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলনের মধ্য দিয়ে দশরথ ও সুধন্বার নাম জনগণের কাছে অনেক বেশী পরিচিত।

আমার উপর দায়িত্ব পড়ে খোয়াই এবং কমলপুর বিভাগে সংগঠন গড়ার। আর আমরা এও ঠিক করেছিলাম যে— যে সকল উপজাতি যুবক জনশিক্ষা সমিতির উপজাতীয়দের 'দারিদ্র্য ও নিরক্ষরতা' বিরোধী আন্দোলনের সময় সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন বা সক্রিয় ভাবে কাজ কর্ম করেছিলেন তাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে এবং তাদের অবলম্বন করেই গ্রামে সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। এদের সমর্থন এবং সহযোগিতা যে পাওয়া যাবে এটা আমরা ধরেই নিয়েছিলাম। এবং বাস্তবেও তাই হল।

বিস্তারিত কর্মসূচী রচনা করা যায় নাই সেই প্রথম বৈঠকে। কিন্তু মূল লক্ষ্য (জেনারেল আউটলাইন) সেই বৈঠকেই ঠিক হয়। যেমন, আটক রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি, জনশিক্ষা সমিতি সহ অন্যান্য রাজনৈতিক কর্মীদের উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা প্রত্যাহার, ত্রিপুরায় দায়িত্বশীল সরকার প্রবর্তন প্রভৃতি দাবীর ভিত্তিতে আন্দোলন সংগঠিত করা। এই দাবী আদায়ের সংগ্রামে সরকারের যে কোন দমননীতির মোকাবেলা করা। বৈঠকের সিদ্ধান্ত মতে কমরেড বীরেন দত্ত সহ আমি খোয়াই বিভাগের মগলান বাড়ীতে চলে যাই। সেখানে বীরচন্দ্র দেববর্মার (শিক্ষক) ঘরে বসেই আমরা ত্রিপুরা জাতীয় মুক্তি পরিষদের কর্মসূচী প্রস্তুত করি। তখন সমস্যা দেখা দেয় তহবিলের। তখন আমাদের কোন তহবিল নাই। আমি মগলান বাড়ীর কয়েকজনের কাছে টাকা ধার নিয়ে সেই ইস্তাহার ছাপানোর জন্য কমরেড বীরেন দত্তের হাতে ৪০ টাকার মত তুলে দিই। টাকা নিয়ে কমরেড বীরেন দত্ত পূর্ব পাকিস্তানে (এখন স্বাধীন বাংলাদেশ) চলে যান। পথে যাতে বীরেন দত্ত গ্রেপ্তার না হন তার জন্য সম্ভবত সকল প্রকার সতর্কতা অবলম্বনে আমি ত্রুটি করি নাই। বাল্লা রেল ষ্টেশন খোয়াই শহরের কাছে। সেখানে ত্রিপুরার পুলিশের নজর থাকতে পারে। তাই তাকে জঙ্গল পথে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের আসামপাড়া রেলষ্টেশন থেকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হয়।

প্রায় ১০/১৫ দিন পরেই খবর এল যে কমরেড বীরেন দত্ত কাতলামারায় ধরা পড়েছেন। খবর পেয়ে মনে মনে বিরক্ত হলাম এই ভেবে যে কাতলামারায় একটু সাবধানে থাকলে তার ধরা পড়ার কথা নয়। নিশ্চয়ই তিনি অসাবধানভাবে চলাফেরা করেছেন। নতুবা এই ঘটনা ঘটতে পারে না। কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তারের সংবাদে প্রথমে একটু বিমূঢ় হলাম এই ভেবে যে—আমি, অঘোর, হেমন্ত ও সুধন্বা আমরা সকলেই রাজনীতিতে নূতন। সংগ্রামের কৌশল জানা নাই। বীরেন দত্ত ছাড়া এত বড় গুরু দায়িত্ব বহন করতে

পারব কি না। কিন্তু আমার এই প্রতিক্রিয়া ঘুণাক্ষরেও কাউকে জানতে দিই নাই। কারণ, এটা প্রকাশ করার অর্থ— কর্মী এবং জনতার মধ্যে আত্মবিশ্বাসহীনতার বীজ বপন করা। বাস্তবেও হতাশ হই নাই। যে গুরু দায়িত্ব কাঁধে চেপেছে তা বহন করতেই হবে এবং সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে হবে—মনে মনে এ সঙ্কল্প গ্রহণ করে এগিয়ে চললাম।

কমরেড বীরেন দত্ত উপস্থিত থাকলে হয়ত অনেক ব্যাপারে তাঁর উপর নির্ভরশীল হতে হত। কিন্তু তাঁর গ্রেপ্তারে (অনুপস্থিতিতে)সম্পূর্ণ নিজেদের বুদ্ধি বিবেচনা, সংগ্রামী কৌশল ও ব্যক্তিত্ব খাটিয়ে দৃঢ় মনোবল এবং অগাধ আত্মবিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে যেতে হল আমাদের। এই ব্যাপারে কমরেড রবীন্দ্র দেববর্মা ও হেমন্ত দেববর্মা খুব সহায়ক ছিলেন। কিন্তু অঘোর দেববর্মা সব সময় উগ্র পথে পা বাড়াতে চাইতেন। জনগণের প্রতিক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন না। কমরেড সুধন্বা দেববর্মা ধীর এবং বিচক্ষণ। কিন্তু অন্যদের মত তত সক্রিয় নন। কাজেই তার বুদ্ধি পরামর্শ সব সময় পাওয়া যেত না।

কমরেড বীরেন দত্তের গ্রেপ্তার হওয়ার ১৫/২০ দিন পর মুক্তি পরিষদের ছাপানো ইস্তাহার পাওয়া যায়। কাতলামারা অঞ্চলের কমরেড অনন্ত দেববর্মা, কমরেড নীলমণি সর্দার এবং কমরেড প্রভাত দেববর্মা ঐ ইস্তাহারগুলো মগলান বাড়ীতে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।

রবীন্দ্র দেববর্মা কলেজের লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর কথা বলার ক্ষমতা ছিল অদ্ভুত। তাঁকে সহকর্মী হিসেবে পেয়ে আমার কাজকর্মের অনেক সুবিধা হয়ে গেল। খোয়াই বিভাগে প্রথম দিকে আমরা প্রধানত: উপজাতি শিক্ষকদের সাহায্য নিয়েই প্রচার আন্দোলনে অগ্রসর হই। তারাই নিজ নিজ কর্মস্থলের গ্রামবাসীদের ডেকে একস্থানে একত্রিত করে দিতেন। তাতে আমাদের বক্তব্য উপস্থিত করার সুযোগ হত। এধরণের সাহায্যকারীদের মধ্যে ছিলেন ঈশ্বর সর্দ্দার পাড়ার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বীরচন্দ্র দেববর্মা এবং বিদ্যামোহন ঠাকুর পাড়ার প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক বীরেন্দ্র দেববর্মা। সদর উত্তরাঞ্চলে কমরেড হেমন্ত দেববর্মার নেতৃত্বে ও অক্লান্ত পরিশ্রমে শীঘ্রই মুক্তি পরিষদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই স্থানে স্থানে সক্রিয় ও নির্ভরযোগ্য কর্মী বের করতে সক্ষম হন। দুর্গা চৌধুরী পাড়ায় হিরণ দেববর্মা (হেমন্তের বড় দাদা) গামছা কবরা পাড়ার বগলা প্রসাদ দেববর্মা ও ভীম দেববর্মা, কুমারী বিলের তক্ষীরায় (অখিল) দেববর্মা প্রভৃতি আরও অনেক সর্বক্ষণ কর্মী মুক্তি পরিষদের কাজে এগিয়ে আসেন।

সদর দক্ষিণেও কমরেড সুধন্বা দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মার প্রচেষ্টায় অনেক

সক্রিয় এবং সাহসী কর্মী এগিয়ে আসেন। যেমন, শহীদ রাজেন্দ্র দেববর্মা (নারান খাম্পার— সদর দক্ষিণ), ভৈরব দেববর্মা (আমতলী-টাকারজলা) রাধা মাণিক দেববর্মা (সূতার মুড়া), যতীন্দ্র দেববর্মা (বিশ্রামগঞ্জ) এবং আরও অনেক।

খোয়াই এবং সদরের মধ্যে অবস্থার অনেকটা পার্থক্য ছিল। খোয়াই বিভাগের রাজার অন্যতম দক্ষিণ হস্ত ঠাকুর রামকুমার দেববর্মা একজন বিরাট প্রভাবশালী ব্যক্তি। ত্রিপুর সম্প্রদায়ের সর্দ্দারদের মধ্যে তার দারুণ প্রভাব। কাজেই রামকুমার ঠাকুরের প্রভাব মুক্ত করে খোয়াই বিভাগের ত্রিপুরী সর্দ্দারদের প্রগতিশীল ও জঙ্গী আন্দোলনের সপক্ষে টানা সহজসাধ্য ছিল না। সদর বিভাগেও যে সর্দ্দারদের প্রভাব জনতার মধ্যে কম ছিল এমন নয়। তবে ঐ সর্দ্দারগণ একজন বড় সর্দ্দারের দিকে চেয়ে থাকতেন না।

প্রথমেই কমিটি গঠন করার মত পরিস্থিতি ছিল না। তাই কর্মী বাছাই করে ইস্তাহার ব্যাখ্যা করার জন্য প্রথমে আমরা জায়গায় জায়গায় কর্মী পাঠাতে সুরু করি। উপজাতিদের কতকগুলি সার্বজনীন উৎসব হত। যেমন, গঙ্গা পূজা, (হাঁকর পূজা), বৈষ্ণব পূজা ইত্যাদি। ঐ সব উৎসব উপলক্ষে এলাকার বড় সর্দ্দারগণ এবং জনতা একস্থানে একত্রিত হন। আমরা সেই সুযোগ গ্রহণ করি। বড় সর্দ্দারদের অনুমতি গ্রহণ করে আমাদের বক্তব্য রাখি। ইস্তাহার ব্যাখ্যা করি। এখানে এধরণের একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করব। তখন কল্যাণপুর এলাকার জয়কুমার ঠাকুর পাড়ায় (গঙ্গারায় হাওর) এক বড় হাঁকর পূজা (গঙ্গা পূজা) হয়। এই পূজা উপলক্ষে সারা খোয়াই পশ্চিম পাড়ের মন্ডলী সর্দ্দার, ভলেন্টিয়ার (রাজার মনোনীত) এবং বিরাট সংখ্যক জনতা জয়কুমার ঠাকুর পাড়ায় সমবেত হন। (১৯৪৮ সাল) পাগলা বাড়ীর ঈশান সর্দ্দার আমাদের বড় সমর্থক। তিনি আমাকে তথায় নিয়ে যান। পূজা শেষ করে সর্দ্দার ও জনগণ যার যার পাড়াতে (মদ্যপানের বৈঠকে) বসবার আগে আমার ডাক পড়ে সংক্ষেপে বক্তব্য রাখার জন্য। বড় সর্দ্দারদের (সম্পাদকদের) এই আলোচনার বৈঠকের ব্যবস্থা করেন ঈশান সর্দ্দার।

এই ঈশান সর্দ্দার নিজেও একজন বড় সর্দ্দার অর্থাৎ মন্ডলের সম্পাদক। মদ্যপান করার আগে সকলেই আধ ঘন্টার জন্য একটি খোলা জায়গায় সমবেত হন। প্রায় হাজারের মত লোক হবে। সারা খোয়াই পশ্চিম পাড়ের প্রায় সকল মন্ডলের সর্দ্দারগণই সেখানে উপস্থিত ছিলেন। আমি এই সুযোগ পুরা মাত্রায়ই গ্রহণ করলাম। বেশীর ভাগ সর্দ্দারই আমার বক্তব্যে আকৃষ্ট হলেন। তারা সেখানে বসেই সিদ্ধান্ত করলেন যে, —তাঁরা নানা ভাবে আমাদের সাহায্য করবেন। আমাদের কর্মীদের আশ্রয় দেবেন। নিজেরাও সাধ্যমত কাজ করবেন। লেখাপড়া জানা আমাদের সচেতন কর্মীরা যেন তাদের সঙ্গে সর্বদা

যোগাযোগ রক্ষা করেন। সর্দারিগণ এও সিদ্ধান্ত নেন যে, ওরা আমাদের কাউকে পুলিশের হাতে তুলে দেবেন না। বরং পুলিশ যাতে আমাদের গ্রেপ্তার করতে না পারে তার জন্য সর্বদা সতর্কতা অবলম্বন করবেন। তাঁদের এই সিদ্ধান্ত আমাদের কাজ বহুল পরিমাণে সহজ করে দিয়েছিল। কোথাও আর বেশী বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হল না। আমাদের কায়দা ছিল পাড়ায় পাড়ায় গিয়ে রাত্রে (সন্ধ্যার একটু পরে) বৈঠক করা। ইস্তাহারের বক্তব্য ব্যাখ্যা করা। রাজতন্ত্র শেষ হয়েছে। কংগ্রেস গদী দখল করেছে। কংগ্রেসের রাজত্বে উপজাতিদের রক্ষা নাই। কংগ্রেস বড় লোকের স্বার্থ দেখে। উপজাতিরা গরীব ও অনগ্রসর। কংগ্রেস তাদের পায়ের তলায় রাখতে চাইবে। এটা আমরা সহ্য করব না। আমরা এককভাবে কেউ এদের আক্রমণ রুখতে পারব না। সংগঠিতভাবে রুখতে হবে। বনের শক্তিশালী হিংস্র বাঘকে কায়দায় পোষ মানান যায় কিন্তু শোষক কূলের প্রতিভূ কংগ্রেসকে পোষ মানান যাবে না। সর্পকে খতম না করা পর্যন্ত নিস্তার নেই। সাহসী ও দক্ষ তীরন্দাজ বা অব্যর্থ লক্ষ্যভেদী শিকারী একাই বনের বাঘ বা সিংহ, হাতী বধ করতে পারে। কেন না, পশুরা হিংস্র হলেও দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করতে জানে না। আর এরা প্রকাশ্য শত্রু। এরা ভেক ধরে, বন্ধুর ভাব করে আসে না। কিন্তু কোন সাহসী শিকারী বা তীরন্দাজের একার পক্ষে সম্ভব নয় শ্রেণী শত্রু কংগ্রেসকে খতম করা। কারণ, এরা সংগঠিত, চতুর এবং নানা ভেক ধরে শত্রুকে ফাঁকি দিতে জানে, তাই গরীব মানুষের একতার দরকার। এসব বক্তব্য আমরা রাখতাম। জনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত আমাদের বক্তব্য শুনতেন।

ইতিমধ্যে কংগ্রেস সরকারের তৎপরতা আরও বেড়ে যায়। গ্রামগুলিতে গিয়ে সরকারের পুলিশ দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত ও অঘোরের খোঁজ-খবর নিতে আরম্ভ করে। বাজারগুলিতে সর্দারিদের জিজ্ঞাসা বাদ করতে শুরু হয়ে যায়। এদের ধরিয়ে দেবার জন্য সরকারের তরফ থেকে সর্দারিদের উপর চাপ শুরু হয়ে যায়। ফলে, উপজাতিদের মধ্যে একরকম থমথমে ভাব বাড়তে থাকে।

আমাদের কর্মীরা জনগণের অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে থাকে। সেগুলির সঠিক রাজনৈতিক জবাব দিতে সমর্থ কর্মীর সংখ্যা ছিল খুবই কম। তাই, আমি কর্মীদের জন্য কয়েকটি 'বক্তৃতা মালা' প্রস্তুত করি। কর্মীরা যে সব প্রশ্নাবলীর সম্মুখীন হতেন সেগুলির জবাব সেই নোট বইগুলিতে থাকত। ছাপানোর ব্যবস্থার অভাবে সেগুলি হাতে লিখেই কর্মীদের হাতে দিতে হয়েছিল। কমরেড রবীন্দ্র দেববর্মা সেই নোট বইগুলির সদ্ব্যবহার করেছেন। সেগুলির ভিত্তিতে স্থানে স্থানে আলোচনা করেছেন। আমার সেই 'বক্তৃতা মালা' কর্মীদের খুব সাহায্য করেছিল। প্রথমে ঘরোয়া বৈঠক গুলির উপর আমরা জোর দিতাম বেশী। পরে অবশ্য এক একটি অঞ্চলে ৫০০-১০০০ জনতার জনসভাও করেছি।

এই জনসভাগুলির প্রচার অত্যন্ত গোপনে হত। প্রথমে যে যে পাড়াগুলির লোকজন নিয়ে জনসভা করা হত সেই পাড়াগুলির কর্মীদের নিয়ে বৈঠক করা হত। তাদের উপর নির্দেশ থাকত যে মিটিং আরম্ভ হবার মাত্র ৩-৪ ঘন্টা আগেই তাঁরা নিজ নিজ পাড়ায় লোকদের জনসভার কথা বলবেন। সব ব্যাপারেই গোপনীয়তা বজায় রাখা হত। এধরনের জনসভাগুলি এক থেকে দেড় ঘন্টার বেশী দীর্ঘ হত না। দু'একজন বক্তা পরিষদের মূল বক্তব্য উপস্থিত করতেন এই জনসভাগুলিতে।

২/৩ মাসের মধ্যেই যে কোন বিপদের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত এমন বেশ কিছু সংখ্যক কর্মী গড়ে উঠেছিল। সদর উত্তরের গামছাকোবরা, রাজঘাট, কুমারী বিল ও দুর্গা চৌধুরী পাড়ায়, খোয়াই বিভাগের মগলানবাড়ী, ডম্বুর, পাগলাবাড়ী ও নলুং এবং কমলপুর বিভাগের মহারাণী, আভাঙ্গা, লুতমা ও মেন্দী প্রভৃতি পাড়াগুলিকে কেন্দ্র করেই আমাদের আন্দোলন পরিচালনার প্রথম ঘাঁটিগুলি গড়ে উঠেছিল। একটা সময় পর্যন্ত একমাত্র ঐ পাড়াগুলিই ত্রিপুরার উত্তরাঞ্চলে আমাদের নির্ভরযোগ্য আশ্রয়স্থল , যোগাযোগ কেন্দ্র ও মূল ঘাঁটি রূপে কাজ করেছিল। ঐ পাড়াগুলির কর্মীরাই ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে আমাদের সংবাদ বাহকের কাজ করেছিলেন। অনুরূপভাবে সদর দক্ষিণে পদরায় গালেম, নারাণ খাম্পার, জমাদার পাড়া, আমতলী, গাং ঠাকুর প্রভৃতি পাড়াগুলিকে কেন্দ্র করে সদর দক্ষিণাঞ্চলের আন্দোলনের মূল ঘাঁটিগুলি গড়ে উঠে। সদর উত্তর, খোয়াই এবং কমলপুর সরাসরি আমাদের নেতৃত্বাধীন ছিল। কমরেড হেমন্ত দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা এবং আমি প্রায়ই একত্র হতাম। অন্ততঃ প্রতি পনের দিনে একবার। বলা যেতে পারে সদর উত্তর খোয়াই এবং কমলপুরের আন্দোলন পরিচালনার ক্ষেত্রে এই তিন জনের মধ্যে একটা যৌথ নেতৃত্ব মোটামুটি ছিল। কিন্তু সদর দক্ষিণে কমরেড সুধন্বা দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মার উপরই নির্ভরশীল ছিল গোলাঘাঁটির গুলি চালনার সময় পর্যন্ত।

সদর দক্ষিণে কমরেড অঘোর দেববর্মা ও কমরেড সুধন্বা দেববর্মার কাছে আমাদের খবর পৌঁছনোর কাজ একা হীরণ্য দেববর্মাই করতেন। এই হীরন্য দেববর্মা হলেন দুর্গা চৌধুরী পাড়ার কমরেড হেমন্ত দেববর্মার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। হীরেনদা ছাড়াও দুর্গাচৌধুরী পাড়ার অন্যান্য যুবকরাও এ ব্যাপারে বেশ সাহায্য করেছিলেন। এই সব যোগাযোগ রক্ষার কাজে আরও অনেকেই তখন কাজ করেছিলেন। তন্মধ্যে গামছাকোবরার ভীম দেববর্মা, রাজঘাটের হরিকান্ত দেববর্মা এবং রামমণি দেববর্মা, মগলান বাড়ীর ভদ্রমণি দেববর্মা, বুধরায় দেববর্মা, শিবকুমার দেববর্মা, নলুং বাড়ীর মানিয়া দেববর্মা (রাসমণি। পাগলাবাড়ীর দেওয়ান দেববর্মা প্রভৃতি। যোগাযোগ এবং আশ্রয় কেন্দ্র হিসেবে

রাজঘাটের প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক তারামোহন দেববর্মার নামও চিরস্মরণীয়।

খোয়াই বিভাগের মগলান বাড়ী ছিল আমার কেন্দ্রিয় কার্যালয়। এবং এই মগলান বাড়ীকে দুর্গরূপে সুরক্ষিত করে রেখেছিল— এই মগলান বাড়ী ঘিরে রয়েছে যে সব পাড়াগুলি। যেমন, নক্ষত্রবাড়ী, আখড়াবাড়ী, ডঙ্গর বাড়ী, পাগলাবাড়ী, নলুং বাড়ী প্রভৃতি। ঐ পাড়াগুলির কর্মী এবং জনতার সজাগ পাহারায় আমার কার্যালয় শেষ মুহূর্ত পর্যন্তও নিরাপদ ছিল।

মগলান বাড়ীর পূর্ণচন্দ্র সর্দ্দারের ঘর ছিল আমার স্থায়ী আস্তানা। পাগলাবাড়ীর ঈশান চন্দ্র সর্দ্দার এবং মগলান বাড়ীর পূর্ণচন্দ্র সর্দ্দার খোয়াই-এর সামরিক শাসনের আমলে মিলিটারী কর্তৃক ধৃত এবং নির্যাতীত হয়েও শত্রুর নিকট আমার কার্যালয় এবং অবস্থান সম্পর্কে তথ্য ফাঁস করে দেন নাই। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁরা মুক্তি পরিষদের সক্রিয় সমর্থক ছিলেন। পূর্ণচন্দ্র সর্দ্দার শেষ জীবনে অর্থাৎ প্রায় ৭০ বৎসর বয়সে কমিউনিসস্ট পার্টির সভ্যপদও গ্রহণ করেছিলেন।

সশস্ত্র সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে পরে যে অসংখ্য সংগ্রামী কর্মীদল এগিয়ে এসেছিলেন তাঁদের সকলের নাম এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে যাঁদের কেন্দ্র করে এবং যাঁদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমাকে প্রথম প্রথম কাজ করতে হয়েছিল তাদের কয়েকজনের নাম এখানে উল্লেখ করব। তাঁরা হলেন–– মগলানবাড়ীর হীরণ দেববর্মা, পূর্ণচন্দ্র সর্দার, শিবকুমার দেববর্মা, ডঙ্গরবাড়ীর গৌরাঙ্গ ও যুধিষ্ঠির দেববর্মা,পাগলাবাড়ীর ঈশান সর্দার, ধনীরাম দেববর্মা ও দেওয়ান দেববর্মা, নলুং বাড়ীর হরেন্দ্র দেববর্মা, ও মানিয়া দেববর্মা (রাসমণি) এবং নক্ষত্র বাড়ীর জয়চন্দ্র দেববর্মা (জীবন)।

কাতলামারা এলাকার সাথে আমার কার্যালয়ের যোগাযোগ রাখার দায়িত্ব ছিল কমরেড শিবকুমার দেববর্মার উপর। কাতলামারা অঞ্চলেও আমাদের আন্দোলন শীঘ্রই বিস্তৃতি লাভ করে।

এভাবে সর্বত্র বেশ সংখ্যক সচেতন এবং সক্রিয় কর্মী এগিয়ে আসার পর সারা ত্রিপুরায় আন্দোলন পরিচালনার জন্য একটা যৌথ কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভূত হয়। সদর উত্তরের কুমারী বিল গ্রামে বিভিন্ন স্থানে কর্মরত বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে একটি বৈঠক হয়। ১৯৪৮ সালের ভাদ্রমাসে এই বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন— দশরথ দেববর্মা, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, অঘোর দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা, অক্ষীরায় দেববর্মা ও ভীম দেববর্মা। এছাড়াও সদর দক্ষিণ, সদর উত্তর এবং খোয়াই বিভাগের আরও কিছু সংখ্যক সক্রিয় কর্মী উপস্থিত

ছিলেন। (তাদের নাম মনে করতে পারছি না।) কমলপুর বিভাগ থেকে কেউ ছিলেন কিনা তাও ঠিক ঠিক মনে পড়ছে না।

সেই মিটিং ৩ ঘন্টার মত স্থায়ী হয়েছিল। ৫ জনকে নিয়ে মুক্তি পরিষদের কেন্দ্রীয় কমিটি গঠিত হয়। তাঁরা হলেন কমরেড দশরথ দেব, সুধন্বা দেববর্মা, হেমন্ত দেববর্মা, রবীন্দ্র দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা। দশরথ দেব ও অঘোর দেববর্মাকেই যথাক্রমে মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট এবং সাধারণ সম্পাদকের পদে পুণর্বহাল রাখা হয়।

এই বৈঠকেই মুক্তিপরিষদকে সর্বত্র সংগঠনের স্তরে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট -এর রচিত গঠনতন্ত্র গৃহীত হয়।

সিদ্ধান্ত হয়—মহারাজার আমলের ত্রিপুর ক্ষত্রিয়মন্ডলের এক একটি এলাকায় মুক্তি পরিষদের এক একটি ইউনিট কমিটি গঠন করা হবে। এই ইউনিট কমিটির সদস্য সংখ্যা হবে ১১জন। প্রত্যেক ইউনিটে একজন সম্পাদক, একজন সহ-সম্পাদক, একজন কোষাধ্যক্ষ থাকবেন। আর প্রত্যেক ইউনিটের প্রতি পাড়ায় কমপক্ষে দুইজন পত্রবাহক রাখতে হবে।

এই ইউনিট কমিটি গঠনের সময় নজর রাখা যাতে ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডলের সর্দারদের মধ্য থেকে উৎসাহী এবং অপেক্ষাকৃত কম বয়স্কদের কমিটিতে রাখা হয়। সর্দারদের প্রভাব এবং এলাকা সম্পর্কে তাদের জ্ঞান আমাদের সংগঠনের কাজে ব্যবহার করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই আমরা এই সিদ্ধান্ত নিয়েছি। কমরেড অঘোর দেববর্মা অবশ্য সর্দারদের কমিটিতে অন্তর্ভুক্ত করতে আপত্তি করেছিলেন। তাঁর মতে সব সর্দাররাই রাজভক্ত এবং প্রতিক্রিয়াশীল। মুক্তি পরিষদের মত সংগ্রামী সংগঠনে তাদের স্থান থাকতে পারে না। অঘোর দেববর্মার এই বক্তব্য কারও সমর্থন লাভ করে নাই। পক্ষান্তরে আমার বক্তব্যগুলি গৃহীত হয়েছিল।

আমার মতে সর্দারগণ রাজভক্ত এটা ঠিক। কিন্তু যে মহারাজার প্রতি তাদের আনুগত্য সেই রাজা আর জীবিত নাই। সুতরাং রাজার ডাকে আমাদের আন্দোলনের বিরুদ্ধে তাদের সক্রিয় হয়ে উঠার যে আশংকা ছিল তা আপাতত: তিরোহিত বা অনুপস্থিত। দ্বিতীয়তঃ তারা এখনো কংগ্রেসের অনুগত হয়ে উঠেন নাই। রাজতন্ত্র ধ্বংসকারী কংগ্রেস। অতএব রাজভক্ত মন্ডলী সর্দারদের শত্রু কংগ্রেস। অধিকাংশ ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডলের সর্দারগণের চেতনা এই স্তরে। তৃতীয়তঃ সব সর্দারই প্রতিক্রিয়াশীল, তাদের প্রগতিশীল আন্দোলনে টানা যাবে না এ ধারণাটা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। চতুর্থতঃ কংগ্রেস সরকার কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ এবং পুঁজিবাদী ব্যবস্থার রুপকার। কাজেই ত্রিপুরায় বাঙ্গালীদের মধ্যে যে

পুঁজিওয়ালা আছেন, সুদখোর মহাজন ও বড় জোতদার আছেন, তাদেরই স্বার্থ রক্ষার জন্য তাদের ধন বৃদ্ধির জন্য কংগ্রেস সরকার কাজ করবে। এই বাঙ্গালী সমাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল অংশই ত্রিপুরার কংগ্রেস কুক্ষিগত করবে। তাদের আক্রমণ যেমন অন্যান্য অংশের শ্রমজীবী জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে, তেমনি আরও তীব্রভাবে পরিচালিত হবে ত্রিপুরার উপজাতিদের বিরুদ্ধে। কাজেই বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রায় সমস্ত উপজাতীয়দের কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব।

পঞ্চমতঃ ইউনিট কমিটি গঠনের সময় যদি উৎসাহী সর্দারদের আমরা বাদ দিই, তাহলে তাদের শত্রুর শিবিরে ঠেলে দেওয়া হবে। এখন পর্যন্ত কংগ্রেস সরকার এবং ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডলের প্রভাবশালী সর্দারদের যৌথ বিরোধিতার মোকাবিলা করে এগিয়ে যাবার মত অবস্থা আমাদের হয় নাই। শত্রুর সংখ্যা বৃদ্ধি না করে, তলে তলে দ্রুত শক্ত ও মজবুত সংগঠন গড়ে তুলে যে কোন পরিস্থিতির মোকাবেলা করার মত শক্তি সংহত করার কৌশল রূপেই আমরা এখন সর্দারদের ক্ষেপাতে পারি না। আমার এই বক্তব্যের নির্ভুলতা পরে প্রমাণিত হয়েছিল। আমি এখানে সেই আলোচনায় যাব না।

আন্দোলন পরিচালনার জন্য তহবিলের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই তহবিল সংগ্রহের সময় টের পাওয়া গেল আমাদের মুক্তি পরিষদের জনপ্রিয়তা। প্রায় প্রত্যেক মন্ডলী সর্দারই সর্বাগ্রে চাঁদা দিয়েছিলেন। নিতান্ত গরীব উপজাতি পরিবারও এক টাকার কম চাঁদা দেন নাই।

এতদিন আমাদের কাজের ধারা চলত বিচ্ছিন্নভাবে। অর্থাৎ এক একজন ব্যাক্তির ভালমন্দ বোধের উপর। সোজা কথা ব্যাক্তিকেন্দ্রিক। কিন্তু কুমারীবিল এর এই মিটিং - এর মধ্য দিয়ে একটা যৌথ নেতৃত্ব গড়ে তোলার নিম্নতম পদক্ষেপ গৃহীত হল। তা করা হল— কেন্দ্র থেকে নিম্ন স্তর পর্যন্ত, কেন্দ্রিয় কমিটি এবং ইউনিট কমিটি গঠনের মধ্য দিয়ে। তখন থেকেই কেন্দ্রিয় কার্য্যালিয় থেকে কাজের নির্দেশ দেওয়ার কাজ শুরু হয়।

সর্বহারা শ্রেণীর রাজনৈতিক চেতনার মান উন্নত করার জন্য কর্মীদের মধ্যে মার্কসবাদী সাহিত্য প্রচারের সম্ভাব্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। ছোটদের রাজনীতি, ছোটদের অর্থনীতি, কমিউনিজমের গোড়ার কথা, কমিউনিষ্ট ইস্তাহার, পরিবার, ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, নয়া গণতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থ দিয়ে ভ্রাম্যমাণ মার্কসবাদী সাহিত্য পাঠচক্র গড়ে তোলা হয়। এভাবে কমিউনিষ্ট আদর্শ ব্যাপকভাবে উপজাতিদের মধ্যে নিয়ে যাবার সূচনা করা হয়।

(জ্বালা ।। জুলাই-আগস্ট ১৯৭৪)

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার আগুনে পা দেবেন না

কংগ্রেস সরকার ট্রাইবেল রিজার্ভ ভাঙ্গার পর উপজাতিরা স্বাভাবিকভাবে বিক্ষুব্ধ। এ বিক্ষোভ ন্যায় সঙ্গত। কাজেই উপজাতিরা অত্যন্ত যুক্তিসঙ্গত কারণেই এই উপজাতি রিজার্ভ ভাঙ্গার আইন বাতিল করায় আন্দোলনে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। ত্রিপুরার অ-উপজাতিরা জনগণের গণতান্ত্রিক অংশ উপজাতি জনগণের সংবিধান স্বীকৃত দাবীগুলির প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন।

এই ন্যায়সঙ্গত দাবীর আন্দোলন ধ্বংস করার জন্য অ-উপজাতিদের কায়েমী স্বার্থান্ধও প্রতিক্রিয়াশীল অংশ বসে নাই। এই প্রতিক্রিয়াশীলরা মহাজনদের দ্বারা বেআইনীভাবে দখল করা উপজাতিদের জমি ফেরৎ না দেওয়া এবং উপজাতি রিজার্ভ গঠনের বিরুদ্ধে অউপজাতিদের আন্দোলনে নামাবার জন্য সক্রিয় রয়েছে। তারা সমগ্র উপজাতির জনগণকে অউপজাতিদের শত্রুরূপে চিহ্নিত করতে তৎপর। এভাবে তারা পাহাড়ী বাঙ্গালী বিদ্বেষ চাঙ্গা করে, স্থানে স্থানে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সৃষ্টি করে ত্রিপুরার সকল অংশের শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত হানতে তৎপর।

কংগ্রেস সরকার দেশে পুঁজিবাদী সমাজ গড়ে তুলেছেন। দুর্বল অংশের জনগণকে শোষণ না করে, তাদের উপর জুলুম না চালিয়ে পুঁজিবাদের কলেবর বৃদ্ধি হতে পারে না। শ্রেণী শোষণকে ভিত্তি করেই পুঁজিবাদ আত্মপ্রকাশ করে। এবং শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে চায়। শ্রেণী শোষণই পুঁজিবাদের মূল ভিত্তি।

এই শ্রেণী শোষণ টিকিয়ে রাখার জন্যই পুঁজিবাদীরা রাষ্ট্র শক্তি তাদের হাতের মুঠোয় এনে দেয় এবং সমাজে চোরাকারবারী, টাউট, সমাজদ্রোহীরা কিছুদল সৃষ্টি করে। এই সমাজদ্রোহীরা পুঁজিবাদের পরোক্ষ এবং প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় সমাজের সাধারণ নাগরিকদের উপর নানান জুলুম কাজে লিপ্ত হয়। আর এদের এইসব সমাজদ্রোহী কাজকর্ম শাসকগোষ্ঠী শুধু নীরবে সহ্যই করে না, নানাভাবে এদেরে মদতও দেয়। এদের সহযোগিতা ভিন্ন শোষকগোষ্ঠী নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে না।

ত্রিপুরায় এই ধরণের সমাজদ্রোহীর সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ওরা তথাকথিত আইনশৃঙ্খলার রক্ষক সরকারী আরক্ষা দপ্তরের নাকে ডগায় ছিনতাই, নারী ধর্ষণ প্রভৃতি অপরাধমূলক কাজে লিপ্ত থাকে। তারা আগরতলা শহরে প্রকাশ্য দিবালোকে জোর করে বাঙ্গালী মহিলাদের গলার হার কেড়ে নেয়। যুবতী মেয়েদের রাস্তা থেকে ধরে নিয়ে ধর্ষণ

করে। কিন্তু অপরাধীর শাস্তি হয় না। বাঙ্গালী সমাজের গুন্ডারাই বাঙ্গালী নারীদের অপমান লাঞ্ছনা করে। স্বজাতি বা উপজাতি পার্থক্য তাদের কাছে অর্থহীন।

দুর্গা পূজার সময় দুর্গা প্রতিমা দর্শন করতে এসে উপজাতি নারীরা আক্রান্ত হন রবীন্দ্রনগরে। ঘটনাটি কি? ঘটনা হলো কিছু উপজাতি মেয়ে প্রতিমা দর্শন করে ফিরে যাচ্ছিলেন। কয়েকজন দুষ্ট প্রকৃতির বাঙ্গালী যুবক তাদের রাস্তা থেকে জোর করে ধরে নিয়ে ধর্ষণের চেষ্টা করে। আক্রান্ত উপজাতি মেয়েদের চিৎকারে পার্শ্ববর্তী স্থানের লোকজন ছুটে এলে দুবৃত্তরা পালিয়ে যায় এবং উপজাতি মেয়েরা রক্ষা পায়। পুলিশের নিকট রিপোর্ট করেও তেমন কোন প্রতিকার পাওয়া যায় নাই। এটা জঘন্য অপরাধ— এ বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকার কথা নয়। কিন্তু এটাকে বাঙ্গালী জাতির অপরাধ, গোটা বাঙ্গালী জাতির লোকেরা পরিকল্পিতভাবে উপজাতি নারীদের শ্লীলতাহানির কাজে নিয়োগ করার জন্য এই গুন্ডাদের সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের লেলিয়ে দিয়েছেন আর এর প্রতিশোধে বাঙ্গালী জাতির লোকদের উপরই নিতে হবে এরূপ মনে করলে প্রকৃত অপরাধীর শাস্তি হবে না। প্রকৃত অপরাধীকে খুঁজে বের করে শাস্তি বিধানের জন্য উপজাতি বাঙ্গালী জনগণের সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা গড়ে উঠার পরিবর্তে অপরাধীকে আড়াল করে রেখে সাম্প্রদায়িক যুদ্ধে লিপ্ত হবার প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে। ফলে উভয়েরই ক্ষতি হবে।

দুর্গা পূজার সময় জম্পুইজলা এলাকায় সোমবার বাজারে দারুণ অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। গত অক্টোবরে শনিবার দিন একদল উপজাতি মেয়ে রাত্রে যাত্রা গান দেখতে গেলে উপজাতি গুরুদয়াল পাড়ায় যাবার পথে একদল সমাজ বিরোধী বাঙ্গালী কর্তৃক আক্রান্ত হয়। এই সমাজবিরোধীরা ঐ মেয়েদের উপর পাশবিক অত্যাচারের চেষ্টা করে। ঘটনাটি ঘটে জম্পুই বাজারের কাছে। কাজেই হৈ চৈ শুনা মাত্র ছুটে গেলে সমাজবিরোধীরা পালিয়ে যায়। পরের দিন এই ঘটনায় উত্তেজিত হয়ে কিছু উপজাতি যুবক দুষ্কৃতকারীদের মারধোর করে। ইহার পরই উত্তেজনা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে। উপজাতি যুব সমিতি পূজা বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। ২২শে অক্টোবর ৭মী পূজার দিন উপজাতি যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় পিকেটিং করতে থাকে। ঐদিন সোমবার বাজারে দুই জনকে (উপজাতি) বাঙ্গালীরা আটক করে রেখে মারধোর করে।

উপজাতিরাও প্রতিশোধ নেবার জন্য পরবর্তী সময়ে দলবদ্ধভাবে বাজার আক্রমণ করে। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়। একজন বাঙ্গালী নিহত হয়। এরপর ঘটনা আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠে। বাঙ্গালীদের প্রত্যাক্রমণ রুখার জন্য দলবদ্ধভাবে এগিয়ে আসে। এ ভাবেই ঘটনার বিস্ফোরণ ঘটে। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রভাবে পরিচালিত হয়ে অপরাধীকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে উভয় সম্প্রদায়ের জনগণ মিলিতভাবে

অপরাধীদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যে সমাজগত ও সম্প্রদায়গতভাবে জোট বাঁধেন এবং পাহাড়ী বাঙ্গালী দাঙ্গার আগুন লাগাতে এগিয়ে আসেন। অবশ্য স্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিদের হস্তক্ষেপে ঘটনা যতদূর গড়াতে পারত ততদূর গড়ায়নি।

এ ঘটনা থেকে পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষের কয়েকটি শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। যেমন ঃ

১) অপরাধীকে অপরাধী হিসাবেই দেখা। নিজ সম্প্রদায়ের অপরাধী ব্যক্তিদের আড়াল করার জন্য সম্প্রদায়ের লোক যদি দলবদ্ধ হয়ে দাঁড়ান তাহলে অপর সম্প্রদায়ের লোকেরাও সেই পথই বেছে নেয়। ফলে প্রকৃত অপরাধী রেহাই পেয়ে যায়।

২) পাহাড়ী ও বাঙ্গালী এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই দুষ্কৃতকারী লোক আছে, তেমনি চিন্তাশীল লোকও আছে। এই উভয় সম্প্রদায়ের চিন্তাশীল লোকদের সময়োচিত হস্তক্ষেপের ফলেই দাঙ্গার আগুন বেশী দূর ছড়াতে পারে নাই। সাম্প্রদায়িক দুটি শক্তিকে কোণঠাসা এবং শুভ শক্তিকে সংহত করাই হবে পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী এই উভয় সম্প্রদায়ের গণতান্ত্রিক জনগণের পার্থক্য।

৩) এই সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা বা দাঙ্গায় পাহাড়ী এবং বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের শ্রমিক, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী প্রভৃতি সাধারণ মানুষের কোন লাভ নাই। দাঙ্গার মধ্যে দিয়ে উপজাতিদের কোন সংবিধানিক দাবীও পাওয়া যাবে না। এবং এই দাবীগুলি আদায়ের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করবে। আর কায়েমী স্বার্থবাদীরা এই ধরনের ঘটনা থেকে লাভ উঠাবে।

জম্পুইজলার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে গাবর্দি বাজারে কতিপয় বড় ব্যবসায়ী উপজাতিদের বিরুদ্ধে বাঙ্গালীদের উত্তেজিত করে। উপজাতিরা বাঙ্গালী প্রধান বাজার বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। বাজার বয়কট হয়। উপজাতিদের শাস্তি দেবার জন্য বাজারের বড় ব্যবসায়ীরা জোটবদ্ধ হয়ে পরের বাজারে বাইরের ব্যবসায়ীদের কাঁচামাল কেনা বন্ধ করে দেয়। ফলে লাকড়ী, পাট, কলা প্রভৃতি আমদানীকৃত কাঁচামাল অবিক্রীত থেকে যায়। শেষ পর্যন্ত অস্বাভাবিক সস্তা দরে উপজাতি বিক্রেতারা স্থানীয় ব্যবসায়ীদের কাছে দিয়ে যেতে বাধ্য হন। এতে উপজাতিদের মধ্যে যে সাম্প্রদায়িক শক্তি আজ সক্রিয় রয়েছে তারা উপজাতি সাধারণ মানুষকে বাঙ্গালী বিরোধী করে তুলতে সুযোগ পায়।

এ ঘটনা পাহাড়ী ও বাঙ্গালীর সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ সাধন করে না। বরং উপজাতিদের শাস্তি দেবার নামে বড় ব্যবসায়ীরা জলের দরে কাঁচামাল কিনে বেশী দরে শহরে চালান দিয়ে প্রচুর মুনাফা লুণ্ঠনের মোকা করে নিলেন। তাতে কেবল উপজাতি

বিক্রেতারাই লুণ্ঠিত হলেন না , বাঙ্গালী গরীব বিক্রেতারাও ক্ষতিগ্রস্ত হলেন। পাহাড়ী ও বাঙ্গালী এই সাম্প্রদায়িক বিভেদ মনোবৃত্তি না থাকলে উভয় সম্প্রদায়ের সাধারণ মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই লুণ্ঠনকারী ও অসাধু বড় ব্যবসায়ীদের এ ধরণের অপকর্মের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠতে পারতেন। জনগণের মূল শত্রু শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে সামিল হবার পরিবর্তে তাঁরা পাহাড়ী ও বাঙ্গালী এই দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে রইলেন। মাঝখানে ফায়দা উঠাল সমাজের দুষ্টচক্র, যারা বাঙ্গালী বা পাহাড়ী সাধারণ মানুষের বন্ধু নন, যারা উভয় অংশের গরীবদের শোষণ করেই টাকার পাহাড় জমান।

পাহাড়ী ও বাঙ্গালী জনগণের মিলিত প্রচেষ্টাতেই ত্রিপুরার অর্থনীতি গড়ে উঠেছে। ভবিষ্যতেও গড়ে উঠবে। কেউ কাউকে বাদ দিয়ে চলার চিন্তাধারা অবাস্তব ।

বাঙ্গালীদের বাদ দিয়ে উপজাতিরা নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি এবং উৎপাদন কার্য চালাইবার আবশ্যকীয় যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করতে পারবেন না। ফলে তাদের বেঁচে থাকার পথে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে। আবার ছোট বড় বাঙ্গালী ব্যবসায়ীরা শুধুমাত্র বাঙ্গালীদের কাছে জিনিষ বিক্রয় করেই টিকে থাকতে পারেন না। উপজাতি ক্রেতাদের প্রয়োজনও আছে। আজ যদি উপজাতি এলাকার বাজারগুলি বন্ধ হয়ে যায়, উপজাতি ক্রেতারা যদি বাজারে আসা বন্ধ করে দেয়, তাহলে বাঙ্গালী ছোট বড় ব্যবসায়ীরা প্রচন্ড মাড় খাবেন। উপজাতিরাও বাঙ্গালী জনসংখ্যা প্রধান শহরাঞ্চলে পা না দিয়ে থাকতে পারবেন না। তাই একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা অর্থহীন। কাজেই, একে অন্যের ন্যায়সঙ্গত দাবী নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করে নিয়ে উভয় অংশের শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলে প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম করেই আমাদের টিকে থাকতে হবে। এটাই হবে সকল জাতি ও উপজাতির জনগণের বাঁচার পথ।

(দেশের কথা, ৯ ম বর্ষ ৭ ম সংখ্যা ২১ কার্তিক ১৩৮১, ৮ নভেম্বর ১৯৭৪)

কগবরক লিখিতরূপে উত্তরণের পথে ঐতিহাসিক অন্তরায় ও বঙ্গ সংস্কৃতির ভূমিকা

ভাষার উৎকর্যতা জাতি বিকাশের অন্যতম প্রধান অঙ্গ। প্রবাদ আছে, যে জাতির ভাষা যত বেশী উন্নত সেই জাতি তত বেশী শক্তিশালী। অতীতেও ককবরগ ভাষার লিখিত রূপ দেবার একটা মৃদু প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে স্বর্গীয় রাধামোহন দেববর্মা মহাশয় সেই প্রচেষ্টা নেন। কিন্তু সেটা ছিল নেহাৎ ব্যক্তিগত ও সীমিত প্রচেষ্টা। তাঁর সেই প্রচেষ্টার পেছনে আগরতলা শহরবাসী লেখাপড়া জানা অন্যান্য কগবরক ভাষী উপজাতি ব্যক্তিদের যৌথ উদ্যোগ ছিল কিনা, তাঁর সেই প্রচেষ্টার প্রতি তাঁদের আন্তরিক সমর্থন ছিল কিনা, তা আমার জানা নেই। তবে এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে যে, তাঁর সেই প্রচেষ্টা কগবরক ভাষীদের মধ্যে তেমন গণ-উদ্যোগ বা তেমন আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে নাই। এই ব্যর্থতার বিভিন্ন কারণ বিশ্লেষণের দিকে না গিয়েও সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে,তখন ব্যাপক গণ-উদ্যোগ গড়ে উঠার মত বাতাবরণ ছিল না।

এই মহতী প্রচেষ্টার অসাফল্যের প্রথম এবং প্রধান কারণ হিসাবে ধরে নেওয়া যেতে পারে যে,স্বর্গীয় রাধামোহন দেববর্মার সেই প্রচেষ্টার প্রতি তদানীন্তন শাসক মহারাজারা তেমন আমল দেন নাই। সম্ভবতঃ ত্রিপুরার রাজারা এটা ধরেই নিয়েছিলেন যে, নিজস্ব লিপিবিহীন কগবরক ভাষাকে কখনই লিখিতরূপে উত্তরণ করা যাবে না। একটি অলিখিত উপভাষাকে (dialeot) লিখিতরূপ দিতে গেলে যে পরিমাণ আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা এবং ভাষা বিজ্ঞানীদের সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া দরকার ছিল স্বর্গীয় রাধামোহন ঠাকুর নিশ্চয়ই তা পান নাই। ঐই সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে তাঁর সেই মহতী প্রচেষ্টা বেশীদূর অগ্রসর হতে পারে নাই। আমরা আজ একথা বলতে বাধ্য হব যে, রাধামোহন দেববর্মার সেই মহতী প্রচেষ্টার রথের চাকা মাঝপথে থেমে যাবার মূলে প্রধানতঃ দায়ী ত্রিপুরার রাজারা। ত্রিপুরার রাজারা কগবরক এবং কগবরক ভাষীদের প্রতি ক্ষমার অযোগ্য বিশ্বাসঘাতকতা করে গেছেন।

প্রশাসনিক প্রয়োজনে বাংলা ভাষা

কোন না কোন লিখিত ভাষার সাহায্য ব্যতীত রাজ্যের শাসনকার্য চলতে পারে না। ত্রিপুরার আদিম বাসিন্দা কোন উপজাতি - গোষ্ঠীর ভাষারই লিখিতরূপ ছিল না অথবা কোন দিন ছিল কিনা তা এখনো অনাবিষ্কৃত। সবগুলিই কথ্য ভাষার স্তরে। ফলে,

শাসনকার্য পরিচালনার প্রয়োজনে ত্রিপুরার রাজারা একটা লিখিত ভাষার অবলম্বন খুঁজতে বাধ্য হন। তাঁরা সহজেই তা পেয়ে যান। পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রের জনগণের বিকশিত বাংলা ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করে রাজারা বাংলা ভাষাকেই ত্রিপুরার সরকারী ভাষার মর্যাদা দেন।

দুই রাজবংশের দুই বিপরীত দৃষ্টিভঙ্গী

মণিপুরের রাজবংশ

মণিপুরী ভাষারও নিজস্ব লিপি ছিল না বা এখনো নাই। মণিপুরী ভাষারও লিখিত রূপও ছিল না। কিন্তু মণিপুরের রাজাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল যে, মণিপুরী ভাষার লিখিতরূপ দেওয়া এবং মণিপুরীদের একটা বিকশিত জাতিরূপে গঠন করা। তাই মণিপুরের রাজারা প্রথমে বাংলা ভাষাকে মণিপুর রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী সময়ে বাংলা লিপির মাধ্যমে মণিপুরী ভাষাকে লিখিতরূপে উত্তরণের ব্যবস্থা করেন। এভাবে অন্তর্বর্তীকালীন মণিপুর রাজ্যের সরকারী ভাষারূপে গৃহীত বাংলা ভাষার পরিবর্তে মণিপুরী ভাষাকে রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা দেন। মণিপুরীদের জাতি স্তরে বিকশিত হবার মূলে ইহাও অন্যতম প্রধান সোপান।

ত্রিপুরার রাজবংশ

ত্রিপুরার রাজাদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার অন্তর্বর্তীকালীন সরকারী ভাষারূপে বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করার দৃষ্টিভঙ্গী ত্রিপুরার রাজাদের ছিল না। তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল বাংলা ভাষাকেই ত্রিপুরা রাজ্যের স্থায়ী সরকারী ভাষারূপে গ্রহণ করা। তাই, রাজারা ত্রিপুরার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমষ্টির ভাষা কগবরক ভাষার লিখিতরূপ দিয়ে, তার বিকাশ সাধন করে পরবর্তী সময়ে বাংলার পরিবর্তে কগবরককে ত্রিপুরার সরকারী ভাষায় পরিণত করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন নাই। বরং রাজাদের আমলে তার বিপরীত কার্যক্রমই গ্রহণ করা হয়েছিল।

বাঙ্গালী ও বঙ্গ - সংস্কৃতির প্রভাব বৃদ্ধি

বাংলা ভাষা ত্রিপুরা রাজ্যের সরকারী ভাষার মর্যাদা লাভের পর ত্রিপুরায় এক নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। সরকারী কাজকর্ম পরিচালনার জন্য উপযুক্ত লেখাপড়া জানা প্রচুর সংখ্যক কর্মচারীর প্রয়োজন দেখা দেয়। ত্রিপুরায় মূল অধিবাসী উপজাতিদের মধ্যে বাংলা ভাষায় লেখাপড়া জানা লোক পাওয়া তো দূরের কথা, এমনকি বাংলা ভাষা

বুঝতে পারেন এমন লোকের সংখ্যা ও তখন অত্যন্ত বিরল ছিল। কাজেই, ত্রিপুরার সরকারী কাজকর্ম পরিচালনাব প্রয়োজনে প্রচুর সংখ্যক বাঙ্গালী আমলা কর্মচারী বাংলাদেশ থেকে আমদানী হতে থাকে। ফলে,ত্রিপুরার জনসংখ্যার প্রায় সবই উপজাতীয় হলেও অফিস- আদালতে শতকরা একশত জনই বাঙ্গালী কর্মচারীতে ভরে যায়। সিংহাসনের মালিক একমাত্র রাজাকে বাদ দিলে পিয়ন থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত সকল পদ বাঙ্গালীদের দখলে চলে যায়। এভাবে রাজাদের আমলেই ত্রিপুরার প্রশাসনিক যন্ত্র ত্রিপুরা রাজ্যের মূল অধিবাসী উপজাতীয়দের হাত থেকে ভিন্ন রাজ্যবাসী বাঙ্গালীদের দখলে চলে যায়। ত্রিপুরার অধিবাসী উপজাতিয়রা অত্যন্ত অনগ্রসর। জুম চাষই ছিল তাঁদের একমাত্র জীবিকা। জুম অপেক্ষাকৃত জটিলতাপূর্ণ উৎপাদন ব্যবস্থা হলেও কৃষিতে তখনো উপজাতিয়রা তেমন আকৃষ্ট হন নাই। ফলে, বাংলাদেশের সীমান্তবর্তী ত্রিপুরার সমতল ভূমিতে ধীরে ধীরে বাঙ্গালী মুসলমান এবং হিন্দু কৃষকের আগমন ঘটে। এভাবে ত্রিপুরার ভূ-মন্ডলে সমতল ভূমির এক বড় অংশও তাঁদের দখলে চলে যায়। আর, ব্যবসা বাণিজ্যও বাঙ্গালী হিন্দুদের একচেটিয়া হয়ে উঠে। তাই বাংলা ভাষা কেবলমাত্র ত্রিপুরার সরকারী ভাষার স্থানই দখল করে নাই, কালক্রমে ত্রিপুরার বাণিজ্যিক ভাষার স্থানও লাভ করে। ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা কবা, বাজাব সদাই করা প্রভৃতি আদান প্রদানের ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করে। কাজেই দেখা যায় যে, ত্রিপুরার রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে বাঙ্গালীদের প্রভাব ও প্রতিপত্তি,ত্রিপুরার সরকারী চাকুরীতে একচেটিয়া দখল প্রভৃতি কেবলমাত্র কংগ্রেস সরকারেব আমলেই হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে নাই, এই প্রক্রিয়ার গোড়াপত্তন হয়েছিল বহু পূর্ব থেকেই। এভাবে ত্রিপুরার উপজাতিদের তথাকথিত সবচেয়ে আত্মীয়রূপে পরিচিত ও বিবেচিত রাজাদের আমলেই বাঙ্গালীদের ত্রিপুরায় প্রবেশের অবারিত দ্বার খুলে দেওয়া হয়েছিল।

কংগ্রেস শাসনে অভাবনীয় সংখ্যায় বাঙ্গালী অনুপ্রবেশ

রাজতন্ত্রের অবসানে ত্রিপুরার শাসন ক্ষমতা কংগ্রেসের হাতে আসার পর এই প্রক্রিয়া আরো তরান্বিত এবং ব্যাপকতা লাভ করে। ভারতে কংগ্রেস শাসন প্রথম জন্মলাভ করে দেশ ভাগাভাগীর ভেতর দিয়ে। ভারত হিন্দুস্থান এবং পাকিস্তান এই দুই রাষ্ট্রে বিভক্ত হবার ফলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১০/১২লক্ষ বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় প্রবেশ করেন। আজ পূর্ব পাকিস্তান রাষ্ট্র বিলুপ্ত হয়ে স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু সেই বাংলাদেশ থেকে বাঙ্গালী হিন্দুর ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশ অব্যাহত রয়েই গেছে। অর্থাৎ ত্রিপুরায় বাঙ্গালী হিন্দুদের অনুপ্রবেশের দ্বার চির উন্মুক্তই থেকে যাচ্ছে। কংগ্রেস সরকারের সঙ্কীর্ণ ও সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের খাতিরে এই সাতাশ বৎসর অতিক্রম

হয়ে যাবার পরও - স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে নতুন এবং ভিন্ন রাষ্ট্র গড়ে উঠার পরও এখনো সেই ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী বাঙ্গালী হিন্দুদের অবাধে ত্রিপুরায় এসে বসবাস করার সুযোগ অব্যাহত রেখেছেন। ফলে, বাঙ্গালী হিন্দু জনসংখ্যা ত্রিপুরায় দ্রুত গতিতে বেড়েই চলেছে। তারই পরিণতি হচ্ছে যে, এই অপেক্ষাকৃত দুর্বল ও সংখ্যালঘুতে পরিণত উপজাতিরা জমি থেকে দ্রুত উচ্ছেদ হয়ে যাচ্ছেন। কাজেই, উপজাতীয়দের মধ্যে বাঙ্গালী বিরোধী প্রবণতা বাড়ছে। আর উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টি-ভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার নানা প্রশ্ন তুলে উপজাতীয়দের রক্ষাকবচমূলক যাবতীয় অত্যাবশ্যক দাবীসমূহ অগ্রাহ্য করে উপজাতীয়দের আপন জাতিসত্ত্বা রক্ষা করে একটি বিকশিত জাতিতে উন্নীত হবার পথ রুদ্ধ করে রাখতে চাচ্ছেন।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে উপজাতীয়দের রক্ষাকবচ মূলক দাবী -দাওয়া নিয়ে লড়াই করছেন দীর্ঘ দিন ধরে। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এই দাবীগুলি নিয়ে সংগ্রাম না করলে এতদিনে কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের প্রচন্ড ঘাত-প্রতিঘাতে ত্রিপুরার উপজাতিরা আরো অধিকতর বিপন্ন বোধ করতেন। ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকারের উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ত্রিপুরার বৃহত্তম উপজাতি সম্প্রদায় ত্রিপুরীদের মাতৃভাষা কগবককে লিখিতরূপ দান, মাতৃভাষার মাধ্যমে উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গ্রহণ, উপজাতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলের আঞ্চলিক অখন্ডতা সংরক্ষণ, অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন, উপজাতিয়দের জমি অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তর সম্পূর্ণ নিষিদ্ধকরণ, বে-আইনীভাবে অ-উপজাতীয়দের নিকট হস্তান্তরিত জমি উপজাতীয়দের প্রত্যার্পণ প্রভৃতি আশু দাবীগুলি পূরণের পথে দারুণ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে চলেছে। ঐ দাবীগুলি নিয়ে যাঁরাই আন্দোলনে নামছেন, সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়তাবাদী, বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং বাঙ্গালী বিরোধী প্রভৃতি অপবাদ দিয়ে পুলিশ ও সি আর পির' বুলেটের আঘাতে তাদেরকে দাবিয়ে রাখতে কংগ্রেস সরকার অনবরত চেষ্টা করে চলেছেন। একটি নির্যাতিত গোষ্ঠীর আত্মপ্রকাশের জাগরণ যে অদমনীয় ও দুর্বার কংগ্রেস সরকারের সেই চৈতন্যের এখনো উদয় হয় নাই।

বৃহত্তর বঙ্গ - সংস্কৃতির প্রভাবে উপজাতি মধ্যবিত্ত

ত্রিপুরার অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে যে, বাংলা ভাষা ত্রিপুরার সরকারী ভাষার স্থান দখলের ফলে ত্রিপুরার উপজাতি মধ্যবিত্ত সমাজে এক নতুন ভাব ধারার রূপান্তর ঘটে। ত্রিপুরার রাজারা বাংলা ভাষাকে রাজ পরিবারের মাতৃভাষায় পরিণত করেন। এভাবে কালক্রমে বাংলা ভাষা শুধুমাত্র রাজ পরিবারের

মাতৃভাষাতেই পরিণত হয় নাই আগরতলা শহরবাসী উপজাতিদেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

সামন্তবাদী সমাজে রাজা ও জমিদাররাই সমাজের নেতা। তাই রাজ পরিবারকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে সাধারণতঃ সমাজের মধ্যবিত্তরা তারই দ্বারা প্রভাবিত হতে থাকেন। তাই রাজাদের অনুকরণে আগরতলা শহরের উপজাতিরাও রাজপুরুষদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে কগবরক ভাষায় কথা বলা বন্ধ করে দেন। বাংলা ভাষায় কথা বলা শুরু করেন। কেবল ঘরের বাইরেই নয়, ঘরের ভেতরেও আগরতলা শহরবাসী উপজাতিরা বাংলা ভাষায় কথাবার্তা বলতে আরম্ভ করেন। এভাবে বাংলা তাদেরও মাতৃভাষায় পরিণত হয়।

উৎপাদন ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন এবং সদ্য মধ্যবিত্তরূপে উদ্ভূত একমাত্র রাজানুগ্রহ ও রাজবাড়ী থেকে প্রাপ্ত মাসিক চৌথা, বা ধর্মাহ অর্থাৎ পারিবারিক ভাতা ভোগী আগরতলা শহরবাসী এই নয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী উপজাতিরা আধা বাংলা ও আধা কগবরক ভাষার জন্ম দেয়। এই মিশ্র ভাষায় কথা বলে তাঁরা কৃতার্থ বোধ করতে থাকেন। কগবরক ভাষা পরিত্যাগ করে বাংলা সাহিত্য চর্চা, বাঙ্গালীদের নৃত্যগীত, ধর্ম-কর্ম আচার- অনুষ্ঠান অনুকরণে গা ভাসিয়ে দেন। বাংলা ভাষার কীর্ত্তন, সংগীত, যন্ত্রসংগীত প্রভৃতি চর্চায় মেতে উঠেন। কগবরক বলা এবং কগবরক ভাষীদের যন্ত্র সংগীত যেমন, ছাইন্দা, চঙপ্রেঙ, ছুমুই প্রভৃতির চর্চা আগরতলার উপজাতীয়দের সমাজ দেহ থেকে সম্পূর্ণ বিদায় নেয়। এমন কি, এমন এক সময় গেছে যখন এই আগরতলার উপজাতিরা কগবরক ভাষীদের নিজস্ব গান- বাজনা চর্চা করাটাকে নিকৃষ্ট কাজ ও লজ্জাজনক মনে করতেন। ফলে, এই অংশীয় উপজাতিরা উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কচ্যুত হয়ে, আপন জাতিগোষ্ঠীর সমাজ দেহ থেকে কক্ষচ্যুত হয়ে নিজস্ব সব কিছু ভুলে গিয়ে একটা আত্মবিস্মৃত উপজাতি গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কখন থেকে এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল তার রেকর্ড আমার হাতে নাই কিন্তু দেখা যায় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকেই এই প্রক্রিয়ার একটা চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করে।

সমাজের উপর শিক্ষিত ব্যক্তিদের প্রভাব

সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা অনেক পরিমাণে সমাজ বিকাশের প্রক্রিয়াকে প্রভাবিত করে। তাদের চিন্তা- চেতনা, আচার-ব্যবহার, চাল-চলন প্রভৃতি সমাজের অনগ্রসর অংশের জনগণের উপর অনেক পরিমাণে প্রভাব বিস্তার করে। তাই, কালক্রমে দেখা গেল যে, ত্রিপুরার রাজাদের প্রচেষ্টায় আগরতলা শহরবাসী উপজাতি মধ্যবিত্তরা কেবলমাত্র

ককবরক ভাষা, সংস্কৃতি, সামাজিক রীতিনীতি, যন্ত্র সংগীত, নৃত্য-গীত প্রভৃতি ভুলতেই বাধ্য হন তা নয়, গ্রামে বসবাসকারী উপজাতিদের থেকে পৃথক জাতিসত্ত্বা নিয়ে তাঁরা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের থেকে শহরবাসী উপজাতিরা কুলীনও অভিজাত বংশোদ্ভব — এই চিন্তাধারা ও এই শহরবাসী মধ্যবিত্ত উপজাতিদের মনে জন্মলাভ করতে থাকে। সোজা কথায়, " আমরা ঠাকুর সম্প্রদায়, আর, ওরা পাহাড়িয়া" এই উন্নাসিকতা শহরবাসী উপজাতিদের মধ্যে জন্মলাভ করে।

এই মনোবৃত্তি সৃষ্টির মূলে অবশ্য রাজারাই মূলতঃ দায়ী। রাজকার্যের সুবিধার জন্য উপজাতি জনসমষ্টিকে বিভক্ত করে রাখার মতলবে ত্রিপুরার রাজারা আগরতলার উপজাতিদের 'ঠাকুর সম্প্রদায়' আখ্যা দেন। এর পেছনে মতলব ছিল— একদল তাঁবেদার সৃষ্টি করা। বাস্তবেও তাই হয়েছিল। রাজারা যা ভাবতেন রাজবাড়ীকে কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠে তার বাইরে যে ভাববার একটা জগৎ আছে একথা ভাববার মত স্বাধীন চিন্তা শক্তি ওদের প্রায় লুপ্ত হতে বসেছিল। রাজারা এক একজন বড় ঠাকুরকে (তাঁবেদারকে) পাহাড়ের এক এক দফা উপজাতিদের মিছিপ (সমাজপতি) নিযুক্ত করে দিতেন। এটা ছিল পাহাড়ের ভিন্ন ভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীকে এক একজন রাজার তাবেদারের মাধ্যমে শিকলে বেঁধে রাখার কার্যক্রম।

পাহাড়ের প্রথম শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতি যুবক অংশ এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মুখর হয়ে উঠেন ১৯৪৫সালের গোড়া থেকে। জনশিক্ষা সমিতি এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেয়। তদনীন্তন ত্রিপুরার শাসক মহারাজা বীরবিক্রম উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, জনশিক্ষা সমিতির আন্দোলন নিরক্ষরতা বিরোধীরূপে আত্মপ্রকাশ করলেও বাস্তবে উপজাতি সমাজে রাজাদের একচেটিয়া নেতৃত্বের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জরূপে দেখা দিয়েছে। তাই এই চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করতে এগিয়ে এলেন ত্রিপুর সঙ্ঘ গঠন করে। বীরবিক্রমের মৃত্যুর পর সেই ত্রিপুর সঙ্ঘ ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। আর রাজতন্ত্রের সেই শিকলের শেষ চিহ্নটুকু নিঃশেষ হয়ে যায় ১৯৪৮-১৯৫১ সালে মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের আগুনে। এ সংগ্রাম কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে সংগঠিত হয়েছিল।

রায় বাহাদুর উপাধি প্রাপ্ত বাঙ্গালীরা যেমন নিজেদের সমাজের অন্যান্য আর পাঁচজনের চেয়ে নিজেদের পৃথক জীব মনে করতেন, সেই একই মনন প্রক্রিয়া আগরতলার ঠাকুর সম্প্রদায়রূপে অভিহিত জনগণের মধ্যেও অজ্ঞাত সারে কাজ করে। তাই এই আত্মম্ভরিতা ও স্বজাতি নিন্দার মাত্রা একসময় এমন এক স্তরে পৌঁছেছিল যে, তাঁরা পাহাড়ে বসবাসকারী উপজাতীয় ব্যক্তিদেরকে রান্নাঘরে প্রবেশ করতে দিতে, তাদের সাথে সামাজিক ভোজগুলিতে এক পঙতিতে বসে আহার করতে অসামাজিক এবং

অমর্যাদাকর মনে করতেন। এভাবে ত্রিপুরার রাজারা ত্রিপুরী উপজাতিদের মধ্যে সামাজিক ছেদ এনে নিজ মাতৃ-ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য থেকে আগরতলার উপজাতিদের বিচ্ছিন্ন করে দেন। তাঁদের একটা আত্ম-বিস্মৃত উপজাতি গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেন। পাহাড়ের উপজাতিরা তাঁদের কাছে এক শ্রেণীর অপাঙতেয় জীবরূপে পরিগণিত হয়ে যান। এভাবে কৃত্রিম জাতিভেদ গ্রাম ও শহরের উপজাতিদের পরস্পর পরস্পরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে নেবার বীজ বপন করা হয়।

ঘরের বাইরে বিশেষ করে বাঙ্গালীদের সামনে নিজ মাতৃভাষায় (কগবরকে) কথা বলতে লজ্জাবোধ করার এই উপসর্গ কেবলমাত্র আগরতলার উপজাতিদের মধ্যেই সংক্রামিত হয় নাই তা গ্রামেও প্রবেশ করেছিল। পাহাড়ের যে গুটিকতক উপজাতীয় ব্যক্তি আগরতলায় সিপাই, বৃন্দিয়া প্রভৃতি চাকুরী করতেন তাঁরা বাড়ী গেলে আর কগবরক বলতে চান নাই। আধা বাংলা ও আধা কগবরক বলে আত্মশ্লাঘা বোধ করতেন। এভাবে বাংলা ভাষাকে ঘরের বাইরে অন্যভাষীদের সাথে আদান-প্রদানের ভাষারূপে না দেখে উহাকেই মাতৃ-ভাষার কুলে স্থান দেবার প্রবণতার শিকার হন।

বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতি ত্রিপুরার কগবরক ভাষী উপজাতিদের সমাজদেহে ব্যাপকারে অনুপ্রবেশের ফলে, প্রথম বাংলা ভাষায় শিক্ষাপ্রাপ্ত উপজাতীয় ব্যক্তিরা উপজাতিদের মাতৃভাষা ও সংস্কৃতি বিকশিত করে তোলার পথে না গিয়ে বাঙ্গালী সংস্কৃতির অনুকরণ, বাংলা ভাষায় কথা বলা ও লেখা, বাংলা গান, বাজনা, কীর্ত্তন, বাউল-সংগীত প্রভৃতি চর্চার দিকে ঝুঁকে পড়ার ফলে এবং এই সব কাজে ত্রিপুরার রাজাদের উৎসাহ ও পৃষ্ঠপোষকতা থাকার ফলে অবিকশিত ও দুর্বল উপজাতীয়দের মাতৃভাষা, নিজস্ব সংস্কৃতি, নৃত্যগীত, যন্ত্রসংগীত শুধুমাত্র যেখানে ছিল সেখানেই থেকে যায় নাই বরং ধীরে ধীরে অবলুপ্তি ঘটাতে থাকে। এই ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া লক্ষ্যণীয়। এই প্রক্রিয়ার সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে কগবরক বিকাশের দ্বার রুদ্ধ হওয়া ত্রিপুরায় বাঙ্গালী জনসংখ্যার অনুপ্রবেশ ও বৃদ্ধি এবং বঙ্গ- সংস্কৃতির প্রচন্ড প্রভাব বিস্তার। ত্রিপুরায় উপজাতি ও বাঙ্গালীর মিশ্র সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে ঐ সব প্রক্রিয়া সমূহ বহুলাংশে প্রভাবিত করে।

এখন যারা বলেন যে, মার্কসবাদী কমিউনিস্টরা বাঙ্গালী প্রীতি প্রদর্শন করে ত্রিপুরায় কাতারে কাতারে বাঙ্গালীদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন তাঁরা ইতিহাসের এই ঘটনা প্রবাহকে তলিয়ে দেখতে চান না বা আমল দিতে চান না। অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষ এবং উগ্র উপজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁদের এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে অক্ষম করে রেখেছে। বলা বাহুল্য, রাজতন্ত্রের আমলে কি শহরবাসী, কি পর্বতবাসী উপজাতীয় ব্যক্তি, যারাই বাংলায়

সামান্য লেখাপড়া শিখে নয়া মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী শ্রেণীরূপে অঙ্কুরিত হচ্ছিলেন তাঁরাই কগবরক ভাষায় কথোপকথন, উপজাতিদের সংস্কৃতিরও অনুশীলন প্রায় বন্ধ করে দেন। এমন কি যাঁরা অনুশীলনের চেষ্টা করেছেন, তাদের প্রতি অনেক ব্যাঙ্গোক্তি করতেও ছাড়েন নাই। এভাবে তাঁরা আপনভাষা এবং আপন জাতীয় সংস্কৃতির অনৌকর্যতজনিতা দুর্বলতার রোগে ভুগে বাঙ্গালীদের সামনে নিজেদের মধ্যে কগবরক বলা লজ্জা বোধ করতেন।

বলা বাহুল্য, বঙ্গ সংস্কৃতির উৎকর্যতায় আকৃষ্ট হয়ে রাজপরিবার এবং শহরবাসী নয়া বুদ্ধিজীবী উপজাতীয়দের কেন্দ্র করে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে, যেমন পোযাক পরিচ্ছদ, কণ্ঠ সংগীত, যন্ত্র সংগীত, তা উপজাতীয়দের ঐতিহ্যবাহী নিজস্ব সংস্কৃতি নয়। ইহা উত্তর - ভারত ও বঙ্গ সংস্কৃতির মিশ্ররূপ মাত্র। কণ্ঠসংগীতে শ্রীশচীন দেববর্মণ, যন্ত্র-সংগীতে অনিল কৃষ্ণ দেববর্মা, অঙ্কন শিল্পে শ্রীধীরেন্দ্র কৃষ্ণ দেববর্মা এবং ইদানীং আরও অনেক শহরবাসী উপজাতি শিল্পী ঐ শিল্প সাধনায় যথেষ্ট প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু এগুলিকে ত্রিপুরার উপজাতিদের নিজস্ব সংস্কৃতিরূপে উপস্থিত করা সত্যের অপলাপ হবে। কেননা, এগুলি উত্তর-ভারত ও বঙ্গ সংস্কৃতিরই অঙ্গ। এই কীর্তিমান উপজাতি শিল্পীদের বিন্দুমাত্র হেয় প্রতিপন্ন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের বক্তব্য হল ঐ শিল্পীদের প্রতিভার পরশ ফেলে কগবরকের কণ্ঠ-সংগীত, যন্ত্র-সংগীত, ছাইন্দা, চঙপ্রেঙ, ছুমুই প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সুর, তালও লয় আরও অধিকতর বিকশিত হতে পারত। আজ কগবরক ভাষী বংশধরদের এক অংশ কগবরকের কূলে ফিরে যেতে চাইলেও যেতে পারছেন না ইহা নিঃসন্দেহে বেদনাদায়ক। আজ যখন কমিউনিস্ট আন্দোলনের সংস্পর্শে শোযিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত উপজাতিদের আপন জাতিসত্ত্বা নিয়ে আত্ম- প্রকাশের গণ-সংগ্রাম উত্তাল হয়ে উঠেছে, কগবরকের বিকাশ সাধন এবং উপজাতিদের অবলুপ্ত প্রায় সংস্কৃতির পুনরুদ্ধারের আগ্রহ ও গণ উদ্যোগ জীবন্ত হয়ে উঠেছে, তখন আপন মাতৃভাষা বিস্মৃত শহরের শিক্ষিত উপজাতিরা কক্ষচ্যুত হয়ে থাকবেন এটা অকল্পনীয় এবং বেদনাদায়ক। ব্যাধের শরবিদ্ধ আহত পক্ষী যেমন মাটিতে পড়ে ছটফট করে, ডানা মেলে আপন নীড়ে ফিরে যেতে চায়, কিন্তু ফিরে যেতে পারে না বেদনাতুর দেহে করুণ চোখে তাকিয়ে থাকে আপন নীড়ের দিকে, কগবরক বিস্মৃত ঠাকুর লোকদেরও আজ সেই একই দশা। পূর্ব্বে বলা হয়েছে, আগরতলার উপজাতিদের এই আত্মবিস্মৃতির মূলে তারা নিজেরা যতটুকু দায়ী তার চেয়ে বেশী দায়ী রাজা এবং রাজতন্ত্র। তারা এই পরিস্থিতির শিকার মাত্র। উৎপাদন ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কচ্যুত বলে, পাহাড়ের কগবরক ভাষী বিরাট সংখ্যক উপজাতি সমাজ থেকে বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থানের ফলে, অপেক্ষাকৃত উন্নত বাংলা ভাষা এবং বাঙ্গালী সংস্কৃতির প্রচন্ড জোয়ারের মুখে তাঁরা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে

ফেলেন। বাঙ্গালী বনে যাবার বেগবতী স্রোতের পাকে পড়েন।

এখন রাজতন্ত্রের অবসান হয়েছে। কংগ্রেস শাসন দেশে প্রবর্তিত হয়েছে। কংগ্রেস শাসনের অর্থাৎ পুঁজিবাদী শাসনের অভিশাপ রূপে উগ্র-বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের আক্রমণে এবং সর্বোপরি পুঁজিবাদের শোষণে আজ শহরবাসী গরীব ও মধ্যবিত্ত উপজাতিরাও জর্জরিত। সামন্তযুগীয় মিথ্যা জাত্যাভিমান আজ বাস্তবের কষাঘাতে ধূলায় লুণ্ঠিত। তাঁরাও আজ পাহাড়ের উপজাতিদের থেকে নিজেদের আর পৃথক মনে করেন না। ইহা নিঃসন্দেহে সুলক্ষণ। অবিকশিত উপজাতীয়দের একটি বিকশিত জাতিরূপে গঠনের কর্মপ্রচেষ্টায় তাঁরাও সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন ইহা উপজাতি জনগণ আশা করেন।

হিন্দুয়ানীর প্রভাব

ত্রিপুরার রাজারা কেবলমাত্র শহরবাসী উপজাতিদেরই নহে পাহাড়ের কগবরক ভাষী উপজাতিদেরও গোঁড়া হিন্দুতে রূপান্তরের পথে নিয়ে যায় উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে। প্রথমতঃ রাজারা ত্রিপুরী (কগবরক ভাষী উপজাতিগোষ্ঠী) সমাজ সংস্কারের নামে তাদের বিবাহ, শ্রাদ্ধ ও ধর্মানুষ্ঠানের প্রথা পরিবর্তন সাধনে ব্রতী হন। চট্টগ্রাম থেকে আগত এক গোষ্ঠীর বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদের চিরস্থায়ী ম্যাদে সনদ দিয়ে কগবরক ভাষী উপজাতীয়দের (রিয়াঙবাদে) কুল-পুরোহিত বা যজমানী ব্রাহ্মণের আসনে বসান। বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় আচার প্রবর্ত্তনের নামে কগবরক ভাষী উপজাতীয়দের মানুষ মরার সাত দিনের পর শ্রাদ্ধ (হরছিনি) করার প্রথা বদল করে তেরদিনে শ্রাদ্ধ করার প্রথা চালু করেন। পূর্বে শ্রাদ্ধ, বিবাহ প্রভৃতি যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন পড়ত না। কিন্তু মহারাজারা 'ক্ষত্রিয় আচার' প্রবর্ত্তনের নামে ঐ সব অনুষ্ঠানে ত্রিপুরীদের ব্রাহ্মণের দ্বারা পূজা পার্বন করানো বাধ্যতামূলক করে দেন। ঐসব কাজে যারাই ব্রাহ্মণ নেবেন না তাদের সমাজ বঞ্চিত করার প্রথা চালু হয়। অপমৃত্যু নামক সংস্কার উপজাতিদের সমাজে অপরিচিত ছিল। কেহ জলে ডুবে মরলে বা ফাঁস খেয়ে মরলে সেই মৃত ব্যক্তির বংশধরদের ব্রাহ্মণের সাহায্যে প্রায়শ্চিত্ত করানো, আত্মশুদ্ধি বা দেহশুদ্ধি করানোর প্রথা উপজাতিদের সমাজে প্রচলন ছিল না। রাজারাই সেই আধ্যাত্মিক সংস্কার প্রথম কগবরক ভাষীদের সমাজে প্রবর্ত্তন করেন। আরো নগ্নভাবে বলতে গেলে, রাজারাই উপজাতি সমাজে হিন্দুধর্মের কুসংস্কারগুলি প্রবেশ করান।

শুধু যজমানি ব্রাহ্মণ আমদানী করেই রাজারা ক্ষান্ত থাকেন নাই, মেহারী থেকে গোস্বামী বংশীয় একদল ব্রাহ্মণদের আমদানী করেন ত্রিপুরীদেব দীক্ষা গুরুরূপে। এই গোস্বামীরা সনদ পেলেন কগবরকভাষীদের দীক্ষা দিতে। এরা উপজাতিদের কাছে কর্ণগুরু

নামে পরিচিত। এই কর্ণগুরুরা পুরুষানুক্রমে উপজাতি শিষ্যদের কাছ থেকে প্রতিবৎসর বার্ষিক গুরু দক্ষিণা (খাজনা) আদায় করে নেন এবং এখনো সেই প্রথা প্রায় অব্যাহত রয়েছে।

এই রাজারাই নবদ্বীপ থেকে বাঙ্গালী বৈষ্ণব ত্রিপুরায় আমদানী করেন এবং উপজাতি জনগণকে ভেক গ্রহণ করতে অর্থাৎ বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত হতে উৎসাহিত করেন। ফলে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকের সময়ে ত্রিপুরী এবং জমাতিয়া উপজাতিদের মধ্যে সাধু ও বৈষ্ণব হবার প্রবণতার জোয়ার আসে। প্রচুর সংখ্যক পরিবার 'সাধু' ও বৈষ্ণব হন। এভাবে তারা হিন্দু ধর্মের আধ্যাত্মিক সংস্কারের অক্টোপাশে আবদ্ধ হন।

ত্রিপুরার রাজাদের হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামী এবং কুসংস্কার এমন স্তরে পৌঁছায় যে, বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজা বীরবিক্রম কগবরক ভাষী উপজাতি সমাজে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় আচার প্রতিষ্ঠার নামে প্যারা মিলিটারী সংগঠন বৃন্দিয়াদের গ্রামে গ্রামে পাঠিয়ে ব্যাপকভাবে শূকর ও মোরগ ধ্বংস করেছিলেন। বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত রাজার অনুগত কুসুম দেববর্মা (কুসুম ঠাকুর নামে পরিচিত) এই শূকর, মোরগ ধ্বংস অভিযানের নেতৃত্বে দেন। তখন বৃন্দিয়াদের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল পাড়ায় পাড়ায় অভিযান চালিয়ে গৃহস্থদের শূকর ও মোরগ বন্ধ করা। এই ঠাকুর সাহেবের কাজ ছিল শূকর ও মোবগ পালন ও ভক্ষণ কত ভ্রষ্টাচার ও মহাপাপ গোঁড়া হিন্দু ধর্মের এই হিতোপদেশ তথাকথিত অনাচারী উপজাতিদের নিকট বর্ষণ করা। তাঁদের এই গোঁড়া হিন্দুয়ানীর বেলায় সারা ত্রিপুরায় হাজার হাজার শূকর, মোরগ বন্ধ হয় এবং গৃহস্থরা দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হন।

রাজার এই কার্যকলাপের পেছনে কতকগুলি বাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত ছিল। এক— সনদ প্রাপ্ত ব্রাহ্মণদেব মাধ্যমে উপজাতি জনগণকে ধীবে ধীরে হিন্দুধর্মের অনুশাসনে আনা অর্থাৎ ব্রাহ্মণদের অনুশাসনে আনা। সোজা কথায় আদর্শগতভাবে (Ideologi-cally) সামন্ততন্ত্রের ভিত্তি শক্ত করা। দুই — উপজাতীয়দের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবোধ, তাদেব সংগ্রামী চরিত্র প্রভৃতি নষ্ট করে দিয়ে ধীরে ধীরে তাদের বাঙ্গালীকরণের দিকে অগ্রসর কবে নেওয়া। আপন জাতিসত্তা নিয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ জাতিরূপে বিকশিত হয়ে উঠার জাতীয় চেতনার উন্মেষের এবং সংগ্রামী মনোভাবের জন্মের আগেই সেই জাতিসত্তা বিকাশের যেটুকু অবিকশিত উপাদান রয়েছে তা একেবারে বিনষ্ট করে দেওয়া যাতে ভবিষ্যতে আলোক প্রাপ্ত উপজাতিরা আর রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সহজে মাথা তুলতে না পারে।

রাজারাই ছিলেন ত্রিপুরার উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির বিশেষতঃ কগবরকভাষী

উপজাতি সমাজের অবিসংবাদী সমাজপতি। তাদের ধ্যান ও ধারণা এবং কার্যক্রমেই কগবরকভাষী সমাজের সামাজিক উত্থান পতন বহুলাংশে নির্ভর করত। কাজেই উপরোক্ত ধ্যান ও ধারণায় পরিচালিত রাজাদের নেতৃত্বাধীনে কগবরক ভাষার লিখিত রূপে উত্তরণের দ্বার উন্মোচিত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। বাস্তবেও তাই ঘটল। ফলে ত্রিপুরার কগবরকভাষীদের মাতৃভাষা, যা কিছু নিজস্ব সংস্কৃতি, কণ্ঠ সংগীত, সামাজিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে সেগুলির বিকাশসাধন করে কগবরকভাষীদের একটা স্বতন্ত্র জাতিসত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশের পথে পর্বত প্রমাণ দুর্লঙ্ঘ্য প্রতিবন্ধক রচিত হয়ে রইল। মাঝপথে ত্রিপুরার উপজাতীয়দের জাতিগঠনের প্রক্রিয়া দারুণভাবে ব্যাহত হল। উপজাতীয়রা আপন জাতিসত্তা সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে একেবারে বাঙ্গালী বনে যান নাই বটে কিন্তু নিজস্ব অনেক কিছুই হারালেন। তাঁরা পূর্ণাঙ্গ জাতিরূপে বিকশিত হতে পারবেন কিনা, জাতি গঠনের প্রাথমিক উপাদানগুলি কগবরকভাষী গোষ্ঠীর জাতীয় জীবনে কতটুকু সজীব রয়েছে, সেই সব জটিলতাপূর্ণ ও বিভ্রান্তিমূলক প্রশ্নের সম্মুখীন হয়ে কগবরক ভাষীরা বিভ্রান্ত হলেন এবং নিজেদের একটি বিকশিত ও পরিপূর্ণ জাতিরূপে গড়ে তোলার প্রচেষ্টা গ্রহণে বিরত রইলেন। এভাবে বাঙ্গালী সংস্কৃতির উত্তম দিকগুলি থেকে অর্থাৎ প্রগতিশীল উপাদানগুলি গ্রহণ করে উপজাতীয়দের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সমূহের বিকাশ সাধনে প্রয়োগ করে এবং উপজাতীয়দের বিকাশশীল নিজস্ব উপাদানগুলির বিকাশ সাধন করে উপজাতীয়দের সুপ্ত জাতিসত্তাকে জীবন্ত করে তোলার কাজ উপেক্ষিত হয়ে রইল। তখনকার উপজাতি সমাজের 'হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা' রাজাদের নেকনজরই কগবরক ভাষা এবং ত্রিপুরার উপজাতিদের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় দাঁড় করিয়েছে। রাজতন্ত্র এখনো ত্রিপুরার রাজসিংহাসনে বহাল তবিয়তে থাকলে, বর্তমানে কগবরকে লিখিতরূপে উত্তরণের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হয়েছে, এবং তাকে রূপ দেবার যে গণউদ্যোগ চলছে তা আদৌ সম্ভব হতকিনা, রাজরোষে পড়ে তা বিপরীতমুখি ধাবিত হতে বাধ্য হত কিনা, কে জানে?

যদি ধরেও নেওয়া হয় যে, মহারাজাদের বাংলা ভাষাকে সরকারী ভাষার আসনে অলঙ্কৃত করার পেছনে এবং বঙ্গ সংস্কৃতির সংস্পর্শে ত্রিপুরার উপজাতিদের টেনে আনার পেছনে একটা সৎ উদ্দেশ্য ছিল, অপেক্ষাকৃত উন্নত, বিকশিত ও বৃহত্তর বঙ্গ সংস্কৃতির সংস্পর্শে ত্রিপুরার উপজাতিদের অগ্রসর করে নেওয়ার একটা গোপন বাসনা নিহিত ছিল, তা হলেও ইতিহাস প্রমাণ করে দিল যে রাজাদের সে স্বপ্ন ফলবতী হয় নাই। তা ত্রিপুরার উপজাতিদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করে নাই বরং জাতিগঠনের উপাদানগুলিকে পঙ্গু করে রাখতে অনেক পরিমাণে সাহায্য করেছে।

এখানে প্রশ্ন এই নয় যে, বাংলা ভাষা এবং বঙ্গ-সংস্কৃতির ত্রিপুরার উপজাতিদের কি কিছুই দেয় নাই? বৃহত্তম বঙ্গ সংস্কৃতির সংস্পর্শে এসে উপজাতিরা কি মোটেই লাভবান হয় নাই? এখানে প্রশ্ন হল — বাংলা ভাষা ও বঙ্গ -সংস্কৃতিতে ত্রিপুরার উপজাতিদের জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করার যে **উপাদানগুলি রয়েছে সেগুলি প্রস্ফুটিত করে তুলতে সাহায্য করছে না। আপন বৃহত্তর মহিমায় বা গরিমায় সেই ক্রমবিকাশশীল** উপাদানগুলির বিকাশের পথে অন্তরায়রূপে কাজ করেছে। বাস্তব ঘটনাবলীই সাক্ষ্য দিচ্ছে, বঙ্গ সংস্কৃতির সংস্পর্শে আগরতলা শহরবাসী উপজাতিরা মাতৃভাষা সহ নিজস্ব গোষ্ঠীর সংস্কৃতি ভুলে গেলেন। পাহাড়ের উপজাতিদের ছাইন্দা, চঙপ্রেঙ, ছুমুই ও নৃত্যগীত আজ বিলুপ্তির পথে। আপন জাতিসত্তা নিয়ে উপজাতিদের আত্মপ্রকাশ করার পথে আজ একটির পর একটি জটিল সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে।

যারা বলেন যে, বাংলা ভাষা ও বঙ্গ সংস্কৃতির সংস্পর্শে না এলে ত্রিপুরার উপজাতিরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকতেন, বঙ্গ সংস্কৃতির ছোঁয়াচ তাদের আলোকের পথে নামিয়েছে, কাজেই উপজাতিরা বাঙ্গালীর কাছে কৃতজ্ঞ থাকা উচিত এবং বাঙ্গালীদের নেতৃত্ব বা কর্তৃত্ব মেনে নেওয়া উচিত — আমরা তাদের সাথে একমত হতে পারি না। প্রশ্ন এখানে কৃতজ্ঞতা বা অকৃতজ্ঞতা নয়। প্রশ্ন হল — উপজাতিদের জাতীয় জীবন গঠনে তা কতটুকু সাহায্য করেছে। মেঘালয়, মিজোরামের উপজাতিদের শিক্ষিতের হার একমাত্র কেরালা রাজ্য বাদে ভারতের অন্যান্য সকল রাজ্যের চেয়ে বেশী। শতকরা শিক্ষিতের হার পশ্চিমবঙ্গের চেয়ে অনেক বেশী। ত্রিপুরার উপজাতিদের সাথে তাদের শিক্ষার হারের তুলনা করা চলে না। তাদের এই অগ্রগতি বঙ্গ-সংস্কৃতির এবং বাংলা ভাষার সংস্পর্শে হয় নাই। শুধু ত্রিপুরার উপজাতিদের ক্ষেত্রে কেন, যে কোন জাতি বা উপজাতি অন্য যে কোন উন্নত জাতি বা গোষ্ঠীর সংস্পর্শে এলে কিছু না কিছু লাভবান হবেই। এটা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র কথা। ইংরেজী শিক্ষা কি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের নূতন নূতন জ্ঞান আহরণের দ্বার খুলে দেয় নাই? অবশ্যই খুলে দিয়েছে। কিন্তু সেই কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য কি ভারতবাসীরা তাদের মাতৃভাষার শিক্ষার দাবী ছেড়ে দেবে? ইংরেজ জাতি ভারতের শাসন মসনদে বসে ইংরেজী শিক্ষার মাধ্যমে নূতন নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞানের সন্ধান দিয়েছেন বলেই কি ভারতবাসীরা ইংরেজদের জন্য আপন জমি জমা ও ভিটে মাটি ছেড়ে দেবেন? ইংরেজী শিক্ষার পরশে বাঙ্গালীরা আরো বেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হতে পেরেছেন বলেই কি বাঙ্গালীরা নিজস্ব মাতৃভাষার শিক্ষার অধিকার, নিজস্ব ঐতিহ্য এবং ভিটে মাটি সব কিছু বঙ্গোপসাগরে বিসর্জন দিয়ে ইংরেজ বনে যাবেন? না, তা হতে পারে না। কোন একটা উন্নত জাতি বা গোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে

পরিচিত হবার ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে সেই দুর্বল বা অবিকশিত জাতি বা গোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বা, ভাষা ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিত হবার ফলাফল যদি এই দাঁড়ায় যে সেই দুর্বল বা অবিকশিত জাতি বা গোষ্ঠীর জাতিসত্ত্বা, ভাষা ও সংস্কৃতি ক্রমশঃ লোপ পেতে থাকে তাহলে সেই সংস্পর্শকে সহায়ক শক্তি বলা চলে না। বরং বৃহত্তর সংস্কৃতি দুর্বল ও ক্ষুদ্রকে গ্রাস করে বিলুপ্ত করে দিচ্ছে বলা চলে। উহা কোন বিকশিত জাতি বা অর্দ্ধ বিকশিত জাতি বা উপজাতির কাম্য হতে পারে না। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রগতিশীল দিক গ্রহণ করে তা নিজেদের সমাজ গঠনে প্রয়োগ করা, বাংলা ভাষার শব্দাবলী চয়ণ করে সেগুলি আত্তীকরণ করে কগবরক ভাষার শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ করা, বাংলা ভাষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করা, বঙ্গ সংস্কৃতির উৎকর্ষের দিকগুলি গ্রহণ করে উপজাতি সমাজকে সমৃদ্ধ করা, আর বঙ্গ সংস্কৃতির দ্বারা গ্রাসাচ্ছাদিত হয়ে উপজাতীয়দের আপন জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও জাতি সত্ত্বা বিলুপ্তির পথে ধাবিত হওয়া এক কথা নয়। যাদের দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর অন্ধকার বিবরে আবদ্ধ কেবল তারাই আপন জাতি বা গোষ্ঠীর ব্যাথা বেদনা আশা -আকাঙ্খার সন্ধান ছাড়া অন্য কারো ব্যথা- বেদনা ও আশা-আকাঙ্খার সন্ধান পান না বা পেলেও স্বীকার করতে কষ্ট বোধ করেন। অন্য জাতি ও গোষ্ঠীর প্রয়োজন মিটানোর দাবী উঠলে বা প্রশ্ন দেখা দিলে আতঙ্কে শিহরিয়ে উঠেন। ত্রিপুরা উগ্র-বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস শাসক গোষ্ঠী এই রোগে ভুগছেন। তাদের এই দৃষ্টি-ভঙ্গীই ত্রিপুরার উপজাতিদের অগ্রগতির পথে বড় অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষ্য করবার মত যে, ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদেরও এক অংশ, বিশেষতঃ নব্য শিক্ষিত ছাত্র ও যুবকদের এক অংশ ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতিদের অগ্রগতির কর্ম-প্রচেষ্টার গতিপথে যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে, কংগ্রেস বাধা সৃষ্টি করছে, না কমিউনিস্টরা বাধা সৃষ্টি করছে, তা বিচার বিশ্লেষণে অক্ষম হয়ে উপজাতিদের অগ্রগতির পথে এই দুটোকেই অন্তরায় হিসাবে দেখছেন। তাঁদের আশা-আকাঙ্খার রূপ দিচ্ছেন না বলে কমিউনিষ্ট নেতাদের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করছেন। কংগ্রেস সরকার যে এর জন্য দায়ী এই বাস্তব সত্য উপলব্ধি করতে পারছেন না।

আজ শিক্ষিত উপজাতি যুবক ও ছাত্রদের এক অংশ মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে জাতি শত্রু ভেবে উপজাতি জনগণকে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাব থেকে দূরে টেনে নিতে সক্রিয় রয়েছে। ত্রিপুরার ভেতরের এবং বাইরের কমিউনিস্ট বিরোধী ও প্রতিক্রিয়া শক্তির সাহায্য ও সহানুভূতি ও তাঁরা পাচ্ছেন। যে সকল উপজাতি ব্যক্তি বরাবর কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করে এসেছেন, যে সকল উপজাতি ব্যক্তি ব্যক্তিস্বার্থ ও শ্রেণী স্বার্থের খাতিরে কমিউনিষ্ট পার্টি ত্যাগ করে কংগ্রেসে যোগদান করেছেন এবং

কংগ্রেসে গিয়ে নানা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে গরীব উপজাতি জনতাকে লুণ্ঠন করেছেন, যে দুর্নীতি পরায়ণ উপজাতি কর্মচারী সুবিধাজনক সরকারী পদে থেকে জুমিয়া পুনর্বাসন, কৃষিঋণ, খয়রাতি সাহায্য বিতরণ এবং টেষ্ট রিলিফের কাজ -কর্ম করানোর মারফৎ উপজাতি জনগণকে প্রতারিত করে দুই পয়সা কামাই করেছেন এরা আজ উপজাতি যুব সমিরি উগ্রসমর্থক এবং কেউ কেউ সক্রিয় কর্মী। বাইরে উপজাতিদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন। আর সুযোগ পেলে উপজাতি গরীবদের যথা সর্বস্ব লুণ্ঠন করতে ছাড়েন না, এমন কিছু উপজাতি সরকারী কর্মচারীও আজ উপজাতি যুব সমিতির উগ্র ও সক্রিয় সমর্থক। এরাই আজ ত্রিপুরার বুক থেকে কমিউনিস্ট দূর করার সংকল্প নিয়ে কমিউনিস্ট বিরোধী হুংকার ছেড়ে চলেছেন। যে কমিউনিস্ট পার্টি জন্ম লগ্ন থেকে ত্রিপুরার উপজাতিদের রক্ষা কবচমূলক বিভিন্ন দাবী দাওয়া নিয়ে লড়াই করে এসেছেন, কংগ্রেস সরকারের সকল প্রকার দমনপীড়নের বিরুদ্ধে আপোষহীন ও নির্ভীক সংগ্রাম করে ত্রিপুরার উপজাতি সমস্যা সমাধানের দাবীতে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন এবং উপজাতীয়দের জাতি গঠনের রূপ দেবার সংগ্রামে অটল রয়েছেন সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে ঐ বিভ্রান্ত ছাত্র ও যুবক অংশ উপজাতিদের স্বার্থ বিরোধী বলে চিত্রিত করতে প্রয়াস পাচ্ছেন। বাস্তবের রূঢ় আঘাতে তাঁদেরও একদিন চৈতন্যোদয় হবে। তাঁরাও কমিউনিস্ট আন্দোলনে সামিল হবেন এ দৃঢ় প্রত্যয় আমাদের আছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে সামন্ত-যুগীয় আধ্যাত্মিক সংস্কারে উপজাতীয় জনগণকে আবদ্ধ করার চেষ্টা রাজারা করেছিলেন। ইদানিংকালে সে প্রবণতা অন্য দিকে মোড় ঘুরানোর প্রচেষ্টা শুরু হয়েছে। উপজাতি যুবকদের কিছু অংশ খৃষ্টীয় আধ্যাত্মিক সংস্কার উপজাতি সমাজ দেহে অনুপ্রবেশ করানোর প্রবণতার দিকে ঝুঁকছে। ইহা আর একটি ধর্মীয় সংস্কার যা উপজাতি জনগণকে দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে, এক কথায় উপজাতিদের রাজনৈতিক, সামাজিক ও আর্থিক মুক্তির সংগ্রামে অগ্রসর করে দিতে পারে না। ইহা ধর্মীয় অনুশাসনের পুরোহিত বা কর্তৃত্ব (Authority) বদলের প্রবণতা মাত্র। এদের এই পদক্ষেপ আধ্যাত্মিক সংস্কারের অন্ধকার বিবর থেকে মুক্ত হয়ে বস্তুজগতের গতি-প্রকৃতি বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নির্যাতিত, নিপীড়িত ও শোষিত উপজাতি জনগণের প্রকৃত মুক্তি আনার সংগ্রামের প্রেরণা যোগাবে না, যোগাতে পারে না। বরং হিন্দু এবং খৃষ্টান এই দুই ধর্মাবলম্বী উপজাতি জনগণকে ধর্মীয় কলহে ঠেলে দেওয়া। কোন প্রগতিশীল দল বা শক্তি জনগণকে ধর্মীয় সংস্কার বা ধর্মীয় অনুশাসনে ঠেলে দেবার পথ বেছে নিতে পারেন না। একাজ রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীলদের কাজ। প্রতিক্রিয়া পন্থীদের এই নয়া চাল লক্ষ্য করতে হবে। এরা ধর্মীয় ভিত্তিতে লোকদের জড় করে,

শ্রেণী ভিত্তিতে জড় করে না বরং শ্রেণী ঐক্য গড়ার পথ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

জাগরণের উত্তাল তরঙ্গ

কগবরক ভাষী ও অন্যান্য ভাষাভাষী ত্রিপুরার উপজাতি গোষ্ঠিদের মধ্যে আপন জাতিসত্তা নিয়ে একটা পূর্ণাঙ্গ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশের যে সুপ্ত কামণা এতদিন চাপা ছিল জনশিক্ষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৫ সাল থেকে তা জীবন্ত হয়ে উঠে। জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে দেড় বৎসরের মধ্যে ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে ৪৮৮টি বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল গড়ে উঠে। উপজাতি বালক-বালিকাদের প্রাথমিক শিক্ষা শুরু হয়। নিরক্ষর উপজাতিদের জাতীয় জীবনে এক নূতন জাগরণের ঢেউ উঠে।

ত্রিপুরার উপজাতিরা যে 'নিজভূমে পরবাসী' হতে চলেছেন সেই বেদনার সুর সেদিন ধ্বনিত হয়ে উঠে জনশিক্ষা সমিতির প্রচার পত্রে। আর ঘোষিত হয় সেই দুঃসহনীয় পঙ্ক থেকে উপজাতি সমাজকে উদ্ধার করার দৃঢ় সংকল্প। পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম সংগঠিত হয় ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেই প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় কগবরক ভাষায় অসংখ্য গান রচিত ও গীত হয়। কগবরক ভাষীদের জাতীয় জীবনে জীবন্ত হয়ে উঠে একটি পৃথক জাতিসত্তা নিয়ে পূর্ণাঙ্গ জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করার উদগ্র কামনা। তাঁরা ছিড়ে ফেলতে চান শত শতাব্দীর অভিশপ্ত জীবনের শেষ চিহ্নটুকু। কিন্তু পুঁজিবাদী কংগ্রেস সরকার উপজাতীদের সেই আশা আকাঙ্খাকে বুলেটের আঘাতে ঠান্ডা করে দিতে এগিয়ে আসে। শাসকের রাজদন্ড নেমে আসে উপজাতি জনগণের মাথার উপর। তীব্র দমন পীড়ন চালিয়ে কংগ্রেস সরকার উপজাতি জনগণের সেই জাতীয় আশা ও আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত হতে দেয় নাই। তাই এখনো সেই লড়াই চলছে। আরো চলবে।

সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম বিরতির পর গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের সাথে সাথে উপজাতীয়দের পুরানো সংস্কৃতি ও গড়িয়া নৃত্য প্রভৃতি পুনরুদ্ধার করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কগবরক ভাষায় নাটক ও যাত্রাগান প্রভৃতি রচনা করে তা গ্রামে গ্রামে অভিনীত হয়। স্থানে স্থানে অনেক সংস্কৃতি- স্কোয়াড গড়ে উঠে। কগবরক ভাষাকে লেখ্যস্তরে উন্নীত করা এবং কগবরক ভাষার চর্চার প্রাথমিক সোপান হিসেবে মুক্তি পরিষদের প্রচেষ্টায় কমরেড সুধন্বা দেববর্মার সম্পাদনায় ' কতাল কথমা' বছর খানেক প্রকাশিত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় , আর্থিক অস্বচ্ছলতা এবং সর্বোপরি সরকারী তীব্র দমন নীতির ফলে কতাল কথমা প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৬২-১৯৬৯ সাল পর্যন্ত বেশীর ভাগ সময়ে মার্কসবাদী

কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিনা বিচারে কংগ্রেস সরকার জেলে আটক রাখেন। নেতৃস্থানীয় কর্মীদের বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে নিরাপত্তা আইনে বন্দী রেখে উপজাতিদের উপর তীব্র দমন নীতি চালান। ফলে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সেই কর্মপ্রচেষ্টার মাঝখানে ছেদ পড়ে। তা ছাড়াও একটি অলিখিত ভাষাকে লিখিত রূপে উত্তরণের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করতে গেলে যতটুকু সময় দেওয়া দরকার, ভাষা বিজ্ঞানীদের সহায়তায় ভাষা বিজ্ঞানের সূত্রগুলির সাহায্যে কগবরক ভাষার ধ্বনিগোত্র সমূহ চুলচেরা বিচার করে একটা বৈজ্ঞানিক সত্যের কাছাকাছি উপনীত হয়ে ভাষার ধ্বনিগোত্র সমূহ নির্ধারন করে যেভাবে কগবরক ভাষার লিখিতরূপ দেওয়া দরকার, সেই প্রাথমিক কাজগুলি সম্পাদনে আমরা ততটুকু সময় দিতে পারি নাই। লিপির বিচারে ও সময় লেগেছে। আমাদের এই দুর্বলতা আমরা অস্বীকার করতে চাই না। ভাষা বিজ্ঞানী ডক্টর সুহাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কগবরকের লিখিতরূপে উত্তরণ সম্পর্কে কতগুলি বক্তব্য রেখেছেন এবং বাংলা লিপিতে কগবরক লিপিবদ্ধ করা যায় এই মন্তব্য করছেন। তাঁর সেই বক্তব্য কতটুকু বৈজ্ঞানিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, বাংলা লিপিতে কগবরক লেখা যায় কিনা তা যাচাই করে দেখার প্রয়োজন আছে। কোনরূপ সঙ্কীর্ণ রাজনৈতিক বা দলীয় দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এই বিচার বিশ্লেষণ করা ঠিক হবে না।

বাংলা লিপি কগবরকে লিখিতরূপে উত্তরণের লিপিরূপে গ্রহণ করা প্রয়োজন

কগবরকের নিজস্ব লিপি নাই। প্রচলিত কোন লিপি কগবরকের লিখিতরূপ দেবার লিপিরূপে গ্রহণ করা যায় কিনা এ নিয়ে কগবরক শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রচন্ড মতভেদ আছে। ফলে লিপি নির্বাচন বিলম্বিত হচ্ছে। এবং কগবরকের লিখিতরূপ দেবার কাজও বিলম্বিত হচ্ছে।

এতদিন শ্রীঅলিন্দ ত্রিপুরা সহ কিছু কগবরক প্রেমিক এই অভিমত পোষণ করতেন যে, প্রচলিত কোন লিপির সাহায্যে কগবরকের লিখিতরূপ না দিয়ে কগবরকেরই নিজস্ব স্বতন্ত্রলিপি প্রণয়ন ছাড়া প্রচলিত কৌন লিপিতেই কগবরকের ধ্বনিগুলি লিপি আবিষ্কৃত হওয়া উচিত। অর্থাৎ নূতন লিপি প্রণয়ন করা উচিত। কগবরকের ধ্বনিগুলি স্বতন্ত্র লিপি প্রণয়ন ছাড়া প্রচলিত কোন লিপিতেই কগবরকের ধ্বনিগুলি হুবহু লিপিবদ্ধ করা যাবে না। শ্রী ত্রিপুরা তাঁর চিন্তা মাফিক কগবরক লিপির ছক কাটেন। প্রথম দিকে উপজাতি যুবকদের শিক্ষিত অংশ সেই নবাষ্কৃত লিপিতে কগবরক লেখার মতমতামতের দিকে

ঝুঁকেন। খোয়াই বিভাগের রামচন্দ্রঘাটের সরকারী প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক শ্রীনিরঞ্জন দেববর্মাও কগবরক লিপি নাম দিয়ে কতকগুলি লিপির ছক কাটেন। সেগুলি পরখ করে দেখার জন্য আমাকে কয়েকবার অনুরোধ করেন। আমি সেই লিপিগুলি গ্রহণযোগ্য ও চালুযোগ্য মনে করি নাই। যিনি সেগুলির ছক কেটেছেন তিনি ছাড়া এই লিপিগুলি অন্য কারো কাছে পরিচিত নয়। সেগুলি সহজে লেখা যায়কিনা সেগুলির সাহায্যে কগবরক ভাষার ধ্বনিগুলি লিপিবদ্ধ করা যায় কিনা, সেগুলি পরখ করে দেখা সময় সাপেক্ষ। তাছাড়াও আরও একটি বড় কারণ হল সেগুলি বাজারে পাওয়া যাবে না। তৈরী করে নিতে হবে নতুন ভাবে। নতুন মুদ্রণ লিপি তৈরী করা ব্যয়সাপেক্ষ এবং সময় সাপেক্ষ তাই সেগুলি গ্রহণযোগ্য মনে করি নাই। সেই একই কারণে আমরা শ্রীঅলিন্দ ত্রিপুরার ছক কাটা লিপি গ্রহণ করার বিপক্ষে।

লিপিগুলি প্রস্তুত করার পেছনে একটি বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা কাজ করবে। কগবরক লিপির বাজার একমাত্র ত্রিপুরা ছাড়া অন্য কোথাও গড়ে উঠবে না। এত অল্প সংখ্যক কগবরক ভাষীর জন্য মুদ্রণ লিপি তৈরীর কাজে কেউ শিল্প গড়তে সহজে এগিয়ে আসবেন এমন আশা করা যায় না। একমাত্র কগবরক ভাষীদের পৃষ্ঠপোষকতার উপরেই এই শিল্প গড়ে তুলতে হবে। তা হবে অত্যন্ত ব্যয় বহুল। তাছাড়া আমরা দেখছি যে, বাংলা, রোমান, দেবনাগরী প্রভৃতি লিপি গোষ্ঠীগুলির যে কোনটিবই সাহায্যে কগবরক ভাষার লিখিরূপ দেওয়া যায় এবং সেগুলি বাজারে সহজলভ্য, তাই আমরা কগবরক-এর জন্য নূতন লিপি আবিষ্কারের উদ্যোগ গ্রহণ এবং সে কাজে অযথা শক্তিক্ষয় করতে চাইনা।

এখন কগবরকের নূতনলিপি প্রণয়নের বা আবিষ্কারের প্রবণতা পরিত্যক্ত হয়েছে। কেউ আর এ নিয়ে উচ্চবাচ্য করছেন না। তবে দেখা যায় শ্রীঅলিন্দ ত্রিপুরা এখনো বক্তব্য রাখছেন যে, কগবরকের নিজস্ব লিপি আছে। তবে কতকগুলি বাস্তব অসুবিধার জন্য সেই লিপিগুলি প্রয়োগ বা ব্যবহার করা যাবে না এমন বক্তব্য তিনি রেখেছেন। কগবরকের লিপি আছে কি নাই সেই গবেষণামূলক বিষয়বস্তু নিয়ে বিতর্কে প্রবেশ করতে চাই না। তবে এটা বলতে বাধ্য হবো যে, সুদূর অতীতে কগবরকের কোন লিখিত রূপ ছিল কিনা, যদি থাকে তা কোন লিপিতে লেখা, সেই লিপি ব্রাহ্মী লিপিগোষ্ঠীর কিনা এসব এখন পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। কাজেই অনাবিষ্কৃত বিষয় বস্তুর উপর কোন বিতর্কে যাওয়া অনাবশ্যক লেখনী যুদ্ধ ছাড়া আর কি হতে পারে?

রোমান ও বাংলা লিপি

বর্তমানে অলিন্দ ত্রিপুরাসহ উপজাতি যুব সমিতির নেতারা রোমান লিপিতে কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের সপক্ষে। এ নিয়ে তাঁরা জোর প্রচার চালাচ্ছেন। রোমান লিপির প্রবক্তাদের যুক্তি হল — বাংলা লিপি অক্ষরাত্মক (Syllabic) বর্ণমালা। কাজেই ধ্বনিমূলক কগবরক ভাষা অক্ষরাত্মক বাংলা লিপিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না। কগবরকের সঠিক উচ্চারণ বাংলা লিপির মাধ্যমে আসবে না। কথাটা সম্পূর্ণ গ্রহণযোগ্য নয়। প্রথমতঃ বাংলা লিপি কেবল অক্ষরাত্মক (Syllabic) নয়। বাংলা লিপি কতকটা ধ্বনিমূলক (Alphabetic) আর কতকটা অক্ষরমূলক (Syllabic) দ্বিতীয়তঃ কগবরক ভাষার ধ্বনিগোত্রেও অক্ষরমূলক (Syllabic) বর্ণমালার প্রয়োজন পড়ে। যেমন -চাঅ, খাঅ, রমঅ। এই বক্তব্য একদেশদর্শী। কগবরকের কিছু ধ্বনি যেমন হুবহু বাংলা লিপিতে লিপিবদ্ধ করা যাবে না, তেমনি রোমান লিপিতেও লিপিবদ্ধ করা যাবে না। সব লিপিরই নিজস্ব ধ্বনি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বাংলা বা রোমান লিপি যেটিকেই কগবরক লেখার জন্য গ্রহণ করা হউক না কেন সেই অসুবিধা কিছুটা থেকে যাবেই। তার সমাধান করতে হবে বিশেষ ক্ষেত্রে সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে উচ্চারণের অভ্যাসের মাধ্যমে। রোমান লিপিতে লিপিবদ্ধ বহু ইংরেজী শব্দের ক্ষেত্রেও তা পাওয়া যায়। যেমন Psychology। P উচ্চারিত হয় না। রোমান স্বরলিপির (vowel) <U> কখনো বাংলার <উ> উচ্চারিত হয়। আবার কখনো বাংলার <আ> উচ্চারিত হয়। যেমন— put (পুট), but (বাট) প্রভৃতি। এই উচ্চারণ ব্যবহারিক পদ্ধতিতে অর্থাৎ প্রথমে কারও কাছে শুনে লিখতে হয়। রোমান লিপিতে কগবরক লেখার ক্ষেত্রে রোমান লিপির প্রবক্তারা সুপারিশ করেছেন — কগবরক এর রোমান লিপির বানান <kokborok>। কিন্তু রোমান লিপির স্বরধ্বনি অনুসরণ করলে তার স্বতঃস্ফূর্ত উচ্চারণ আসবে কোক বোরোক। তা হলে এটা নির্ণয় করে নিতে হবে না <O><ও> হয়ে <অ> হবে। আর Thanka <থাঙকা> র উচ্চারণ <থঙক> হতে পারে। এখানে বলে দিতে হবে 'A' সব সময় <আ> উচ্চারিত হবে। ননঅ--- নন' রোমানলিপিতে হবে NoNo। স্বভাবতই প্রথম শিক্ষার্থীর মুখে রোমান লিপির স্বরধ্বনি অনুসরণে উচ্চারিত হবে <নো নো>। তাকে বলে দিতে হবে — এখানে 'o'<ও> না হয়ে <অ> হবে, আবার যেহেতু বাংলা লিপির ধ্বনিগোত্র গোষ্ঠীর সাথে কগবরক ভাষীরা অনেক বেশী পরিচিত কাজেই রোমানলিপি কোথায় কি উচ্চারণ হবে অর্থাৎ <O> 'অ' হবে, আর A 'অ' হবে, 'এ' হবেঅথথবা 'আ' হবে তা বাংলা লিপির ধ্বনি গোত্রগুলির সাহায্যেই রোমান লিপিতে লেখা কগবরক শিক্ষার্থীকে প্রথম

পরিচয় করাবার প্রয়োজন দেখা দেবে। কাজেই রোমান লিপিতে কগবরক লিখতে গেলে কিছুটা সেই প্রাথমিক অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবেই। কাজেই এই সব বিতর্কে কালক্ষেপ করলে কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের কাজই অযথা বিলম্বিত হবে। আর এটা তেমন জটিল সমস্যাও নয় যার কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়না।

আমার মতে রোমান, বাংলা এবং দেবনাগরী এই তিনটির যে কোন একটি লিপিতেই কগবরক লেখা যায়। কগবরক ভাষার ধ্বনি গোত্রগুলি মোটামুটি ঠিক করে নিয়েই তা করা যায়। কোন একটি নির্দিষ্ট লিপিগোষ্ঠীর প্রতি আমার ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কোন আকর্ষণ নাই। প্রত্যেক ভাষারই কথ্যরূপ আর লিখিতরূপের উচ্চারণে কিছুটা হেরফের হবেই। কাজেই যারা ভাবেন কগবরক এখন যেভাবে কথ্যভাষায় ধ্বনিত হয় লিখিতরূপ পরিগ্রহ করলেও সেভাবেই থাকবে, তার কোথাও কোন সংস্কার হবে না, আমি তাদের সাথেও ঐকামত হতে পারি না।

বাংলা লিপি কগবরকভাষী বিরাটসংখ্যক ব্যক্তিদের কাছে পরিচিত ও সর্বাধিক নৈকট্য বলে বাংলালিপিতে কগবরকের লিপিরূপ দিলে তা তাদের কাছে সহজতর হবে। অতিঅল্প সময়ে লিখিত কগবরক ভাষাকে বেশী সংখ্যক কগবরক ভাষীদের কাছে নিয়ে যাওয়া যাবে। এটাও বাংলা লিপির বিশেষ সুবিধার দিক। ইতিহাসের গতিধারা কগবরক ভাষীদের সামনে এই পরিস্থিতির জন্ম দিয়েছে। এখন, এই বাস্তবতাকে অস্বীকার করা বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক হবে না এবং সুবিবেচনাপ্রসু হবে না।

কগবরকভাষীদের পারিপার্শ্বিক অবস্থা, সামাজিক ও ভৌগোলিক অবস্থান, বাংলা লিপির সাথে তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিচয় এবং বাংলা ভাষার সাথে কগবরক ভাষার সহাবস্থান প্রভৃতি ঐতিহাসিক কারণগুলি বিচার বিবেচনা করে কগবরক লেখার লিপি নির্ধারিত হওয়া উচিত। ইউটোপিওন বা আকাশ কুসুম চিন্তার রোগে ভুগে আসল কাজের ক্ষতি করে লাভ নাই। বাংলা লিপিই কগবরকের লিপিরূপে গ্রহণ করা উচিত।

বাংলা এবং কগবরক এই উভয়ের বহু শতাব্দী ধরে পরস্পর সহাবস্থানের ফলে জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে কগবরক শব্দ ভান্ডারে প্রচুর বাংলা শব্দ মিশে গেছে। কগবরক সেই বাংলা শব্দগুলোকে আত্তীকরণ (assimilate) করে নিয়েছে। তাতে কগবরক ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই বরং তার অবয়ব বৃদ্ধি পেয়েছে। বরং সেই বাংলা শব্দগুলো হঠাৎ বাদ দিলে কগবরকে সেই ভাব প্রকাশ করার উপযুক্ত কগবরকে প্রতিশব্দ এখন হঠাৎ খুঁজেই পাওয়া যাবে না। (পরে তৈরী করা যেতে পারে।) যেমন আঙ বিশ্বাস খাইয়া। আঙ মাইখাম চায়া। বাংলা <বিশ্বাস> এর পরিবর্তে বিশুদ্ধ কগবরক <মাইখাম>

ব্যবহার করা যেতে পারে । তবে তেমন শক্তিশালী উপযোগী অর্থবহ হবে না । <মাইখাম> শব্দের অনেক প্রকার অর্থ হয় । যেমন, বিশ্বাস করা, নির্ভর করা, পোড়া ভাত, পোড়া ধান ইত্যাদি । ইংরেজী 'কমন' (common) শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ <**সাধারণ**> লিখলে যেমনটি দাঁড়ায় 'বিশ্বাস' এবং মাইখামের ক্ষেত্রে তফাৎটা তার চেয়ে কম হবে না । তা ছাড়া আরও অনেক বাংলা শব্দ কগবরক আত্তীকরণ করেনিয়েছে যাকে বাদ দিলে কগবরক-এর নিজস্ব কোন প্রতিশব্দ এখনও আবিষ্কৃত হয় নাই যার মাধ্যমে সেই ভাব প্রকাশ করা যেতে পারে । যেমন— প্রস্তাব, সম্পত্তি, সত্ত্ব, শর্ত, বাধ্য প্রভৃতি । তাই বলতে চাই বাংলা শব্দগুলির আত্তীকরণের ফলে কগবরক সমৃদ্ধিশালী হয়েছে, ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই । দুটি ভাষা পাশাপাশি থাকলে অপেক্ষাকৃত অবিকশিত ভাষা বিকশিত ভাষার শব্দভাণ্ডার থেকে শব্দগুলি গ্রহণ করে সমৃদ্ধ হয় ইহাই স্বাভাবিক। ভাষা বিকাশের ঐতিহাসিক ধারা তারপ্রমাণ দেয় । তাতে আতঙ্কিত হওয়াটা হল রক্ষণশীলতা এবং ভাষার সমৃদ্ধ সাধনের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ানো ।

বাংলা লিপি কগবরক লেখার লিপিরূপে গ্রহণের সপক্ষে আর একটি ব্যবহারিক ও বাস্তব সুবিধার দিক হল এই যে, যে বিরাট সংখ্যক কগবরক ভাষী ইতিমধ্যেই বাংলা লিপির সাথেপরিচিতি লাভ করেছেন, আর যারা পরিচিতি লাভ করতে যাচ্ছেন তাদের কাছে কগবরক সাহিত্য এখনই পৌঁছিয়ে দেওয়া যাবে । কগবরক ভাষীরা বাংলা লিপি এবং বাংলা ভাষকে এড়িয়ে যেতে পারছেন না । কেননা, বাংলা ত্রিপুরার সরকারী ভাষা এবং ব্যবসা বাণিজ্যের আদান প্রদানের ভাষারূপে সুপ্রতিষ্ঠিত । বাংলা লিপি এবংবাংলা ভাষা কগবরকভাষীদের শিখতেই হচ্ছে । ইতিহাসের গতিধারা কগবরকভাষীদের এই পরিস্থিতিতে এনে দাঁড় করিয়েছে । কাজেই, রোমান লিপিতে কগবরক লেখা হলেও বাংলা লিপি এবং বাংলা ভাষা কগবরক ভাষীদের শিখতেই হচ্ছে । তাই, বাংলালিপিতে কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের ব্যবস্থা গৃহীত হলে বাংলালিপির সাথেপরিচিতি সকল কগবরক ভাষীর কাছেই কগবরক সাহিত্য লিখন, পঠন সহজতর হবে। তাতে এক বিরাট সংখ্যক কগবরক ভাষী ইতিমধ্যেই কগবরক উন্নয়নের কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন ।

রোমান লিপিতে কগবরক লেখা যায় না, বা রোমান লিপি অভারতীয় লিপি ইহা আমাদের বক্তব্য নয় । আমাদের বক্তব্য হল যে, রোমান লিপি কগবরকভাষী বিরাট সংখ্যক ব্যক্তিদের মধ্যে এত তাড়াতাড়ি পরিচিত লিপি করে তোলা যাবে না । ইংরেজী লিপির উচ্চারণ বা ধ্বনিগোত্রের সাথে সুপরিচিতি এমন কগবরক ভাষীর সংখ্যা এত সীমাবদ্ধ যে, কগবরক শেখাবার শিক্ষক সংগ্রহ করতেই প্রাথমিক অবস্থায় দারুণ বেগ

পেতে হবে। উপজাতি যুব সমিতি মিশনারীদের সহযোগিতায় রোমান লিপিতে প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করে যে কয়েকটি স্থানে বেসরকারীভাবে রোমান লিপির সাহায্যে কগবরক শেখাবার স্কুল খুলেছেন, তাতে দেখা যায়, শতকরা ৯৯ জনই মিজো শিক্ষক। কগবরক ভাষার সাথে ভালভাবে পরিচিত নন। এমন শিক্ষকের কাছে থেকে কগবরক শিখতে গেলে শিক্ষার্থীদের শিক্ষার পথে কতদূর এগিয়ে নেওয়া যাবে তা বিশেষ বিবেচনার বিষয়। কগবরক ভাষী ছাত্র-ছাত্রীরাও পারিপার্শ্বিক অবস্থার চাপে ভাঙ্গা ভাঙ্গা বাংলা বলতে পারে বা কিছুটা বুঝে। ফলে শত অসুবিধা থাকাসত্বেও কগবরক না জানা বাঙ্গালী শিক্ষকের সাহয্যে যতটুকু পাঠ উদ্ধার করাও সম্ভব কগবরক বা বাংলা এই দুইটির যেকোন একটি ভাষাও জানে না এমন মিজো শিক্ষকের কাজ থেকে ততটুকুও উদ্ধার করা সম্ভব হবে না বরং আরও ভাষা বিভ্রাটে পড়তে হবে। এইসব অসুবিধা থাকা সত্বেও আমরা রোমান লিপি গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করতাম যদি আমরা এই স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হতাম যে, বাংলা লিপিতে কগবরক লিপিবদ্ধ করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু ঘটনা তা নয়। বাংলা লিপিতে কগবরক এর ধ্বনিগুলি বহুল পরিমাণে লিপিবদ্ধ করা যায়। তাই আমাদের কাছে কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের লিপিরূপে বাংলা লিপিই গ্রহণীয়।

ভারতের সকল ভাষার জন্য রোমান লিপি সম্পর্কে উক্তি

রোমান লিপির প্রবক্তারা .বলেন যে গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসু এবং ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির জন্য রোমান লিপি গ্রহণের সপক্ষে মতামত দিয়েছিলেন তাঁরা একসময় যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সেগুলির উদ্ধৃতি দিয়ে রোমানলিপিতে কগবরক লেখা যে কত যুক্তিসঙ্গত তা প্রমাণ করতে চেষ্টা করেন।

কেন তখন গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসু এবংডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিরা ভারতের সকল ভাষার লিপিরূপে রোমান লিপি প্রবর্তনের অভিমত প্রকাশ করেছিলেন সেই ঐতিহাসিক পটভূমিকার কথা তলিয়ে দেখেন না।

তখন ছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজাবাদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রচণ্ড জোয়ার। এই সংগ্রামে ভারতের নয়া বুদ্ধিজীবী, নতুন শিল্পপতি, শ্রমিক ও কৃষক সকলেই এক জোট। ভারতের জাতীয়জীবনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের একউজ্জ্বল তরঙ্গ। ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতাদের মুখে 'ভারত এক দেশ' এক জাতি,'' এক ভাষা' এই তত্ত্বের দিকে অনেকেই ঝুঁকে পড়েন। ভারতের সব ভাষা রোমান লিপিতে লেখার

মতামত এই তত্ত্ব বা প্রবণতার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত হতে পারে ।

ভারতের বিভিন্ন জাতেরবিভিন্ন ভাষা । এক ভাষীর লোক অন্য ভাষা বুঝেন না । আবার সেই ভাষাগুলি ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে লেখা হয় । কাজেই এক ভাষাভাষীরা অন্য ভাষা শিখবার পথে এই লিপির বৈচিত্র্য একটি মস্ত বড় অন্তরায় । ভারতের সকল লিখিত ভাষা একটি সাধারণ (common) লিপিতে লেখা হলে যারা ভিন্ন ভিন্ন লিপি শিখে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা শিখতে চান তাদের শিখবার পথে সেই বাধা দূরীভূত করা যায় ।

ভারতের বিন্নি ভাষার লিপির বৈচিত্র্য ভারতের এক ভাষাভাষীদের অন্য ভাষাগুলি শিখবার পথে একটি বড় অন্তরায় । এই লিপির বিভিন্নতা এক ভাষাভাষীর জ্ঞান পিপাসুদের অন্য ভাষাগুলি শিখতে নিরুৎসাহিত করে রাখে । একে অন্যের সাহিত্য জগতে প্রবেশ করে সাহিত্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে সর্বভারতীয় একটি আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলারপথে ইহা বড় বাধা । ভারতের বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীগুলির মধ্যে নৈকট্য প্রতিষ্ঠার অন্যতম আর একটি বড় বাধাও এই পরস্পর পরস্পরকে না জানা । ভারতের ভিন্ন ভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর জন্য ভিন্ন ভিন্ন লিপি ব্যবহার না করে ভারতের সব ভাষা গোষ্ঠীর জন্য একটি মাত্র সাধারণ (common) লিপি ব্যবহৃত হলে এক ভাষাভাষীয় জ্ঞান পিপাসুদের অন্য ভাষাগুলি শিখবার পথে একটি মস্ত বড় বাধা দূর হয় । আর একমাত্র রোমান লিপি ছাড়া সেই কাজ ভারতের অন্যকোন ভাষাগোষ্ঠীর লিপি সাধন করতে পারে না । কেননা রোমান লিপিই ভারতের বিভিন্ন ভাষাগোষ্ঠীর শিক্ষিত ব্যক্তিদের কাছে তখন একমাত্র সাধারণ পরিচিতি লিপি । এখনও প্রায় তাই । তাই, গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসু প্রমুখ জাতীয়তাবদী নেতারা ভারতের সব লিখিত ভাষাকে রোমান লিপিতে রূপান্তরিত করার অভিমতই প্রকাশ করে গেছেন । বাস্তবে তা রূপ দেবার জন্য কোন সক্রিয় কার্যক্রম গ্রহণ করেন নাই ।

তাঁদের বক্তব্যের মূলপ্রতিপাদ্য এই ছিল না যে, তাদের যেসব ভাষার লিখন লিপি চালু সেগুলি নিজ নিজ ভাষাগোষ্ঠীতে লিপিবদ্ধ করতে অক্ষম বা যথেষ্ট নয় । তা পূর্ণতা আনতে রোমানলিপির দ্বারস্থ হতে হবে। তাঁদের বক্তব্যের মূল প্রতিপাদ্য, আরও সরলভাবে বলতে গেলে, নিহিত লক্ষ্য প্রধানতঃদুইটি । এক, রাজনৈতিক প্রয়োজন অর্থাৎ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা । দুই, এক ভাষাভাষী গোষ্ঠীদের জন্য অন্য ভাষা শিখবার লিপির বাধা দূর করা।

এখানে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিকও ভুললে চলবে না । প্রত্যেকটি ভাষার বিকাশ এবং লিপি প্রয়োগের পেছনে কতকগুলি নিজস্ব বৈশিষ্ট ও ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া কাজ

করে। কেউ ইচ্ছা করলেই রাতারাতি সেই বৈশিষ্ট্য বা ইতিহাসের রূপরেখা পালটাতেপারেন না। ততাই গান্ধীজী, সুভাষচন্দ্র বসুএবং ডক্টর সুনীতি চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের মতামত থাকা সত্বেও রোমান লিপি ভারতের প্রত্যেকটি ভাষাগোষ্ঠীর সাধারণ লিপি হয়ে উঠতে পারে নাই। প্রত্যেকটি ভাষাগোষ্ঠী তার নিজস্ব ঐতিহ্য অনুসরণ করেই চলেছে।

গতিশীল বিশ্বপ্রকৃতির অনেক কিছুই পরিবর্তনশীল। কালক্রমে ভারতের ভবিষ্যৎ মানবগোষ্ঠীর প্রয়োজনে ভারতের সবভাষাগুলির লিখন লিপি একটি সাধারণ (common) লিপি হয়ে উঠবে কিনা, এবং তা রোমান লিপি হবে, না দেবনাগরী হবে, না অন্য কোন ভারতীয় ভাষার লিপি হবে, না বর্তমানে যেমন আছে তেমনিই চলতে থাকবে সে সম্পর্কে এখন ভবিষ্যৎবাণী না করাই ভাল। এখানে বলতে চাই যে, যেকোন ভাষা একটা নির্দিষ্ট লিপির সাহায্যে লিখিতরূপ পরিগ্রহ করলে তাকে অন্য লিপিতে লিখিতরূপে রূপান্তরিত করা তেমন অসুবিধাজনক কিছু থাকবে না।

কগবরক ভাষার জন্য বাংলা লিপি গ্রহণ করার পথে টাইপকরা এবং টেলিগ্রাম করার অসুবিধার কথা বলা হয়। সে অসুবিধা বাংলা, হিন্দী বা ভারতের অন্য যেকোন লিপিগোষ্ঠীর রয়েছে। তা সত্বেও কাজ পড়ে থাকছে না। এগিয়ে চলেছে। ব্যবহারিক প্রয়োজনে, বাংলার বানানের কিছুটা সংশোধন বা সংস্কার সাধন কাজও চলছে। সেই অসুবিধাগুলি সামনে রেখেই ভারতের রাষ্ট্র ভাষা বা সংযোগ ভাষা হিন্দী এখনও দেবনাগরী লিপিতে লেখা হচ্ছে। টাইপিং সমস্যাটা দুরতিক্রম্য নয় বলেই এখন পর্যন্ত হিন্দী ভাষার লিপিরূপে দেবনাগরীর পরিবর্তে রোমান লিপি গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে না।

কগবরক ভাষীর জনসংখ্যা এত কম যে, এই কগবরক ভাষীদের ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকার সম্ভাবনা বহু দূরের বস্তু। তা ছাড়া হিন্দী বা ইংরাজী এই দুইটির যেকোন ভাষাতেই টেলিগ্রাম করার ব্যবস্থা চালু আছে। অন্ততঃ ইংরাজীতে না হলেও হিন্দীতে চালু থাকবেই। কাজেই, কগবরকের মাধ্যমে টেলিগ্রাম পাঠানোর সমস্যাটা তেমন কোন আশু বা জটিল সমস্যা নয়। কোন দিন দেখা দেবেও না। তার জন্য কগবরব ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হবেনা। আর কগবরক ভাষা সর্বভারতীয় ভাষার স্থান দখল করবে, বা রোমান লিপিতে লেখা হলে কগবরক সাহিত্যের পাঠক সংখ্যা সাংঘাতিকভাবে বেড়ে যাবে, এমন আশা এখন না করাই ভাল।

রোমানলিপির প্রবক্তারা বলেন যে, বাংলা লিপিতে কগবরক লেখা হলে বাংলা প্রতিশব্দের সাথে কগবরক প্রতিশব্দের অর্থের বিরোধ বাঁধবে। যেমনঃ 'কবর' শব্দের

বাংলা অর্থ 'শ্মশান'। এর কগবরক হবে 'পাগল'। আমাদের বক্তব্য হল — এতে বিভ্রাট ঘটবার কোন সম্ভাবনা নাই। কগবরক সাহিত্যে কগবরকই লেখা হবে। সেখানে শ্মশান অর্থে কেউ কবর লিখবে না, লিখবে মৃতদেহ দাহ করার স্থান বলে <ছিমালুঙ> আর গোরস্থান হলে <বরকফবখর বা ফরমা ছিমালুঙ>। কেউ <কবর> লিখবেনা। কগবরকে --- লেখা হলে তা পাগলই বুঝাবে। কাজেই ভীতি অবান্তর। মূল সমস্যার বিশ্লেষণের গভীরে না গিয়ে একে তর্কের খাতিরে তর্ক করা বললে ভুল বলাহবে না।

রোমান লিপির প্রতি প্রবণতা

অপ্রাসঙ্গিক হলেও এখানে আরও একটা বিষয়ের উল্লেখ করব। সাম্প্রতিককালে সারা ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতিদের মধ্যে রোমানলিপিতে তাঁদের মাতৃভাষার লিখিতরূপ দেবার একটা সাধারণ প্রবণতা দেখা যায়। সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে এ প্রবণতা সবচেয়ে প্রবল। মিজো, গারো, খাসিয়া, নাগা প্রভৃতি উপজাতিরা রোমানলিপি গ্রহণ করেছেন। ভারতীয় লিখিত ভাষা সমূহের নূন্যতম ভাষা অসমীয়া ভাষার লিপি তাঁদের সবচেয়ে নিকটতম হলেও উক্ত উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার লাভ করেছে ইংরেজীর মাধ্যমে। অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে তাঁদের সমাজে শিক্ষার প্রসার করেনি। ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার লাভ করার ফলে তাঁদের কাছে রোমান লিপিই পরিচিতি হয়ে উঠে। দ্বিতীয় কারণ হল — খৃষ্টান মিশনারীরা তাঁদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করে, রোমান লিপিতে তাঁদের ভাষায় বাইবেল প্রভৃতি ধর্ম গ্রন্থাবলী রচনা করে প্রথমে তাঁদের ভাষার একটা প্রাথমিক রূপ দান করেন। ক্রমে ক্রমে রোমান লিপিতে তাঁদের ভাষায় পাঠ্যপুস্তকাদি প্রণয়ন করে তাঁদের মাতৃভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের পথ খুলে দেন। মিশনারীদের একাজ নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। তাঁদের রাজ্যের (তখনকার) সরকারী ভাষা অসমীয়া। কিন্তু অসমীয়া লিপিতে এই উপভাষাগুলির লিখিতরূপ দেবার জন্য সরকারের তরফ থেকে তেমন কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে কিনা আমার জানা নাই। কাজেই, উক্ত উপজাতিদের ইংরেজীর মাধ্যমে শিক্ষা এবং রোমান লিপির প্রতি অনুরাগ স্বাভাবিক কারণেই বৃদ্ধি পায়। তাই বাস্তবানুগ।

ইদানিং সাঁওতাল উপজাতিদের মধ্যেও বিতর্ক উঠেছে — সাঁওতালী ভাষার লিখন লিপি কি হবে। কেউ রোমানলিপি গ্রহণের পক্ষে আবার কেউ অন্য লিপির পক্ষে। লিপি সম্পর্কে সাঁওতালদের ঐক্যমতে আসার বিপক্ষে কতকগুলি প্রতিকূল পরিস্থিতি কাজ করছে। সাঁওতাল উপজাতির লোকসংখ্যা বিভিন্ন রাজ্যে ছড়ানো। বেশ উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় আঞ্চলিক অখন্ডতা রেখে বসবাস করেন প্রধানতঃ বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও উড়িষ্যায়। কিন্তু এই একই ভাষাভাষী উপজাতির জনগণের শিক্ষার মাধ্যম এক নয়।

পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা, বিহারে হিন্দী, উড়িষ্যাতে ওড়িয়া ভাষা তাদের শিক্ষার মাধ্যম। কাজেই একই ভাষাভাষী সাঁওতাল উপজাতিরা তিনটি ভিন্ন ভিন্ন লিপিতে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করেছেন। তিনটি লিপিতে একটি ভাষার লিখনরূপ দিলে সেই ভাষার অগ্রগতি ব্যাহত হতে বাধ্য। কেননা, একটি লিপির সাথে পরিচিত লোক অন্য লিপিতে লেখা তারই মাতৃভাষার রচনাদি পড়তে পারবেন না। নিজ মাতৃভাষায় লেখা সাহিত্যের সাথে পরিচিত হবার জন্য একই ব্যক্তির পক্ষে তিনটি লিপি আয়ত্ব করা সহজসাধ্যও নয়। একই লিপিতে সাঁওতাল উপজাতিদের একটা বিকশিত জাতিরূপে আত্মপ্রকাশের পথে, সাঁওতালী ভাষার উন্নতিসাধনের পথে সাঁওতালী ভাষীদের মধ্যে পরস্পর পরস্পরের মধ্যে নৈকট্য প্রতিষ্ঠার পথে এই লিপি বৈচিত্র্য একটা মস্ত বড় বাধা হয়ে থাকবে। এই পরিস্থিতিতে সাঁওতালী ভাষার লিখিতরূপ দানের জন্য রোমান কিংবা দেবনাগরী লিপির যে কোনটিকে গ্রহণ করা শ্রেয় হবে।

কিন্তু ত্রিপুরার কগবরকভাষীদের ভৌগোলিক অবস্থান সাঁওতালদের মতনও নয়, আবার পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং শিক্ষাজগতে প্রবেশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীও মিজো, নাগা, খাসিয়া, গারো, প্রভৃতি উপজাতিদের সাথে কোন সাদৃশ্য নেই। ত্রিপুরা উপজাতিরা বাংলা ভাষার মাধ্যমেই শিক্ষা জগতে প্রবেশ করেছেন। কাজেই যান্ত্রিকভাবে সাঁওতাল, খাসিয়া, গারো, মিজো বা নাগাদের অনুকরণ করা ত্রিপুরার কগবরকভাষী উপজাতিদের মোটেই ঠিক হবে না। বলা বাহুল্য যে, যে কারণে খাসিয়া,, গারো, নাগা এবং মিজোদের পক্ষে রোমান লিপি গ্রহণ সুবিধাজনক, ঠিকসেই একই কারণে কগবরক লেখার জন্য বাংলা লিপি সুবিধাজনক।

বাংলাদেশেপ্রচুর সংখ্যক কগবরক উপজাতি রয়েছেন। তাঁরা ভিন্ন রাষ্ট্রের অধিবাসী একথা ঠিক। কিন্তু তাদেরও শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা ভাষা। তাঁরা বাংলা লিপির সাথে পরিচিতি। কগবরক বাংলা লিপিতে লেখাহলে এই দুই রাজ্যের কগবরকভাষীদের মধ্যে ভাষার বিকাশ সাধনের দিকথেকে ভবিষ্যতে পরস্পরের রচনা সহায়ক ও পরিপূরক হয়ে উঠতে পারে। অবশ্য বাংলাদেশের কগবরক ভাষীরা কগবরক লেখার জন্য কোন লিপি গ্রহণ করবেন তা তাদের এক্তিয়ারভুক্ত এ সম্পর্কে আমাদের বলার কিছু নাই।

কগবরক রোমান লিপিতে লেখার প্রবক্তাদের মনে প্রচ্ছন্নভাবে আর একটি প্রেরণা কাজ করছে। অথচ খোলাখুলি কেউ একথা স্বীকার করতে পারছেন না। তবে একথা কারও অগোচর নয় যে, ত্রিপুরার কগবরক ভাষী উপজাতিদের মধ্যে কেউ কেউ খৃষ্ঠধর্মে দীক্ষিত হবার আগে কগবরকের লিখিত রূপ দেবার জন্য রোমানলিপি গ্রহণের প্রশ্নটি এত সামনে আসে নাই কুতাল কথমা প্রকাশের সময় একমাত্র বংশীঠাকুরই আমাকে

বলেছিলেন, "দশরথ, ভেবে দেখ কগবরকেরলিপি রোমান হলে কি হয় ? ' কগবরক ভাষী উপজাতিদের গুটিকতক শিক্ষিত যুবক খৃষ্ট ধর্ম গ্রহণের পর খৃষ্টান মিশনারীরা রোমান লিপিতে কগবরক ভাষায় অনুবাদ করে গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে দেবার পর রোমান লিপির রোমান লিপির প্রশ্ন সামনে আসে । শিক্ষিত ছাত্র ও যুবকদের একাংশ রোমান লিপিতে কগবরকের লিখিতরূপ দেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন । খৃষ্টান মিশনারীরা কেবল 'বাইবেল' রোমান লিপিতে কগবরকের অনুবাদ করেই ক্ষান্ত থাকেন নাই, বরং রোমান লিপিতে কগবরক লেখার বানান পদ্ধতি কিছুটা ঠিক করে কগবরককে প্রাথমিক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্য পুস্তকাদি প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজে কিছুটা অগ্রসর হয়ে যান। অথচ সে তুলনায় ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে কিছুই করাহয় নাই,বরং কগবরক ভাষাকে লিখিতরূপ দেবার পথে বারে বারে বাধা দেওয়া হয়েছে । এখানে উল্লেখ করা দরকার যে ১৯৬৪ সালে সরকার ত্রিপুরা বিধানসভায় বাংলাভাষাকে ত্রিপুরার সরকারী ভাষার মর্যাদা দিয়ে, একটি আইন পাশ করেন । কমিউনিষ্ট সদস্যগণ তখন কগবরককে ত্রিপুরার অন্যতম সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে এবং লিখিতরূপ দিতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে একটিপ্রস্তাব আনেন । কংগ্রেসীরা ভোটের জোরে তা নাকচ করে দেন। সরকারী স্তরে যে কগবরক ভাষার উপদেষ্টা বোর্ড গঠন করাহয়েছে তাতেও কগবরক ভাষার লিখিতরূপ দেবার কাজে যারা সাহায্য করতে পারেন এমন অনেক ব্যক্তিকেই বাদ দিয়ে রাখাহয়েছে । যেমন, আমাকে এবং সুধন্বা দেববর্মার মতন ব্যক্তিদের বাদ দিয়েরাখা হয়েছে । রোমান লিপিতে কগবরকের লিখিতরূপ দেবার নীতি গৃহীত হলে কগবরক ভাষায় পাঠ্যপুস্তক ও সাহিত্যাদি রচনা এবং মুদ্রণের ব্যয়ভার প্রাথমিক স্তরে খৃষ্টান মিশনারীরা গ্রহণ করবেন এমন আশ্বাসও নাকি খৃষ্টান মিশনারীদের কেউ কেউ উপজাতিদের কাউকে কাউকে দিয়েছেন । ফলে রোমান লিপিগৃহীত হলে কগবরকের লিখিতরূপে উত্তরণের কাজে অগ্রসর হতে আর্থিক সঙ্কটে পড়তে হবে না এমন ধারণাও রোমানলিপির প্রবক্তা উপজাতি অংশের মনে বদ্ধমূল হয়ে আছে। অথথচ অপর পক্ষে কগবরক ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণের জন্য বাংলা লিপি গৃহীত হলে সেপরিমাণ আর্থিক সাহায্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা সরকার থেকে পাওয়া যাবে কিনা সেই সন্দেহ রোমান লিপির প্রবক্তা উপজাতীয়দের মনে দৃঢ়তর হচ্ছে । কগবরক ভাষারপ্রতি কংগ্রেস সরকারের বিগত ২৮ বৎসর বৈমাত্রেয়সূলভ আচরণই সেই ধারণা সৃষ্টির মূল উৎস।

ত্রিপুরার উপজাতিরা আপন বৈশিষ্ট ও জাতিসত্তা নিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াতে চান । খৃষ্টধর্ম গ্রহণের মধ্য দিয়ে যদি তা আসে তবে তাই গ্রহণ করবো, আর রোমানলিপি

গ্রহণের মধ্য দিয়ে যদি তা আসে তবে তাই করবো — এমন একটা বেপরোয়া ও একগুঁয়েমী মনোভাব উপজাতি ছাত্রও যুবকদের কারও কারও মনে ক্রিয়া করছে । খৃষ্টানদের উস্কানী , বাঙ্গাল খেদা আন্দোলন প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে উপজাতিদের এই আত্মবিকাশের আন্দোলনকে দাবিয়ে রাখতে চাইলে সরকার মহা ভুল করবেন । সরকারকে মনে রাখতে হবে যে, কোন জাতির আত্মবিকাশের সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য। উপজাতি যুব সমিতির কতকগুলি কার্যাবলী প্ররোচনামূলক হতে পারে, বিভেদমূলক হতে পারে এবং জাতি ও উপজাতি সমস্যা সমাধানের পক্ষে ক্ষতিকারক হতে পারে কিন্তু একমাত্র রোমান লিপিএবং আরও গুটি কতক দাবীর বাড়াবাড়ি বাদ দিলে অন্যান্য অনেক দাবীই গণতান্ত্রিক ও সংবিধান স্বীকৃত । গণমুক্তি পরিষদ ঐ দাবীসমূহ বারে বারে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট পেশ করে এসেছেন । সেই দাবীগুলি আদায়ের জন্য গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক জনতা এতদিন আন্দোলন করে এসেছেন, এখনও করছেন । কাজেই এই দাবীগুলি পূরণ না হলে সাম্প্রদায়িক উগ্রপন্থীদের ত্রিপুরার সাধারণ উপজাতি জনতাকে বিভ্রান্ত করার পথই উন্মুক্ত রাখা হবে। উপজাতি জনগণের মধ্যে চাঞ্চল্য এবং অস্থিরতা আরও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। যে পদ্ধতিতে বা পন্থায় উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ত্রিপুরায় উপজাতিদের দাবী আদায় করার কথা বলছেন সেই পথে যেউপজাতিদের দাবী আদায় সহজ হবে না এবং পাহাড়ী-বাঙ্গালী এইদুই সম্প্রদায়ের মধ্যে বৈরীতা আরও বৃদ্ধি পাবে তা শোষণ ও বঞ্চনায় ব্যথিত এবং উত্তেজিত উপজাতিদের উপলব্ধি করানো আরও কঠিন হয়ে উঠবে।

লিপি ভাষার অবয়ব বাড়ায় না কেবল লিখিতরূপ দেয়

এখানে আরও একটি বিষয়ের প্রতি কগবরক ভাষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা প্রয়োজন মনে করি । কগবরক ভাষীদের এমন ধারণা দেওয়ার প্রয়াস চলছে যে, বিশ্বের অন্যতম সমৃদ্ধশালী ইংরাজী ভাষার পরিচয়লাভের দরজা খুলে যাবে কগবরক ভাষীদের যদি রোমান লিপিতে কগবরক লেখাহয় । প্রথমতঃ এই ধারণা ভুল । রোমান লিপির সাথে পরিচয় ঘটলেও ইংরেজী ভাষার সাথে পরিচয় লাভ হবে না । ইংরেজী ভাষার সাথে পরিচয় লাভ করতে হলে কষ্ট করে ইংরেজী পড়তে হবে এবং শিখতে হবে। রোমান লিপির মাধ্যমে যাদের ভাষার লিখিতরূপে উত্তরণ হয়েছে, যেমন ফরাসী, জার্মানী, নিজ মাতৃভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করলেও ইংরেজীজানেন না। যাঁরা ইংরেজী জানবার জন্য কষ্ট করে ইংরেজী শিখেছেন কেবল তাঁরাই ইংরেজী জানেন।

মনে রাখা দরকার যে, লিপি ভাষাকে লিখিতরূপে উত্তরণের কাজ সমাধা করে । লিপি ভাষার অবয়ব বৃদ্ধি করে না । ভাষাকে সমৃদ্ধশালী করে না । রোমান লিপিতে

কগবরক লিখলেই কগবরক আপনা থেকেই বিভিন্ন শব্দভান্ডারে পরিপূর্ণ হয়ে সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠবে না। ভাষার অবয়ব বৃদ্ধি এবং তার বিকাশ সাধন করে কতকগুলি প্রক্রিয়া ও উপাদান। যেমন ঃ — (১) উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশ (ভিন্ন ভিন্ন স্তরে ভিন্ন শব্দ সম্ভারের উদ্ভাবন এবং সংযোজন।) (২) অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের (স্তর স্তরে স্তরে)। (৩) সামাজিক বিকাশের সাথে মানুষের মনন শক্তির সমৃদ্ধি, অর্থাৎ ভাব প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি। এক কথায় সামাজিক পরিস্থিতি। (৪) অপর ভাষার শব্দ গ্রহণের বা আত্তীকরণের ক্ষমতা অর্থাৎ রক্ষণশীলতার গন্ডীতে আবদ্ধ না থাকা। একটু লক্ষ্য করলেই চোখে পড়বে উপরে যে কয়েকটি প্রধান কারণ বা শর্তগুলির উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলির প্রথম তিনটির অস্তিত্ব কগবরকভাষী মানবগোষ্ঠীর সমাজে খুবই দুর্বল। তাই কগবরক ভাষার শব্দভান্ডার খুবই ক্ষীণ। উৎপাদনের উপকরণ এবং উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের স্তর অত্যন্ত নিম্ন এবং উৎপাদন যন্ত্র আবিষ্কারে, পরিবহণের যন্ত্রপাতি আবিষ্কারে, মানবগোষ্ঠীর সুযোগসুবিধা বৃদ্ধির নিত্য নতুন যন্ত্রপাতি ও ব্যবহার্য বস্তুর আবিষ্কারে কগবরক ভাষী মানবগোষ্ঠীর ভূমিকা প্রায় শূন্যের কোঠায়। তাই, সেইসব যন্ত্রপাতিও ব্যবহার্য দ্রব্যাদির নামাকরণ কগবরক ভাষায় প্রায় নাই বললে অত্যুক্তি হবেনা। যা আছে তা অন্য ভাষার শব্দাবলী থেকে সংগৃহীত। যেমন গাড়ী, লাঙ্গল, জোয়াল, ধূতি, লেপ বা রেজাই প্রভৃতি আরও অজস্র শব্দাবলী। জ্যোতিযশাস্ত্রের চর্চায় কগবরক ভাষীদের কোন ভূমিকা নাই। ললিত জ্যোতিষ বা গণিত জ্যোতিষ কোন শাখাতেই নহে। তাই এই শাখার কোন নিজস্ব শব্দই কগবরক শব্দ ভান্ডারে নাই। যেমন রাশি, নক্ষত্র, গ্রহণ, রাহু, কেতু, বৃহস্পতি প্রভৃতি প্রতিশব্দ। এমন কি দিনাঙ্কের বারগুলি। অর্থাৎ শনি, রবি, সোম প্রভৃতি সাতবার। গণিতশাস্ত্রের চর্চা হয় নাই। তাই যোগ, বিয়োগ, পূরণ, ভাগ, সমীকরণ, ভগ্নাংশ প্রভৃতি গাণিতিক ব্যবহারিক শব্দসমূহ কগবরকের নিজস্ব প্রতিশব্দ নাই। যা আছে তা সবই বাংলা শব্দগুলির আত্মীকরণ। এভাবে মানবগোষ্ঠীর প্রতিটি ব্যবহারিক শাখার প্রতিশব্দ গ্রহণের শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। বাংলা ভাষার পরিবর্তে যদি ইংরেজী ভাষার প্রচলন হত তা হলে ঐগুলির প্রতিশব্দ ইংরেজী হতে পারত। অর্থাৎ কোন না কোন সমৃদ্ধশালী ভাষার শব্দভান্ডার থেকে তা গ্রহণ করতে হত।

উপরে বর্ণিত ৪র্থ কারণ বা শর্তের অবস্থান কগবরক-এ প্রবল। তাই কগবরক শব্দ ভান্ডার কিছুটা সমৃদ্ধ। কগবরক যদি এই আত্মীকরণের ক্ষেত্রে রক্ষণশীলতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলত, তা হলে তার কলেবর আরও ক্ষীণ হত। বাংলা ভাষার সংস্পর্শে এসে কগবরকের লাভ-লোকসানের মূল্যায়ণ করা আমার এই প্রবন্ধের মূল

প্রতিপাদ্য নয় । কগবরক বাংলা শব্দ ভান্ডার থেকে শব্দাবলী আহরণ করে কিভাবে আত্মীকরণ (assimilate) করেছে তার ক্ষানিকটা আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই এগুলির উল্লেখ করতে বাধ্য হলাম ।

এখানে আরও উল্লেখনীয় যে উৎপাদন ব্যবস্থার যে সবশাখায় কগবরক ভাষীদের নিজস্ব স্বাধীন ভূমিকা রয়েছে বা সেগুলি দীর্ঘদিন ধরে ব্যবহার করে এসেছেন তাদের নিজস্ব ভাষায় সেগুলির নামাকরণ রয়েছে । যেমন — জুম = হুক; তাক্কাল= দা, দামরা; ধান = মাই; কাউন ধান= নাইছুই; কুইসার বা ইক্ষু= কুরুগ; টং= গাইরিঙ ;ধনু= বাদুখুঙ ; বন্দুক = ছিলাই ; জামা = কামচুলুই প্রভৃতি। আবার কৃষি অর্থনীতিতে সেই নামাকরণ কম হয়েছে ঃ লাঙ্গল= লাঙ্গল ; জোয়াল = জোয়াল; হাল =আল; রোপন = ব'র'; আইল= আইল, লাইট।

এ ধরনের অসংখ্য তথ্য দিয়ে লেখার অবয়ব আর বাড়াতে চাই না । প্রবন্ধটিকে ভারাক্রান্ত করে তোলা আমার উদ্দেশ্য নয় । আমি শুধু এইটুকু বলতে চাই যে, ভাষার সমৃদ্ধি সাধন, কলেবর বৃদ্ধি বা ভাবপ্রকাশের জন্য শব্দভান্ডার আহরণ প্রভৃতি লিপির কাজ নয় । কাজেই, রোমান লিপি গ্রহণ করলে কগবরকের শব্দ ভান্ডার সমৃদ্ধ হয়ে উঠবে আপনা থেকেই এমন ধারণা যদি কেউ জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে করে থাকেন তা হলে সেই ভুল ধারণার নিরসন আবশ্যক ।

বাংলা শব্দসম্ভার গ্রহণের ফলে কগবরক এর কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে একথা বললে ভুল হবে না, বা বাংলা ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্ব করা হবেনা । যা সত্য তা বিবৃত করা হবে মাত্র (Statements of facts) ।

তাই উপসংহারে আমি আবারও বলতে চাই যে, বাঙ্গালী জাতি বা গোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ অংশের নিপীড়ন ও জুলুমের ফলে, অর্থাৎ তাদের অপকর্মের ফলে গোটা বাঙ্গালী জাতির সকল শ্রেণীর মানুষের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও বৈরী মনোভাব পোষণ করে যদি বাঙ্গালী এবং বাংলা ভাষার প্রভাবমুক্ত হবার সোপান হিসাবে বাংলা লিপিতে কগবরকের লিখিতরূপে উত্তরণের বিরোধিতা করে রোমান লিপির আশ্রয় গ্রহণের দিকে ঝুঁকেন তাহলে তারা ভুল করবেন । কগবরকের ক্ষতিই সাধন করবেন । তাতে কগবরক ভাষীদের সমকালীন ঐতিহাসিক ও সামাজিক অবস্থানকেই অস্বীকার করা হবে ।

সকল দিক বিবেচনা করেই আমরা বাংলা লিপি কগবরক লেখার লিপিরূপে গ্রহণ করার জন্য সুপারিশ করছি । আমরা আশা করব কগবরকভাষী বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের মানুষ আমাদের এই বক্তব্য এবং সুপারিশ সুবিবেচনার সহিত গ্রহণ করবেন । বাংলা কগবরক লেখার লিপিরূপে সকল অংশের কগবরক ভাষীদের নিকট গ্রহণীয় হয়ে উঠলে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় বাংলা লিপিতে কগবরক লেখার বানান পদ্ধতি নির্ণয় করে কগবরকের লিখিতরূপে উত্তরণের কাজে এগিয়ে যাওয়া যাবে ।

উপজাতি জনগণের চার দফা দাবী কি কি ও কেন?

পৃথিবীর সকল মানুষেরই অধিকার সমান। এ অধিকার মানুষের জন্মগত। মানুষের সুখী ও সম্পদশালী হবার অধিকারগুলি অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ত্রিপুরার উপজাতিদের ক্ষেত্রে সেই অধিকার সমূহ দারুণভাবে অবহেলিত ও অবজ্ঞাত। উপজাতিদের মাতৃভাষা, যা তাদের কাছে প্রিয়তম বস্তু, তাও অবজ্ঞাত,অনাদৃত ও পদদলিত। বাঙ্গালী জাতির শোষক শ্রেণীর শাসন ও শোষণে এবং সর্বক্ষেত্রে মোড়লগিরিতে (বিগ ব্রাদারলি এডভাইস) ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের মানবিক অধিকার পদদলিত। তাদের সামাজিক জীবন ক্ষত-বিক্ষত। উপজাতিরা এর উপশম চান। তার জন্য আপোষহীন সংগ্রাম করে চলেছেন। তাঁদের এ সংগ্রাম অপ্রতিরোধ্য। তাদের দাবী দাওয়া মানবোচিত ও ন্যায়সঙ্গত। এ সংগ্রাম বানচাল করার চেষ্টা করা, এ দাবীগুলির প্রতি নেকনজর প্রদর্শন বা উদাসীনতা প্রদর্শন হবে উপজাতিদের আহত হৃদয়ের ক্ষতে নূনের ছিঁটা দেওয়া। একথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, আত্ম-চেতনায় উদ্বুদ্ধ কোন একটা গোষ্ঠীকে কেউ দাবিয়ে রাখতে পারে না।

সংবিধান স্বীকৃত রক্ষাকবচমূলক দাবীতে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ আন্দোলন করে এসেছেন গত ২৮ বৎসর ধরে। ত্রিপুরার অ-উপজাতিয় গণতান্ত্রিক মানুষ এই দাবীগুলিকে সমর্থন করতে শুরু করেছেন। উপজাতীয় সংগ্রামী মানুষের সহযোদ্ধা হিসাবে তাঁরাও এগিয়ে এসেছেন সংগ্রামের ময়দানে। অন্যান্য মৌলিক দাবীতো দূরের কথা এমনকি ভারতের সংবিধানে উপজাতিদের যে অধিকার সমূহের স্বীকৃতি রয়েছে তাও কংগ্রেস সরকার দিচেছন না।

অনগ্রসর, উৎপীড়িত ও শোযিত উপজাতি জনগণের বাঁচার দাবীগুলি যে ন্যায় সঙ্গত, মানবোচিত ও জরুরী এবং সে দাবীগুলি যে অবজ্ঞাত ও শোষিত উপজাতিদের জাতীয় জীবনের আশা আকাঙ্খার মূর্ত প্রতীক তা আর ব্যাখ্যা করে বলার অপেক্ষা রাখে না। ঐ দাবীগুলি ছোট ও বড় প্রত্যেকটি মানবগোষ্ঠীরই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী। সে অধিকার যখনই কেউ কেড়ে নিতে চায় তখনই মণিহারা সাপের মত তারা গর্জে উঠে ফণা ঊর্দ্ধে তুলে ধরে। ত্রিপুরার শোযিত উপজাতি জনতা তাই আজ আন্দোলন মুখর। দাবী আদায়ে সঙ্কল্পবদ্ধ। তাঁদের সেই দাবী আদায়ের সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে অ-উপজাতীয় শ্রমজীবি ও গণতান্ত্রিক মানুষকেও। এভাবেই একে অন্যের মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রতিম ও সহযোদ্ধা মনোভাব গড়ে উঠবে, জাতি ও উপজাতির

সাধারণ মানুষের কল্যাণে সুন্দর ও সুখী ত্রিপুরা গড়তে সম্মিলিত গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা যাবে।

এই অনুকুল আবহাওয়া সৃষ্টির মূলে প্রধান বাঁধা হল-কংগ্রেস সরকার, তার উপজাতি স্বার্থবিরোধী নীতি এবং তার সকল জাতি ও উপজাতির গরীব অংশের ও শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থ বিরোধী নীতি । কংগ্রেসের পুঁজিবাদী অর্থনীতি কোন জাতি বা উপজাতির গরীব ও মেহনতি মানুষের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করবে না, তাঁদের জীবনে প্রাচুর্য্য ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এনে দেবে না। গত ২৮ বৎসরের এক টানা কংগ্রেস শাসনের মধ্যে দিয়ে সে পরীক্ষা-নিরীক্ষা হয়ে গেছে।

ত্রিপুরায় কংগ্রেস সরকার উপজাতি জনগণের রক্ষাকবচমূলক দাবীগুলি তাচ্ছিল্য ভরে উপেক্ষা করেছেন। উপজাতিদের আত্ম-বিকাশের নিম্নতম শর্ত পূরণে অস্বীকার করেছেন । যাতে উপজাতিরা একটা বিকশিত জাতি বা গোষ্ঠীরূপে আত্মপ্রকাশ করতে না পারেন, যাতে বাঁচার মত জমি ধরে রাখতে না পারেন, যাতে নিজ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা জগতে প্রবেশ করে আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সাথে পরিচিত হয়ে অন্যান্য অগ্রসর জাতি ও গোষ্ঠীর ব্যাক্তিদের সমকক্ষ হয়ে দাঁড়াতে না পাবেন, যাতে অগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে না পারেন, যাতে তাদেব শাসন, শোষণ উৎপীডন ও জোর জুলুমের শিকল ছিঁড়ে নিজকে মুক্ত করতে না পারেন, তাবই উদ্দেশে কংগ্রেস শাসকেবা একটির পর একটি ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থবিবোধী যড়যন্ত্রে লিপ্ত হচ্ছেন। ত্রিপুরার সকল জাতি ও উপজাতির শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে রুখে দাঁড়াতে হবে এই অন্যায়, অবিচার, শোষণ ও জুলুমের বিরুদ্ধে। এটাই হবে ত্রিপুরার তথা ভাবতের প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক মানুষের মানবোচিত ও গণতান্ত্রিক কর্তব্য। ত্রিপুরা তথা ভারতের শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষ, জাতি ও ধর্মেব ঊর্দ্ধে থেকে এই কর্তব্য সম্পাদনে অগ্রসর হয়ে আসবেন এটা আমরা অবশ্যই আশা করব। আমরা আশা কবব ত্রিপুরার উপজাতিদের নিম্নলিখিত ৪ দফা দাবী পূরণে ত্রিপুরাব প্রত্যেকটি অংশের সংগ্রামী মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে এগিয়ে আসবেন। শুধু মৌখিক সমর্থন নয়, সংগ্রামে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ আজ সবচেয়ে বেশী জরুবী।

উপজাতিদের ৪ দফা দাবী সমূহ ঃ

১। উপজাতি রিজার্ভ

মহারাজার উপজাতি রিজার্ভ ভাঙ্গার আইন এখনই নাকচ করতে হবে। উপজাতি

জনসংখ্যাধিক্য এলাকাসমূহে উপজাতি রিজার্ভ ঘোষণা করতে হবে। যাতে ভবিষ্যতে রিজার্ভের সীমানা নিয়ে কোন বিরোধ দেখা না দিতে পারে সেভাবে রিজার্ভের সীমারেখা পাকাপোক্ত করতে হবে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা নির্ধারণ করতে হবে গ্রামকে কেন্দ্র করে।

২। অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল

উপজাতি রিজার্ভ এলাকার জন্য অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন করতে হবে। রিজার্ভের বহির্ভূত উপজাতি অধিবাসীদের জন্যও প্রয়োজনীয় রক্ষাকবচ রাখতে হবে। রিজার্ভ এলাকার যাবতীয় উন্নয়নমূলক কাজকর্ম পরিচালনার সর্বময় ক্ষমতা এই কাউন্সিলের হাতে দিতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এই কাউন্সিল গঠন করতে হবে। সরকারের মনোনীত ব্যক্তিদের কাউন্সিলে স্থান দিয়ে কাউন্সিলের মৌল উদ্দেশ্য বানচাল করা চলবে না। ভারতের সংবিধানের প্রয়োজনীয় অংশ সংশোধন করেই এ কাজ সমাধা করতে হবে।

অনেকে সাংবিধানিক অসুবিধার বিষয়টিকে সামনে বড় করে এনে উপজাতিদের জন্য রিজার্ভ গঠনের বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান। এটা কোন যুক্তি নয়। মনে রাখতে হবে মানুষের প্রয়োজনে সংবিধান, সংবিধানের প্রয়োজনে মানুষ নয়। মানুষের প্রয়োজনে রাষ্ট্র,রাষ্ট্রের প্রয়োজনে মানুষ নয়। কাজেই ত্রিপুরার ৫ লক্ষাধিক উপজাতির মৌলিক স্বার্থে ভারতের সংবিধান পরিবর্তন করতে হবে এবং ত্রিপুরার প্রশাসনিক কাঠামোতে প্রয়োজনীয় সংস্কার আনতে হবে। এটাই হবে মানব অধিকারের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত এবং গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

৩। বে-আইনী হস্তান্তরিত জমি উদ্ধার

১৯৬৭ সাল থেকে উপজাতিদের নিকট বে-আইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি উপজাতি মালিকদের ফেরৎ দিতে হবে। যে ক্ষেত্রে পূর্ব মালিক উপজাতির সন্ধান পাওয়া যাবে না সে ক্ষেত্রে অপর উপজাতি জুমিয়া, ভূমিহীন এবং যে উপজাতি কৃষকদের জমি আড়াই একরের কম তাদের দিতে হবে। যে অ-উপজাতীয় গরীব চাষীরা জমি ফেরৎ দিতে বাধ্য হবেন, তাদের সরকার থেকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেবার কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪। মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ

উপজাতি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষার সুযোগ দিতে হবে। ত্রিপুরার

বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠীর মাতৃভাষা ককবরক। তাই, কগবরককে ত্রিপুরার অন্যতম সরকারী ভাষার মর্যাদা দিতে হবে। কগবরককে লিখিতরূপে উত্তরণের ব্যবস্থা অবিলম্বে গ্রহণ করতে হবে। তার জন্য প্রয়োজনীয় আর্থিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা এখনই গ্রহণ করতে হবে।

এই চার দফা দাবী কেবলমাত্র উপজাতিদেরই দাবী নহে, এই দাবী সমগ্র গণতান্ত্রিক মানুষের দাবী। এই দাবীগুলি ত্রিপুরার উপজাতিদের আশা ও আকাঙ্খাকে রূপ দেবার নিম্নতম কর্মসূচীরূপেই আত্মপ্রকাশ করেছে। উপজাতীয়দের জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে এগিয়ে নিতে দেশের সকল জাতি ও উপজাতির গণতান্ত্রিক মানুষের এই দাবীগুলিকে সক্রিয় সমর্থন করা উচিত। এই পথেই ত্রিপুরার উপজাতি ও বাঙ্গালীর মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রতিম সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে, পরস্পরের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠতে পারে। এই উভয় অংশের সাধারণ মানুষের আর্থিক, রাজনীতিক ও সামাজিক স্বার্থে দেশ ও জাতি গঠনের গণউদ্যোগ সৃষ্টি করা যেতে পারে। আর উপজাতিদের এই প্রয়োজনকে অস্বীকার করা বা এ সম্পর্কে উদাসীন থাকা বা সেই দাবী আদায়ের আন্দোলনে নিস্ক্রিয় থাকা বা বিরোধিতা করার অর্থ হবে উপজাতি ও বাঙ্গালী শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষকে পরস্পর পরস্পরের নিকটতর না করে আরো দূরে সরিয়ে দেওয়া, বাঙ্গালী শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক অংশের মানুষের প্রতি উপজাতিদের সন্দিহান করে তোলা, উপজাতিদের সংকীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতার পথে ঠেলে দেওয়া। ত্রিপুরায় এই উভয় জাতির জনগণের মধ্যে মানবিক সম্পর্ক ও সম্প্রীতি গড়ে উঠার পথে কাঁটা হয়ে দাঁড়ানো। আমরা আন্তরিকতার সাথে আশা করব ত্রিপুরাকে সকল অংশের গণতান্ত্রিক জনগণ যেন সেই পথে পা না বাড়ান।

সঙ্কীর্ণতাবাদ ও উগ্র জাতীয়তাবাদ ঃ

উপজাতিদের জাতি গঠনের পথে, বাঙ্গালী ও উপজাতি জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃ-প্রতিম ও সহযোদ্ধাসুলভ মনোভাব গড়ে তোলার পথে একদিকে বাঙ্গালী উগ্র জাতীয়তাবাদ যেমন একটির পর একটি প্রতিকূল বাতাবরণ সৃষ্টি করতে ব্যস্ত, অপর দিকে তেমনি উগ্র বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদের সাথে পাল্লা দিয়ে সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়বাদ নগ্ন মূর্তিতে আত্মপ্রকাশ করছে। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক শক্তি সক্রিয় না হলে এই উভয় দুষ্টচক্র ত্রিপুরার রাজনৈতিক, আর্থিক ও সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত করে তুলবে। ত্রিপুরার শান্তিকামী গণতান্ত্রিক মানুষকে এ সম্পর্কে হুঁশিয়ার থাকতে হবে।

ত্রিপুরার ক্ষেত্রে যেমন উগ্রবাঙ্গালী জাতীয়তাবাদ উপজাতিদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য, সংস্কৃতি, স্বতন্ত্র ঐতিহ্য স্বীকারে পরানমুখ, তেমনি সঙ্কীর্ণ উপজাতীয়বাদ বাঙ্গালী জাতির বঙ্গ সংস্কৃতির উৎকর্ষতা স্বীকার করতে বা সঠিক মূল্যায়ন করতে এবং তার প্রগতিশীলতার

দিক বিচার বিশ্লেষণ করতে অস্বীকার করার প্রবণতায় ভুগছে। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সাম্প্রতিক কালে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখময় সেনগুপ্তের দশদা বাজারের বক্তৃতা। তিনি বলেছেন যে, -ত্রিপুরার উপজাতীয় সমস্যা কোন দিন ছিল না এবং এখনো নেই। তার মানে, ত্রিপুরার উপজাতিদের বিকশিত জাতিরূপে আত্ম-প্রকাশের প্রয়োজন নাই। শোষণ, বঞ্চনা, প্রতারণা, উৎপীড়ন এবং জমি হতে উচ্ছেদের হাত থেকে পরিত্রাণের প্রয়োজন নাই। উপজাতি রিজার্ভ ও অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিলের প্রয়োজন নাই। কংগ্রেস নেতার এই দৃষ্টিভঙ্গী ত্রিপুরার উপজাতিদের অগ্রগতির পথে বড় প্রতিবন্ধক। এই দৃষ্টিভঙ্গী উগ্র-বাঙ্গালী জাতীয়বাদের নগ্ন বহির্প্রকাশ।

অপর পক্ষে উপজাতি যুব -সমিতির সম্পাদক শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা 'হমচাং' নামক প্রচার পুস্তিকায় লিখেছেন যে, কগবরক ভাষা যেমন সুসংবদ্ধ ও সমৃদ্ধ ভারতের অন্য কোন ভাষা তেমন নয়; এমনকি বাংলা ভাষাও না। উগ্র উপজাতীয়বাদের আফিমের নেশায় এত মত্ত যে শ্রীশ্যামাচরণ ত্রিপুরা এক্ষেত্রে অনেকটা মাত্রাজ্ঞান হারিয়ে ফেলেছেন। কগবরককে বাংলার চেয়েও সমৃদ্ধ বলে মন্তব্য করেছেন ইহা হীনমন্যতারই (ইনফেরিওরিটি কমপ্লেক্স) আর এক রকম বহির্প্রকাশ। বাঙ্গালী সমাজের শোষক কুলের বিরুদ্ধে উষ্মা প্রকাশ করা আর বাংলা ভাষার উৎকর্ষতাকে অস্বীকার করা এক জিনিষ নয়। একটা লিখিত ভাষারূপে আত্মপ্রকাশ করার প্রয়োজনীয় মাল মশলা (উপাদান) কগবরকের আছে তা প্রতিষ্ঠিত করা আর কগবরকের মত ভাব প্রকাশের শব্দ ভান্ডারে পরিপূর্ণ সমৃদ্ধ ভাষা বাংলা ভাষা নয় বলা এক কথা নয়। শ্রীসুখময় সেনগুপ্ত এবং শ্রী শ্যামাচরণ ত্রিপুরা এই উভয় ব্যক্তির উপরোক্ত দৃষ্টিভঙ্গী হল উগ্রজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী। অপরকে অস্বীকার করার দৃষ্টিভঙ্গী। ইহা ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের ইপ্সিত দাবী পূরণে সহায়ক হবে না, উপজাতি ও বাঙ্গালী শ্রমজীবী মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবে না। বরং এই উভয় অংশের জনগণের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ করে দেবে। পারস্পরিক তিক্ততা বাড়াবে। আসল লক্ষ্যে পৌছার পথে বাদ সাধবে।

মহারাজার উপজাতি রিজার্ভের অখন্ডতা ঠিক ঠিকভাবে সংরক্ষিত হলে ত্রিপুরার উপজাতিদের জমিতে নিরাপত্তা রক্ষিত হত। তাদের অগ্রগতির সহায়ক হত। বাঙ্গালী উদ্বাস্তুদের প্রয়োজনে উপজাতি রিজার্ভের একটা অংশ মুক্ত করার পরও যদি অবশিষ্ট অংশ অটুট রাখা হত, তথায় যদি অ-উপজাতীয়দের জমি দখল সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হত এবং প্রচলিত আইনের ধারা অনুযায়ী (মহারাজার উপজাতি রিজার্ভ গঠনের আদেশের নিয়মাবলী এবং ভারতের পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস করা ১৯৬০ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব এবং ভূমি সংস্কার আইনের ১৮৭ ধারা) ত্রিপুরার কংগ্রেস সরকার বরাবর কাজ করে

আসতেন তা হলে ত্রিপুরার উপজাতিদের জমি এত ব্যাপক হারে বে-আইনীভাবে অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তরিত হত না।

ত্রিপুরা সরকার ত্রিপুরার উপজাতিদের প্রয়োজন অস্বীকার করেছেন। দেশ-বিভাগের শিকার হয়ে যে বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তুরা ত্রিপুরায় আসতে বাধ্য হয়েছেন, তাদের বাঁচার প্রয়োজন উপলব্ধি করে সেভাবে মহারাজার উপজাতি রিজার্ভের এক বিরাট অংশ রিজার্ভ মুক্ত করে তাদের বস-বাসের পথ খুঁজে দিয়েছেন, গণভাবে ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতীয়দের রক্ষার জন্য অনুরূপ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে উপজাতি রিজার্ভের অবশিষ্টাংশটুকু উপজাতি জনগণের জন্য অটুট (ইনটেক্ট) রাখতে উৎসাহ দেখাতে ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু ব্যর্থ হয়েছেন বলাটা ভুল হবে। সেই অবশিষ্ট উপজাতি রিজার্ভভুক্ত অঞ্চলের জমি যাতে অ-উপজাতীয়দের দখলে যেতে পারে তার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সাহায্য করেছেন।

উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তর বন্ধ করতে ত্রিপুরা সরকার আইন অনুযায়ী কোনরূপ সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অভাবের সময় অনশন মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচার তাগিদে বহু উপজাতি গরীব ও মাঝারি কৃষককে অল্পমূল্যে, চড়া সুদে বাঙ্গালী মহাজনদের কাছে জমি বন্ধক ও বিক্রয় করতে হয়েছে এবং হচ্ছে। সরকারের মহাজন ঘেঁষা - নীতি এবং উপজাতি স্বার্থ বিরোধী নীতিই এই অবস্থার জন্য মূলত দায়ী। তাই আজ উপজাতীরা সেই বে-আইনী হস্তান্তর জমি ফেরত চান। সেই জমি তাদের ফেরত দিতে হবে। এটা ন্যায়সঙ্গত, যুক্তিসঙ্গত ও আইনসঙ্গত। যারা বেআইনীভাবে উপজাতিদের জমি গ্রাস করল তাদের সেই জমিতে অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে কেন? আইনের বিধান কেন তাদের উপর প্রয়োগ করা হবে না? এ প্রশ্নের জবাব কংগ্রেস সরকারকে দিতেই হবে। ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রাম গঠন করে কংগ্রেস সরকারকে সে প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করতে হবে।

কেন ১৯৬০ সাল ঃ

ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ ১৯৫৪ সাল থেকেই উপজাতিদের জমি অ-উপজাতিদের নিকট হস্তান্তরের বিরোধিতা করে এসেছেন। ১৯৫৬ সালে গণমুক্তি পরিষদ কংগ্রেস সরকারের কাছে দাবী রেখেছেন যে আর যেন ত্রিপুরায় নতুন করে উদ্বাস্তু গ্রহণ না করা হয়। উদ্বাস্তু এলে যেন অন্যরাজ্যে নিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া হয়। কিন্তু কংগ্রেস সরকার সে দাবী মানেন নাই।

১৯৬০ সালে ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন পাস হয় পার্লামেন্টে। এবং

ত্রিপুরায় সে আইন চালু হয়। সেই আইনের ১৮৭ ধারায় উপজাতির জমি অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ করা হয়। সেই আইন অনুসারে ১৯৬০ সাল থেকে উপজাতির জমি আর অ-উপজাতির নিকট হস্তান্তর হতে পারে না। যা হয়েছে তা বে-আইনী। সেই বেআইনী হস্তান্তরিত জমি আইনগত ভাবেই উপজাতি মালিকদের ফেরত যোগ্য। তাই ১৯৬০ সাল থেকে বেআইনী হস্তান্তর জমি ফেরত চাই।

জমি ফেরত নেবার ক্ষেত্রে বাঙ্গালী জনসংখ্যা প্রধান এলাকার সাথে সংলগ্ন অঞ্চলের অ-উপজাতির গরীব কৃষকদের প্রশ্নটি বিবেচিত হবে। তাদের হস্তান্তরিত জমি আদৌ ফেরত নেয়া হবে কিনা, নিলেও কতটুকু নেওয়া হবে তা বিশেষভাবে বিবেচিত হবে। আমরা যান্ত্রিকভাবে আইন প্রয়োগের বিপক্ষে । তবে যা একবার হস্তান্তর হয়ে গেছে তা আর ফেরত নেওয়া যায় না, আমরা এই মতবাদেরও ঘোর বিরোধী। জমি ফেরতের আন্দোলনে অ-উপজাতীয় গরীব কৃষকের আতঙ্কের কারণ নাই। বরং এই আন্দোলনে সহযোগিতা করলেই দ্রুত তাদের সমস্যা সমাধানের পথ হবে।

উপজাতি রিজার্ভ কেন চাই ঃ

ত্রিপুরার উপজাতিরা প্রতিবেশী বাঙ্গালীদের চেয়ে অনেক ক্ষেত্রে অনগ্রসর। যারা কৃষিতে নেমেছেন, চাষ কাজে বাঙ্গালী কৃষকের চেয়ে তাদের অভিজ্ঞতা কম। একজন সাধারণ বাঙালী কৃষক জমিতে যে পরিমাণ ফসল উৎপাদন করতে পারেন, যে ভাবে জমির সদ্ব্যবহার করতে পারেন, সমপরিমাণ এবং সম উৎপাদিকা শক্তি সম্পন্ন জমিতে একজন উপজাতি কৃষক এখনো তা পারেন না। উৎপাদন কম হয়। সংসার চলে না। অভাবের তাড়নায় জমি হাত ছাড়া হয়ে যায়। জমিতে রক্ষাকবচ না থাকলে জমির প্রতিযোগিতায় উপজাতি কৃষকের পক্ষে জমি ধরে রাখা সম্ভব হবে না।

ত্রিপুরায় পাঁচ লক্ষাধিক উপজাতি আছে। এক লক্ষাধিক লোক এখনো জুমিয়া। উচু টিলায় জুম চাষ বাদে হলকৃষি তাদের নিকট এখনো একরকম অপরিচিত। অথচ মান্ধাতার আমলের অবৈজ্ঞানিক প্রথা জুম চাষের দ্বারা তাদের আর্থিক উন্নতি করা সম্ভবপর নয়। আবার রাতারাতি তাদের জুম জাষ থেকে সরিয়ে হলকৃষিতে প্রতিষ্ঠিত করাও সহজ নয়। তার জন্য শুধু মানসিক প্রস্তুতিই নয়। তাদের জন্য উপযুক্ত আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন। জুমিয়াদের মানসিক প্রস্তুতি গড়ে উঠলেও সরকারের দিক থেকে তার কোন পরিচর্য্যা নেই। উচা-নীচা টান জমিতে কয়েকশত টাকা সাহায্য দিয়ে জুমিয়াদের বসিয়ে দিলেই তারা রাতারাতি দক্ষ কৃষক হয়ে উঠতে পারেন না। দক্ষতা অর্জন সময় সাপেক্ষ এবং আর্থিক সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। অতীতে যে জুমিয়াদের কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে পুনর্বাসিন দেওয়া হয়েছে তাদের বেশীর ভাগই জমি ধরে রাখতে পারেন নাই। আবার জুমেই ফিরে যেতে হয়েছে। ফিরে গিয়ে বন দপ্তরের আক্রমণে লাঞ্ছিত হতে হচ্ছে। তাই রাষ্ট্র ও গণতান্ত্রিক মানুষের কর্তব্য হল এই কালের বিপাকে প্রতিকূল

পরিস্থিতিতে হাবুডুবু খাওয়া মানুষগুলোকে বাঁচানো। তাদের মুক্ত বাতাসে ডানা মেলতে দেওয়া। বর্তমান এবং ভবিষ্যতে বাঁচার প্রয়োজনেই ত্রিপুরার উপজাতিদের জন্য কতকগুলো নির্ধারিত ভূ-খন্ড সংরক্ষিত রাখতে হবে অগ্রসর জাতি ও গোষ্ঠীর কৃষক বা অকৃষকরা যাদের হাতে আর্থিক সম্বল আছে, যাদের কলাকৌশল বেশী, যাতে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের জমি আর গ্রাস করতেনা পারেন।

ত্রিপুরার মূল অধিবাসী উপজাতিরা আজ শোচনীয় সংখ্যালঘুতে পরিণত। ভিন্ন রাষ্ট্র বাংলাদেশ থেকে এখনো বাঙ্গালী হিন্দু জনসংখ্যার ত্রিপুরায় আগমন অব্যাহত। উগ্র বামপন্থী জাতীয়তাবাদী অংশের লোক এবং কংগ্রেস নেতৃত্ব এই আগমনকে রাজনৈতিক আশীর্বাদ মনে করেন। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ সমেত বাঙ্গালী শ্রমজীবী মানুষের রুজি রোজগারের পক্ষে এই ভিন দেশীয় লোকদের দলে দলে অনুপ্রবেশ যে নতুন সঙ্কট সৃষ্টি করছে, দিন মজুর ও ক্ষেত মজুরদের মজুরীর হার কমিয়ে দিচ্ছে সেদিকে সরকারের খেয়াল নাই। বড় জোতদার ও একচেটিয়া ঠিকেদারদের স্বার্থে তাদের সস্তায় মজুর সংগ্রহের পথ করে দিতে এই অনুপ্রবেশ বন্ধ করার ব্যাপারে কংগ্রেস সরকার সম্পূর্ণ নীরবতা অবলম্বন করছেন।

উপজাতি রিজার্ভ তুলে দেবার ফলে, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের পতিত ও খাসের জমি অ-উপজাতি ব্যক্তিদের দখল বন্ধ রাখার আইনগত ব্যবস্থা রহিতের ফলে এই নবাগতরা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলের পতিত ও খাসের জমি দখল করতে উৎসাহিত হবে। ফলে, ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বলে আর কিছু থাকবে না। সেটা হবে উপজাতিদের পক্ষে আত্মহত্যার সামিল। স্বাধীন বাংলাদেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করার পরও হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে মাঝে মাঝে সাম্প্রদায়িক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটবে না এমন কথা কেউ নিশ্চয় করে বলতে পারেন না। কাজেই বাংলাদেশ থেকে সময় সময় আরও হিন্দু বাঙ্গালীর ত্রিপুরায় অনুপ্রবেশের সম্ভাবনা শেষ হয়ে গেছে, এমন কথা কেউ বলতে পারেন না। ভিন্ন দেশীয় নাগরিকদের জন্য ত্রিপুরার মাটি চিরদিনের জন্য খোলা রাখা যায় না। এই পথ খোলা থাকলে ত্রিপুরায় ভূমি ব্যবস্থার উপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশ: আরও বৃদ্ধি পাবে। তার জন্য ত্রিপুরার প্রাচীনতম অধিবাসী উপজাতিরা কেন বলি হবেন? তাই উপজাতিদের জন্য কতকগুলি অঞ্চল এখনই সংরক্ষিত রাখতেই হবে। আর কোন অজুহাতেই সেই সংরক্ষিত অঞ্চলের জমিতে উপজাতি ব্যক্তি ভিন্ন অন্যদের থাবা বসানো চলবে না। পরিস্থিতি আয়ত্বের বাইরে যাবার আগেই, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবার আগেই, এই উপজাতি রিজার্ভ গঠন করতে হবে।

আর কোন অবস্থাতেই উপজাতি রিজার্ভ গঠনের কাজ বিলম্বিত করা যায় না। তাই এই দাবীতে আরও অধিকতর গণ ঐক্য গঠন করে দুর্বার গণ আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

উপজাতিদের প্রায় শতকরা ৯৯ জনই এখনো কৃষক. হাল চাষ ও জুম চাষ ছাড়া তাদের বাঁচার অন্য কোন জীবিকা নেই। তারা যে অন্য জীবিকা গ্রহণে কোন দিনই এগিয়ে আসবেন না এমন নয়। তবে তা সময় সাপেক্ষ। এখন পর্যন্ত দেখা গেছে যে উপজাতিদের যারাই পৈতৃক জমি -জমা বিক্রয় করে কিছু পয়সা হাতে নিয়ে দোকানদারী ঠিকেদারী ও ছোটখাট ব্যবসায়ে এগিয়ে এসেছেন অসম প্রতিযোগিতার ফলে আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও অভিজ্ঞতার অভাবে তাদের বেশীর ভাগই তাতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সর্বস্বান্ত হয়েছেন। এমনকি ক্ষুধে টি স্টল (চায়ের দোকান) টিকিয়ে রাখতেও বেশীর ভাগ সক্ষম হয়নি।

গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ত্রিপুরায় সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় এবং তার পরবর্তী সময় উপজাতিদের উদ্যোগে পাহাড় অঞ্চলে অনেকগুলি বাজার গড়ে উঠেছিল। মুক্তি পরিষদ প্রায় ক্ষেত্রেই ঐ বাজারগুলি পত্তনের কাজে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। উপজাতিদের ব্যবসায় ও দোকানদারীতে আকৃষ্ট করা এই বাজার সৃষ্টির অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে. প্রথম প্রথম উপজাতিরাই ঘর তুলে. চায়ের দোকান ও অন্যান্য মালের দোকান খুলে বসেন। এক বৎসর যেতে না যেতেই দেখা গেছে যে. তাদের দোকান ঘর ও ভিটগুলো বাঙ্গালী দোকানদার ও মহাজনদের হাতে চলে গেছে। এখন পর্যন্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা হল এই যে. আপাতত উপজাতিদের এক বৃহত্তম জন সংখ্যাকে কৃষিতেই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তার জন্য কতকগুলি নির্ধারিত ভূ-খন্ড কেবল মাত্র উপজাতিদের জন্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে। রিজার্ভ না রাখার অর্থ হবে বিরাট উপজাতি জনসমষ্টিকে ফাঁসির দড়িতে লটকানো।

উপজাতিদের জাতি গঠনের প্রক্রিয়াকে সাহায্য করার প্রয়োজনেই উপজাতি জন-সংখ্যাধিক্য আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রয়োজন। একই ভাষাভাষী গোষ্ঠীর লোক একটা নির্ধারিত ভূ-খন্ডে একত্রে বসবাস করার সুযোগ না থাকলে তার ভাষা সংস্কৃতি. রাজনীতিক. আর্থিক ও সামাজিক অবাধ বিকাশের সুযোগ থাকে না।

তার নিজস্ব মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার সুযোগ থাকে না। ফলে. সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসংখ্যার ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাজগতে প্রবেশ করতে তাদের বাধ্য হতে হয়। অথবা বাধ্য করা হয়। এই জুলুম নিঃসন্দেহে উপজাতীয় শিশুদের শিক্ষাজগতে প্রবেশের পথে পাহাড়-সম বাধা। উপজাতি এলাকার অখন্ডতা রক্ষিত হলে তাদের এলাকায় সকল স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হবে। যদি ত্রিপুরায় উপজাতি রিজার্ভ গঠন. উপজাতি জনসংখ্যাধিক্য আঞ্চলিক অখন্ডতার দাবী অস্বীকৃত হয়. তা হলে উপজাতিদের আপন জাতি সত্বা নিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রাথমিক প্রয়োজনকেই অস্বীকার করা হবে। মহারাজার উপজাতি রিজার্ভ বিলোপ, উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় অ-উপজাতীয় ব্যক্তিদের অবাধে জমি দখলের পথই খুলে দেওয়া হয়েছে। এর নির্গলিতার্থ হল-ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের অগ্রগতিকে

বাঁধা দেওয়া, জাতি গঠনের মূলে কুঠারাঘাত হানা। একাজই কংগ্রেস সরকার করে চলেছেন। ইহা নিঃসন্দেহে ত্রিপুরার একটা অতিপ্রাচীন ও মূল অধিবাসীদের মানুষের মত বেঁচে থাকার অধিকার কেড়ে নেওয়ারই ষড়যন্ত্র। তাঁদের প্রাচীন ঐতিহ্য ও মননভঙ্গী অনুসারে আত্মপ্রকাশের পথ রোধ করে দাঁড়ানো। ত্রিপুরার কোন অংশের গণতান্ত্রিক মানুষ এই ষড়যন্ত্রকারীদের সহ্য করতে পারেন না। বিকাশের পথে এগিয়ে যাওয়া একটা উপজাতি গোষ্ঠীকে ধীরে ধীরে পঙ্গু করে দিয়ে ক্রমশ: লুপ্ত করে দেবার জন্য যারা আজ গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত তাদের বিরুদ্ধে আজ রুখে দাঁড়াতে হবে। যে বাঙ্গালী জাতির শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক মানুষ নিজেরা আরও অধিকতর বিকশিত হতে চান, তাঁরা কেন উপজাতিদের এই বিকাশের দাবীগুলিকে সমর্থন করবেন না? উপজাতিরা কায়েমী স্বার্থের শাসন ও শোষণের সকল বন্ধন ছিঁড়ে ফেলতে চাইলে কেন তারা তাতে সমর্থন জানাবেন না? যারা নিজকে ভালবাসতে জানেন, তারা অন্যকেও ভালবাসতে জানেন। তাই, আমাদের দৃঢ়বিশ্বাস, বাঙ্গালী কৃষক শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি গণতান্ত্রিক মানুষ উপজাতিদের এই দাবী আদায়ের সংগ্রামে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

অটোনমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল কেন চাই

গত ২৮ বৎসরে কংগ্রেসের তথাকথিত গণতান্ত্রিক শাসনের চেহারা আমাদের কাছে খুবই পরিস্কার। কংগ্রেসের নেতা, মন্ত্রী এবং ভারপ্রাপ্ত সরকারী আমলারা উপজাতি কল্যাণ দপ্তরের অর্থ দু'হাতে লুণ্ঠন করেছেন। জুমিয়া পুনর্বাসন ও উপজাতীয়দের কল্যাণ খাতে বরাদ্দকৃত লক্ষ লক্ষ টাকায় কংগ্রেস মন্ত্রী, কংগ্রেস নেতা ও বি ডি ও, ট্রাইবেল ইন্সপেক্টর ও সুপারভাইজারদের আর্থিক পুনর্বাসন হয়েছে। তাদের অনেকেরই গাড়ী, জমি ও বাড়ী হয়েছে অথচ যে হতভাগ্য জুমিয়া ও গরীব উপজাতিদের উদ্দেশ্যে সেই অর্থ বরাদ্দ হয়েছে সেই জুমিয়াদের একটি পরিবারেরও অর্থনৈতিক পুনর্বাসন হল না। জুমিয়া, পূনর্বাসন. কৃষিঋণ, কৃষিদাদন, পতিত জমি উদ্ধার, কূপ খনন, পুকুর খনন, ব্যবসায়ী ঋণ, ফলের বাগান প্রকৃতি খাতে উপজাতিদের সাহায্য করার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা ত্রিপুরায় এসেছে। কিন্তু সাধারণ উপজাতি জনগণের অবস্থার উন্নতির পরিবর্তে আরও অবনতি ঘটেছে। এটাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, একটা অনগ্রসর জাতি বা উপজাতিকে বিকশিত করে তোলা, তার জাতীয় আশা আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপায়িত করে তোলা অন্য জাতি গোষ্ঠীর বুর্জোয়া শাসকদের কাজ নয়। সে দায়িত্ব উপজাতি গোষ্ঠীদের হাতেই ছেড়ে দিতে হবে। অন্যরা যতই উন্নত হউক, যতই নিত্য নূতন জ্ঞান বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হউক, অন্য জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর জাতীয় জীবন গঠনের হাল তারা ধরতে পারেন না। সেই জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর মনন ভঙ্গী ও জাতীয় আশা আকাঙ্খার সাথে সঠিকভাবে পরিচিত হয়ে সেগুলিকে আত্মস্থ করে নিয়ে নেতৃত্ব দিতে পারেন না। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও আন্তরিকতা কেবল সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করতে পারে।

ত্রিপুরার উপজাতিদের বিকাশ সাধনের হাল ধরতে হবে উপজাতিদেরই। সে সুযোগ তাদের দিতেই হবে।

উপজাতি জনগণের সক্রিয় ভূমিকা ও কর্মদ্যোগই ত্রিপুরার উপজাতিদের আত্ম-বিকাশের প্রক্রিয়াকে পরিপূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে। অন্য জাতি ও গোষ্ঠীর মিত্র শক্তিরা সেই প্রক্রিয়ার সহায়ক শক্তির ভূমিকা পালন করতে পারে মাত্র। মূল উদ্যোগ গ্রহণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা উপজাতি জনগণের হাতেই তুলে দিতে হবে। কারও অভিভাবকত্বে বা মোড়লীতে (Big brotherly advice) কোন জাতি ও উপজাতি বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না। নিপীড়িত ও পরাধীন জাতি মুক্তি লাভ করে না। এবং বড় জাতি ও উন্নত জাতি গোষ্ঠীর পুঁজিবাদী শ্রেণীর যাঁতাকলে পিষ্ট হয়ে পৃথিবীর অনেক ক্ষুদ্র ও অনগ্রসর জাতি বা উপজাতি গোষ্ঠীর বিলোপ ঘটার নজীর ইতিহাসে রয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে উপজাতি রিজার্ভ গঠন, উপজাতি জন সংখ্যাধিক্য আঞ্চলিক অখন্ডতা অটুট রাখা এবং অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল গঠন প্রভৃতির প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত জরুরী। এই দাবীগুলি পূরণ না হলে উপজাতি জনগণের উন্নতি সাধনের কর্মকান্ডে গণ উদ্যোগ সৃষ্টি করা এবং আংশিকভাবে হলেও উপজাতি জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হবে না। এই দাবীগুলোকে অস্বীকার করার অর্থ হবে — উপজাতিদের জাতিসত্ত্বাকে অস্বীকার করা। তারই পরিণতি হবে ত্রিপুরার প্রাচীনতম অধিবাসী উপজাতি এবং নবাগত বাঙ্গালী জনগণের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগী মনোভাব গড়ে তোলা, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি গড়ে তোলা এবং শ্রমজীবী মানুষের ঐক্য গড়ে তোলার পথে রুখে দাঁড়ানো। ' তুমি যদি আমার অস্তিত্ব স্বীকার না কর, তোমার অস্তিত্বই বা আমি স্বীকার করব কেন, তুমি যদি আমার গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকার না কর,আমিই বা তোমার সে অধিকার স্বীকার করব কেন, তুমি যদি আমাকে না ভালবাস, না শ্রদ্ধা কর, আমিই বা কেন তোমাকে ভালবাসব, কেন তোমাকে শ্রদ্ধা করব ' উপজাতি সাধারণ মানুষের মনেএই প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হতে পারে। ফলে তারা বাঙ্গালী শ্রমজীবী ও গণতান্ত্রিক জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকতে চাইবেন। ফলে, উপজাতি শ্রমজীবী মানুষকে জোর করে বিচ্ছিন্নতার দিকে ঠেলে দেওয়া হবে। দেশের গণতান্ত্রিক মানুষ এ কাজ করতে পারেন না। তাই তাদের দরকার— আজ উপজাতিদের বাঁচার ন্যায়সঙ্গত দাবীকে স্বীকার করে সংগ্রামে এগিয়ে আসা। আমরা এ কথাও বলব যে, আজ উপজাতিদের যে অংশ বাঙ্গালীদের প্রতি সন্দিগ্ধ হয়ে উঠেছেন, বাঙ্গালী গণতান্ত্রিক মানুষের প্রতি আস্থা স্থাপন করতে পারছেন না, তারাও একদিন বাঙ্গালী কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষের সাথে সম-স্বার্থ ও সহ যোদ্ধার মনোভাব নিয়ে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামে এসে দাঁড়াবেন। যে দিন তারা দেখবেন যে, বাঙ্গালী কৃষক, শ্রমিকও মধ্যবিত্ত প্রভৃতি শ্রমজীবী মানুষ উপজাতিদের দাবীর বিরোধিতা করছেন না বরং ঐ দাবী আদায়ের জন্য উপজাতি জনগণের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামের ময়দানে নামছেন। সেদিন তাঁরাও আজিকার সঙ্কীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচ্ছিন্নতার ঝোঁক

ঝেড়ে ফেলে ঐক্যবদ্ধ গণসংগ্রামে সামিল হবেন।

সেই সুস্থ আবহাওয়া সৃষ্টির জন্যই আমরা ত্রিপুরার পাহাড়ী ও বাঙ্গালী সকল অংশের জনগণকে উপরোক্ত দাবীতে আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতে আহ্বান জানাই।

কেন মাতৃভাষায় শিক্ষা চাই

ত্রিপুরার বৃহত্তম উপজাতি গোষ্ঠীর মাতৃভাষা কগবরককে লিখিত রূপে উত্তরণের কাজ আর বিলম্ব করা চলে না। কগবরকের মাধ্যমে কগবরক ভাষী ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনই চালু করতে হবে। প্রত্যেক জাতি ও গোষ্ঠীর ব্যক্তিদের সহজ ও সাবলীল গতিতে ভাব প্রকাশের এবং চিন্তা শক্তির উন্মেষ সাধনের সহজ সোপান হল তার মাতৃভাষা। ইংরেজী ভাষায় গল্প, কবিতা, উপন্যাস লিখে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বঙ্কিচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কথা শিল্পী শরৎ চ্যাটার্জির মত প্রতিভাশালী ব্যক্তিরাও তাদের প্রতিভার পূর্ণ স্ফূরণ ঘটাতে সক্ষম হতেন কিনা বলা শক্ত।

কগবরক ভাষা কত সম্পদশালী তার শব্দসম্ভার কত সমৃদ্ধ এখন তা বিচার্য্য বিষয় নয়। প্রাথমিক অবস্থায় কোন ভাষাই সমৃদ্ধ হয়ে থাকে না। অনুশীলনের মধ্যে কগবরক ভাষার লিখিত রূপ দেবার জন্য সরকারকে এখনই এগিয়ে আসতে হবে। কগবরককে ত্রিপুরার অন্যতম সরকারী ভাষার মর্য্যাদা দিতে হবে। কগবরকের মাধ্যমে কগবরক ভাষী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা এখনই চালু করতে হবে।

সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলুন

উপজাতি ও বাঙ্গালী শ্রমজীবী মানুষের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেই উপজাতিদের এই চার দফা দাবী আদায় করতে হবে। উপজাতি ও বাঙ্গালী শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে একে অন্যের বিরুদ্ধে রণহুঙ্কার দিয়ে উপজাতিদের দাবীগুলি পূরণ করা যাবে না-- এই বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী প্রত্যেক উপজাতি দরদীদের গ্রহণ করতে হবে। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, উপজাতি যুব ফেডারেশন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি, কৃষক সভা, ভারতের ছাত্র ফেডারেশন, গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন, সি আই টি ইউ, গণতান্ত্রিক নারী সমিতি ও শান্তি সেনা প্রভৃতি সংগ্রামী সংগঠনগুলি ঐক্যবদ্ধ মোর্চা গঠন করে এই চার দফা দাবী আদায়ের সংগ্রামের ডাক দিয়েছেন। সেই সংগ্রামে সামিল হয়ে উপজাতিদের রক্ষা কবচ মূলক এই চার দফা দাবীর সংগ্রাম সাফল্যমন্ডিত করে তুলতে আমরা ত্রিপুরার সকল জাতি ও উপজাতির জনগণের প্রতি সংগ্রামী আহ্বান জানাচ্ছি।

রাজধানীতে মুক্তি পরিষদের প্রথম মিছিল

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দের ৩০শে শ্রাবণ ত্রিপুরার রাজনৈতিক আন্দোলনের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় দিবস। সেদিন ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে পনের হাজার সুসংগঠিত উপজাতি জনতার এক বিশাল মিছিল দুর্গাচৌধুরী পাড়া থেকে রওয়ানা হয়ে আগরতলা শহর পরিক্রমা করেছিল। উমাকান্ত একাডেমীর মাঠে প্রায় আধঘন্টার মত জনসভা করে ফিরে এসেছিল। সরকারের কোপানলে পতিত, বস্তুতঃ বেআইনী সংগঠনের নেতৃত্বে পরিচালিত ত্রিপুরার ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম সুসংগঠিত বড় মিছিল। এই মিছিলের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল — এই মিছিল তাদেরই দ্বারা সংগঠিত যাদের গ্রেপ্তার করতে কংগ্রেস সরকারের সামরিক বাহিনী পাগলা কুকুরের মত উপজাতীয়দের পাড়ায় পাড়ায় হামলা চালিয়ে যাচ্ছিল। এই মিছিল হল তাদেরই মিছিল যারা মুক্তি পরিষদের আত্মগোপণকারী নেতাদের পুলিশের কাছে তুলে না দেবার অপরাধে, তাদের গ্রেপ্তার করতে পুলিশকে সাহায্য না করার অপরাধে দিনের পর দিন পুলিশ ও মিলিটারীর হাতে লাঞ্ছিত, নির্যাতিত ও লুন্ঠিত হচ্ছিলেন।

এই মিছিলে আওয়াজ উঠেছিল ঃ — ত্রিপুরাব প্রজার ভোটে সরকার চাই, দেওয়ানী শাসন দূর হও। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা বাতিল কর, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি চাই; গ্রামে গ্রামে সশস্ত্র বাহিনীর হানা বন্ধ কর; হামলা চালিয়ে উপজাতীয় ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষার সুযোগ কেড়ে নেওয়া চলবে না। উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করা চলবে না। এখানে বলা আবশ্যক যে তখন দশরথ দেব, সুধন্বা দেবর্মা, হেমন্ত দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মার নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ঝুলছিল। বীরেন দত্ত, প্রভাত রায়,বংশী ঠাকুর, দেব প্রসাদ সেন, কানু সেনগুপ্ত প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্মীরা নিরাপত্তা আইনে জেলে আটক ছিলেন। প্রভাত রায় এবং বংশী ঠাকুর এই দুই ব্যক্তি ভিন্ন বাকীরা সকলেই কমিউনিস্ট পার্টিব সদস্য ছিলেন।

মিছিলের প্রস্তুতি

মুক্তি পরিষদের কর্মীরা প্রায় এক মাস ধরে অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এই মিছিল সংগঠিত করতে। সদর এবং খোয়াই এই দুই বিভাগের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছিল এই সমাবেশের। কমলপুরেও এই সমাবেশের জন্য কিছুটা প্রচার চলে। সেখান থেকে কিছু লোক এই সমাবেশে যোগদান করেন। তখন ত্রিপুরার অভ্যন্তরে যাতায়াতের যানবাহন ছিল না। অধিকাংশ পার্বত্য রাস্তাই ঘন জঙ্গলের মাঝ দিয়ে চলে যেত। এখন

টেষ্ট রিলিফের কল্যাণে অভ্যন্তরে ও অনেক গাঁয়ে চলার ভাল রাস্তা তৈরী হয়েছে। যে কয়টি সদর সড়ক ছিল সেগুলি এড়িয়েই মুক্তি পরিষদের কর্মীদের চলতে হত। কাজেই পাহাড় পর্বত ডিঙ্গানো ছাড়া কর্মীদের সংগঠন পরিচালনা করার কোন সহজ পথ ছিল না। অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে এই অভিযানের প্রস্তুতি চালানো হয়েছিল। কারা এই মিছিলে যোগদান করবেন, গোপনে গোপনে তাদের তালিকা প্রস্তুত হতে থাকে। প্রতিটি গ্রামের অগ্রগামী অংশের ব্যক্তিদের সাথে আলাপ আলোচনাক্রমেই এই তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছিল। কিন্তু বিশিষ্ট বিশিষ্ট কর্মীরা ব্যতীত এই মিছিলের তারিখ এবং মিছিলে রওয়ানা হবার আগের দিন ছাড়া কোথায় গিয়ে একত্রিত হতে হবে তা অন্য কারও নিকট প্রকাশ করা হয় নাই। কেবল রওয়ানা হবার আগের দিন জানানো হয়। এই গোপনীয়তা রক্ষার জন্য সাংগঠনিকভাবে খুব প্রচেষ্টা নেওয়া হয়। আমাদের সংগঠকদের বাইরের কাক পক্ষীও যাতে জানতে না পারে তৎ প্রতি বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়। যাতে শত্রুপক্ষ (সরকার পক্ষ) আমাদের মিছিলের কথা পূর্বাহ্নে জেনে সশস্ত্র পুলিশ ও মিলিটারীর সাহায্যে আমাদের মিছিল আগরতলা শহরে প্রবেশের গতিরোধ করে দিতে না পারে তারই জন্য এই সতর্কতা। কাজ হাসিল না হওয়ার আগে শত্রু পক্ষকে অজ্ঞ রাখার তাগিদেই এই অতি সাবধানতা অবলম্বন করা হয়েছিল। আগরতলা শহরে মিছিল নিয়ে যেতেই হবে এই ছিল আমাদের দৃঢ় সংকল্প। সরকার টের পেলে এই মিছিলের পথ অবরোধ করতে পারে এ আশঙ্কা উদ্যোক্তাদের মধ্যে দারুণভাবে ক্রিয়া

এই প্রস্তুতির কথা গোপন রাখা গিয়েছিল এই কারণে যে, যে তিনটি বিভাগে মিছিলের প্রস্তুতি চালানো হয়েছিল সেই তিনটি বিভাগের সাধারণ জনগণকে কংগ্রেস সরকার উপজাতি জনতার শত্রু এই ধারণা দেওয়া গিয়েছিল। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে সাফল্য অর্জন করতে হলে, আমাদের সংগ্রাম কৌশল শত্রুপক্ষকে পূর্বাহ্নে জানতে দিতে নেই, এই সাধারণ সতর্কতাবোধ কর্মী এবং সমর্থক জনতার এক বড় অংশকে বুঝাতে পেরেছিলাম। তাছাড়া ত্রিপুরা সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতীয়রা, অর্থাৎ গ্রামের দেববর্মারা মুক্তি পরিষদের আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে মুক্তি পরিষদের ডাকে আন্তরিকভাবে সাড়া দিয়েছিলেন। এই মিছিলে দেববর্মা গোষ্ঠিভুক্ত উপজাতীয় জনতা ছাড়া অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত উপজাতীয় ব্যক্তির সংখ্যা প্রায় নাই বললেও চলে। কেননা, অন্যান্য সম্প্রদায়ের উপজাতীয়দের মধ্যে মুক্তি পরিষদের সংগঠকরা তখন পর্যন্ত প্রবেশ করে নাই।

মুক্তি পরিষদের আত্মগোপনকারী নেতৃত্ব আপন অস্তিত্ব ও সংগঠনের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই যেখানে সেখানে মুক্তি পরিষদের সংগঠন গড়া হয়েছিল বা হচ্ছিল সেই

এলাকা বা পাড়ার নরনারীদের কাছে আবাল বৃদ্ধবণিতা মুক্তি পরিষদের কর্মীদের গতিবিধি ও যাবতীয় কাজকর্ম সম্পর্কে অত্যন্ত গোপনীয়তা রক্ষা করে চলার প্রয়োজনীয়তার উপর বেশী জোর দিতে হয়েছিল। জনগণও এই গোপনীয়তা রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। পরিষদের কার্যকলাপ ও কর্মীদের গতিবিধি সম্পর্কে আপন স্ত্রীকেও বলা নিষিদ্ধ ছিল। জনমতও এই বৈপ্লবিক সতর্কতা আপন চোখের মণির মত রক্ষা করে চলতেন। তাই, উপজাতীয়, এলাকাগুলিতে ব্যাপক ভাবে মিছিলে প্রস্তুতি চলতে থাকলেও মিছিল আগরতলা শহরের উপকণ্ঠে পৌঁছার পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত সরকার বা সংগঠনের বাইরের কেহ জানতে পারে নাই।

মিছিলের আগের রাত্রে দুর্গাচৌধুরী পাড়ায় বিভিন্ন এলাকার নেতৃস্থানীয় কর্মীদের এক সংক্ষিপ্ত বৈঠক হয়। যতটুকু মনে পড়ে সেই বৈঠকে কমরেড সুধন্বা দেববর্মা, কমরেড হেমন্ত দেববর্মা,কমরেড অঘোর দেববর্মা ও কমরেড রবীন্দ্র দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন। তাছাড়াও বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত বিশিষ্ট কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। আলোচনার বিষয়বস্তু ছিল— এই মিছিল পরিচালনা। সকল নেতৃস্থানীয় কর্মীরাই মিছিলের সাথে যেতে চেয়েছিলেন। কর্মীদের থেকে বাধা উঠল। প্রস্তাব এল— নেতাদের মিছিলের সাথে যাওয়া ঠিক হবে না। আমাকে এবং কমরেড সুধন্বা দেববর্মাকে কিছুতেই এই মিছিলে যেতে দেওয়া হবে না কর্মীদের এটাই বক্তব্য। যুক্তিটি খুবই জোরালো। এক মিছিলেই আন্দোলনের শেষ নয়। আরো বৃহত্তর সংগ্রামের প্রস্তুতি চালানো হবে। মিছিল পরিচালনা করতে গিয়ে সকল নেতাই যদি এক সাথে গ্রেপ্তার হয়ে যান, তাহলে সংগঠনের দারুণ ক্ষতি হবে। জনতা নেতৃত্ববিহীন হয়ে পড়বেন। আমাদের (নেতৃস্থানীয়দের) বক্তব্য ছিল যে, নেতাদের কেউ না কেউ মিছিলের সাথে থাকতেই হবে। এত বড় একটা মিছিল নেতৃত্ববিহীন অবস্থায় শত্রুর শিবিরে পাঠানো যায় না। শত্রু পক্ষ যদি আঘাত করে, পথে যদি কোন জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তাহলে জনগণকে উপস্থিত নেতৃত্ব দেবার লোক থাকবে না। ফলে জনতা বিভ্রান্ত হতে পারেন। শেষ পর্যন্ত সিদ্ধান্ত হয় যে, কমরেড হেমন্ত দেববর্মা, কমরেড অঘোর দেববর্মা মিছিলের সাথে যাবেন। এটাও সিদ্ধান্ত হয় যে, তাঁরাও মিছিলের পুরোভাগে থাকবেন না। পুরোভাগে থাকবেন অন্য কর্মীরা। তাঁরা মিছিলের জনতার সাথে মিশে থাকবেন যাতে শত্রুপক্ষ তাদের উপস্থিতি সহজে টের না পায়। বেশীর ভাগ কর্মীদের বিরোধিতা সত্ত্বেও এবং জনগণের এক অংশের নিমরাজী মনোভাব সত্ত্বেও আমাদের এই বিপদের ঝুঁকি নিতে হয়েছিল। কমরেড অঘোর দেববর্মা এবং কমরেড হেমন্ত দেববর্মাও উৎসাহের সহিত এই দায়িত্ব গ্রহণে রাজী হয়েছিলেন।

সেই দিন রাত্রেই এই সিদ্ধান্ত প্রতিটি মিছিলের অভিযাত্রীরা স্বাগত জানান। যে সব কর্মীরা কোন নেতাকে মিছিলের সাথে যেতে আপত্তি করেছিলেন তাদের কাছে উপরে বর্ণিত কারণগুলির বাদেও আর একটি কারণ তুলে ধরা হয়। বলা হয় যে, মিছিলের অভিযাত্রীদের মধ্যে এমন কিছু লোক থাকতে পারেন যারা বাঙ্গালীদের ভাল চোখে দেখেন না। যাদের ধারণা ত্রিপুরার বাঙ্গালীদের মদত পেয়েই কংগ্রেস সরকার ত্রিপুরার আদিম আধিবাসী উপজাতিদের ধ্বংস করার জন্য গ্রামে গ্রামে পুলিশ মিলিটারী লেলিয়ে দিয়েছে। আমাদের মধ্যে যে কয়েক জন যুবক উচ্চশিক্ষা লাভ করে উপজাতীয়দের স্বার্থ রক্ষার জন্য উপজাতীয়দের অগ্রগতির স্বপক্ষে মুখ খুলেছেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে উপজাতীয় ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার ব্যবস্থা করছেন, উপজাতীয়দের প্রথম শিক্ষা প্রাপ্ত এই অগ্রণী অংশকে গ্রেপ্তার করে, তাদের খুন করে তাদের কর্মপ্রচেষ্টাকে , অঙ্কুরেই বিনষ্ট করে তাঁরা ত্রিপুরার উপজাতীয়দের ' যে তিমিরে সেই তিমিরেই' রাখতে চায়। বাঙ্গালীদের স্বার্থেই বাঙ্গালী কুক্ষিগত ত্রিপুরার নূতন 'দেওয়ানী সরকার' তা করছেন। কাজেই এত বড় একটা জনশক্তি পেয়ে স্বতঃস্ফূর্ত সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধনে বশীভূত হয়ে ফেরার পথে কেউ যদি দোকান লুট করে বসে, বা পথচারী বাঙ্গালীদের গায়ে হাত দিয়ে বসে, কিংবা গ্রাম গ্রামে হানা দিয়ে, জোর জুলুম্ করে জনগণের উপর দমনপীড়নমূলক কার্যকলাপ চালায়। পুলিশ ইতিমধ্যেই উপজাতীয়দের মনে এত বেশী ঘৃণার পাত্র হয়ে উঠেছিল যে রাস্তার পার্শ্বে খাকী পোযাক পরা পুলিশ দেখলে উত্তেজিত জনতার কেউ কেউ তুমুলকান্ড বাঁধিয়ে দিতে পারেন। কাজেই, নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যে কারও না কারও মিছিলের সাথে থাকতেই হবে। তখন পরিচিত নেতা বলতে দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত এবং অঘোরই ছিলেন। আমাদের এই বক্তব্যগুলি কর্মীরা জনগণের শিবিরে শিবিরে পৌঁছে দিয়েছিলেন।

৩০ শে শ্রাবণ বেলা ৯টায় মিছিলের জনতা দুর্গাচৌধুরী পাড়ার স্কুল মাঠে সমবেত হন। ডাল, চাল, রান্নার বাসন পত্র ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য সামগ্রীর গাট্রি বোচকা কাঁধে নিয়েই মিছিলের জনতা মাঠে এসে দাঁড়ান। মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জনতার সামনে আমি সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখি। সেই বক্তব্যের সারমর্ম প্রধানতঃ নিম্নরূপ ঃ

" বন্ধুগণ, আমরা আজ সংগঠিতভাবে আগরতলা শহরে যাচ্ছি সরকারকে দৃঢ়তার সাথে আমাদের দাবী জানাতে। মনে রাখবেন ঃ আজ আমরা প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করতে যাচ্ছি না। সঙ্গে সঙ্গে এটাও সরকারকে জানাতে যাচ্ছি যে, আমরা আজ পরস্পর পরস্পরের সহিত বিচ্ছিন্ন যূথভ্রষ্ট উপজাতি গোষ্ঠী নই। আমরা আজ ঐক্যবদ্ধ। আমরা সরকারের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ চাই না। আপোষের মাধ্যমেই আমাদের দাবী পেতে চাই,

তাই, শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে এসেছি। বন্ধুগণ এটাও মনে রাখতে হবে যে, যদি সরকার আমাদের দুর্বল মনে করে আমাদের দাবী না দিয়ে আমাদের উপর নির্যাতন চালিয়ে আমাদের ধ্বংস করার পথ অনুসরণ করেন তা হলে এটাই হবে মুক্তি পরিষদের অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ উপজাতীয় জনগণের প্রথম এবং শেষ শান্তিপূর্ণ মিছিল। এরপর আমরাও আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম চালাবো। আমাদের আত্মরক্ষার অধিকার আছে। সেই অধিকার আমরা কাউকেই কেড়ে নিতে দেবো না।

বন্ধুগণ, এই মিছিলে আমাদের দুইজন সম্মুখ সারির নেতা, হেমন্ত দেববর্মা ও অঘোর দেববর্মা আপনাদের সাথে যাচ্ছেন। আগরতলা শহরে মিছিল শেষ হবার পর আপনারা যার যার বাড়ী মুখী না হয়ে,কমরেড হেমন্ত দেববর্মা এবং অঘোর দেববর্মাকে দুর্গাচৌধুরী পাড়া পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাবেন অথবা এই দুইজন নেতাকে শত্রুর দুর্গ থেকে নিরাপদে আমাদের দুর্গ পৌঁছিয়ে দিয়ে যাবেন। এ দায়িত্ব আপনাদের। পথে কারও ক্ষতি করবেন না। সকাল ৮টার মধ্যে আপনারা কিছু খেয়েছেন। মিছিল থেকে ফিরতে আপনাদের দেরী হবে। ক্ষুধা লাগবে। তা সত্ত্বেও দোকানে চিড়া, মুড়ী কিনবার জন্য কোথাও দাঁড়াবেন না। যূথভ্রষ্ট হবেন না। তাতে মিছিল মাঝপথে ছত্র- ভঙ্গ হবে। শত্রু সুযোগ পাবে নেতাও কর্মীদের গ্রেপ্তার করতে।

কমরেডগণ, ক্ষুধার তাড়নায় কাতর হয়ে ফেরাব পথে কারও দোকান লুট করবেন না। কারও গাছের ফল পাড়বেন না। তাতে আমাদের জনগণের অপ্রিয়ভাজন হতে হবে। তাতে সংগ্রামের ক্ষতি হবে। আমরা সংগ্রামের সৈনিক। জনগণের সহযোগিতা এবং অকৃত্রিম বন্ধুত্বের উপর নির্ভর করছে আমাদের অস্তিত্ব ও সংগ্রামের সাফল্য।

বন্ধুগণ, আমি আবারও বলছি যে, আমরা শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল করতে যাচ্ছি। মনে রাখবেন হেমন্ত ও অঘোরকে ফিরিয়ে আনার দায়িত্ব আপনাদের। শত্রুপক্ষ তাদের আটক রাখবার চেষ্টা করতে পারে। শত্রুর কবল থেকে তাদের ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করতে হবে। আশা করব, যে গুরুদায়িত্ব আজ আপনাদের উপর দেওয়া হলো তা আপনারা সম্পাদন করে আসতে পারবেন। জয় আমাদের অনিবার্য। (এই বক্তব্যগুলি কগবরকে (ত্রিপুরী ভাষায়) রাখা হয়েছিল।')

এই মিছিল সুশৃঙ্খলভাবে আগরতলা শহর পরিক্রমা করে ফিরে এসেছিল। আগরতলা উমাকান্ত একাডেমীর মাঠে স্বল্পক্ষণের জন্য সমবেত জনসভায় কমরেড অঘোর দেববর্মা এবং হেমন্ত দেববর্মা ভাষণ দিয়েছিলেন। তাতেই পুলিশ তাদের উপস্থিত টের পায়। জনসভা সমাপ্ত করে মিছিল সহকারে প্রত্যাবর্তনের পথে আগরতলা শহরে পুলিশ কমরেড

অঘোর এবং হেমন্তকে পাকড়াও করার প্রচেষ্টা নেয়। জনতা তড়িৎ গতিতে বিরাট বেষ্টনী রচনা করে তাদের রক্ষা করে প্রত্যাবর্তন করেন। পুলিশের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। এই মিছিলের সাফল্যে কর্মী এবং জনতার আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়।

এখানে বলা দরকার যে, উমাকান্ত একাডেমীর ময়দানে জনসভা করার সিদ্ধান্ত মুক্তি পরিষদের ছিল না। পরিস্থিতি দেখে কমরেড অঘোর ও হেমন্ত উপস্থিত সিদ্ধান্ত নেন। ফলাফল ভালই হয়েছে।

তবু পরবর্তী সময়ে আমরা এই দুইজন কমরেডকে মৃদু সমালোচনা করেছি। প্রথমত: শত্রুপক্ষ প্রস্তুত থাকলে এই জনসভা করাকালীন শত্রু আরো প্রস্তুতি নিতে পারত। অবস্থা ঘোরালো করে তুলতে পারত। ঘটনা আমাদের আয়ত্বের বাইরে চলে যেতে পারত। শত্রু পক্ষের অপ্রস্তুতিতে অবস্থা আমাদের আয়ত্বের মধ্যে ছিল। ব্যক্তিগত ভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমরা এই দুই নেতার সমালোচনা করেছিলাম। ব্যক্তিগত ভাবে একটা কিছু বীরোচিত কাজের ঝোঁকের বশবর্তী না হবার জন্য তাঁদের অনুরোধ করেছিলাম। এ ধরনের ঝোঁক সংগ্রামের সাধারণ নীতিবিরোধী।

এই মিছিলে সক্রিয়ভাবে উপজাতি জনগণের এত ব্যাপক হারে উৎসাহ ও উদ্দীপনা নিয়ে অংশ গ্রহণের স্বপক্ষে কতগুলি ঘটনা কাজ করেছিল। যেমন জনশিক্ষা সমিতির শিক্ষা সম্পর্কে আন্দোলন পাহাড় অঞ্চলের উপজাতীয়দের এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে জাতীয়তাবোধ জাগিয়ে তুলেছিল। তাঁরা আপন ঐতিহ্যের ভিত্তিতে একটা পৃথক জাতিসত্বা নিয়ে আত্মপ্রকাশের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেন। উপজাতীয়দের আবহমান কাল থেকে চলে আসা নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে উপজাতীয় সমাজকে মুক্ত করবার চেতনা আত্মপ্রকাশ করেছিল। জনশিক্ষা সমিতির কর্মীরা গ্রামে গ্রামে প্রাইমারী স্কুল গড়ে তুলে উপজাতীয় বালক বালিকাদের নিরক্ষরতা দূর করার জন্য যে কাজ শুরু করেছিলেন তাতে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃস্থানীয়দের উপজাতীয়দের পথ প্রদর্শকরূপে উপজাতীয়দের এক উল্লেখযোগ্য অংশের লোক দেখতে শুরু করেছিলেন। রাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর নাবালক কিরীট বিক্রমের মাতা কাঞ্চনপ্রভা দেবীকে চেয়ারম্যান করে ত্রিপুরার শাসন কার্য পরিচালনা করার জন্য যে রিজেন্সী কাউন্সিল গঠন করা হয়েছিল তাতে কাঞ্চন প্রভা দেবী চেয়ারম্যান রূপে নামে মাত্র শাসন ক্ষমতার সর্বাধিকারিনী (Titular head) ছিলেন। প্রকৃত শাসন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দিল্লী থেকে নেহেরু সরকার কর্তৃক প্রেরিত দেওয়ান উপাধিধারী ব্যক্তিটি। প্রথম দেওয়ান হয়ে এসেই এ ভি মুখার্জী কমিউনিস্ট দমনের নামে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃবৃন্দের উপর আঘাত হানেন। দেওয়ানী

শাসন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তনের কিছু কাল পরেই অর্থাৎ ১৯৪৮ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি বেআইনী ঘোষিত হবার সাথে সাথেই ত্রিপুরার পরিচিত কমিউনিস্টদের গ্রেপ্তার করা হয়। কমিউনিস্টদের সঙ্গে যোগসাজস রয়েছে এই অভিযোগে বা সন্দেহে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের গ্রেপ্তারের প্রচেষ্টা চালানো হয়। জনশিক্ষা সমিতির প্রেসিডেন্ট, ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে সুধন্বা দেববর্মা, দশরথ দেব এবং হেমন্ত দেববর্মাকে গ্রেপ্তারের ওয়ারেন্ট জারী করা হয়। এ খবরে ত্রিপুরার উপজাতীয় জনগণ বিক্ষুব্ধ হন। তাদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে উপজাতি পাড়াগুলিতে সশস্ত্র পুলিশের তৎপরতা বেড়ে যায়। তাদের তল্লাসীর নামে উপজাতি জনগণের উপর হয়রানী তীব্রতর হতে থাকে। সশস্ত্র পুলিশ উপজাতি পাড়াগুলিতে হানা দিয়ে গ্রামবাসীদের উপর ধমক দিতে থাকে। এমন কি বাজারে, রাস্তায় উপজাতিয় ব্যক্তি দেখলেই পুলিশ তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করতে থাকে এই বলে 'দশরথ, সুধন্বা, হেমন্ত , অঘোর কোথায়? তাদের ধরে দিতে হবে। নইলে, তোদের পাহাড় ধ্বংস করে দেবো'। তাছাড়া রাজার আমলের সম্মানিত উপজাতীয় সর্দ্দারদের সাথে পুলিশ স্থানে স্থানে খুব দুর্ব্যবহার করে। আত্মগোপনকারীদের ধরিয়ে দেবার জন্য তাদের অপমানিত করে। ঐ সব ঘটনাপ্রবাহ ত্রিপুরার উপজাতীয়দের জাতীয় মর্য্যাদায় দারুণ আঘাত হানে। জনশিক্ষা সমিতির উদ্যোগে গঠিত এবং পরিচালিত স্কুলগুলির উপর সরকারের পুলিশ মিলিটারীর হামলায় উপজাতীয়দের শিক্ষার পথে এক অচল অবস্থা সৃষ্টির আশংকায় উপজাতি জনতা শঙ্কিত হয়ে উঠেন। রাজভক্ত উপজাতি সর্দারগণ রাজার মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের অবসান এবং দেওয়ানী শাসন প্রবর্ত্তনে স্বভাবতই বিক্ষুব্ধ ও বিভ্রান্ত, তার উপর উপজাতীয়দের উপর এই ধরণের নগ্ন আক্রমণে তারা উত্তেজিত হয়ে উঠেন। কাজেই, মুক্তি পরিষদের এই বিক্ষোভ সমূহকে কাজে লাগায়। অন্যান্য অর্থনৈতিক কারণগুলির চেয়েও এই রাজনৈতিক কারণগুলি উপজাতীয়দের আরো বেশী উত্তেজিত ও বিক্ষুব্ধ করে তুলে। রাজতন্ত্রের প্রতি কোনরূপ মোহ সৃষ্টি না করে উপজাতীয়দের অনগ্রসরতার ও দারিদ্র্যের জন্য রাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ দায়ী করে এবং নূতন কংগ্রেস সরকারও সেই পথেরই পথিক অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারও বিরাট সংখ্যক উপজাতীয়দের আরও চরম দারিদ্র্যের দিকে নিয়ে যাবে এই বক্তব্য সমূহ উপস্থিত করে বিক্ষুব্ধ উপজাতীয়দের প্রগতিশীল আন্দোলনে সংগঠিত করার দিকে মুক্তি পরিষদ তৎপর হয়ে উঠে। তাই, এই ৩০শে শ্রাবণের (১৫ই আগষ্ট) মিছিল অত্যাচারী কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে উপজাতীয়দের একটি অভূতপূর্ব প্রচন্ড জাতীয় বিক্ষোভের আকার ধারণ করে।

সংগঠন গড়ার তৎপরতা

এই মিছিলের পর সংগঠন গড়ার কাজে মুক্তি পরিষদ আরো অধিকতর তৎপর হয়ে উঠে। সংগঠন আরো মজবুত হতে থাকে। অপর পক্ষে কংগ্রেস সরকারের দমন পীড়নমূলক কার্যকিলাপও আরো তীব্রতর হতে থাকে। ফলে, উপজাতীয় জনগণের বিক্ষোভ আরও বাড়তে থাকে।

১৯৪৮ সালেই ত্রিপুরায় ভয়াবহ গো-মড়ক দেখা দেয়। সদর এবং খোয়াই অঞ্চলে এই গো-মড়ক ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে। এত ব্যাপকভাবে গরু মহিষ মরে যে শকুনে খেয়ে শেষ করতে পারে নাই। পঁচা গন্ধে গ্রামাঞ্চলের রাস্তাঘাটে চলাফেরা করা দুস্কর হয়ে উঠে। হালের বলদের অভাবে স্থানে স্থানে বহু চাষের জমি খিল(পতিত) পড়ে থাকে। ফসল কম হয়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রূপে পাহাড়ে খাদ্য সংকট তীব্র আকার ধারণ করে। মুক্তি পরিষদ এই গোমড়ক প্রতিষেধক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবী উত্থাপন করেছিল। কিন্তু এর প্রতিবিধানে সরকারের নিস্ক্রিয়তা কৃষকদের আরো বিক্ষুব্ধ করে তোলে। তখন গুপ্তভাবে প্রকাশিত মুক্তি পরিষদের মুখপত্র বার্তা পত্রিকায় এই গো-মড়কের ব্যাপকতা এবং ইহার প্রতিকারে সরকারের উদাসীনতার তীব্র সমালোচনা মূলক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। (প্রবন্ধটি বকলমে আমারই লেখা)। এই ভাবে কংগ্রেস সরকারের উপজাতি স্বার্থ বিরোধী নীতি ও কার্যকিলাপের নগ্নরূপ জনসমক্ষে তুলে ধরে আমরা মুক্তি পরিষদ সংগঠনের কাজে অগ্রসর হতে থাকি।

এরপর এল ২৩শে আশ্বিন। ২৩শে আশ্বিন গোলাঘাটিতে কৃষক জনতার উপর পুলিশ গুলি বর্ষণ করে। একজন মুসলমান কৃষকসহ মোট ৯জন কৃষক পুলিশের গুলিতে নিহত হন। আরও বহু লোক আহত হন। এই হত্যাকান্ডে উপজাতীয় জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। এ যেন জ্বলন্ত অগ্নিতে ঘৃতাহুতি।

বিশালগড় বাজারের সুদখোর মহাজন হরি সাহা গোলাঘাটি অঞ্চলের উপজাতীয়দের কাছে দাদন দিতেন। কম টাকায় দাদন দিয়ে প্রচুর পরিমাণ ধান পাহাড় থেকে প্রতি বৎসর নিয়ে যেতেন। এই দাদন ব্যবসা ত্রিপুরার সর্বত্র চলত। তখন ধানের দাম মণপ্রতি ২-৩ টাকা। মহাজনরা প্রকৃত মূল্যের অর্দ্ধেক বা তারও চেয়ে কম দরে দাদন দিয়ে প্রতি বৎসর উপজাতি এলাকাগুলি থেকে প্রচুর পরিমাণ ধান নিয়ে যেতেন। হরি সাহা সেই বৎসর কয়েক নৌকা ভর্তি দাদনের ধান সংগ্রহ করে গোলাঘাটি বাজারে জমা করেন। মুক্তি পরিষদের উদ্যোগে গোলাঘাটি এলাকার জনতা দাদন স্বরূপ সেই ধান রাখার জন্য মহাজন হরি সাহার কাছে দাবী জানান এবং আলোচনা চালান। মহাজন ধান দিতে অস্বীকার

করলে জনতা সেই ধান আটক করার সিদ্ধান্ত নেন। শেষ পর্যন্ত মহাজন ছলনার আশ্রয় গ্রহণ করেন। জনতাকে ধান কর্জ দেবার ভান করে ২৩ আশ্বিন ধান নিতে আসার জন্য জনতাকে বলেন। অপর দিকে সরকারের সহযোগে রাত্রের অন্ধকারে প্রচুর সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশ মিলিটারী নিয়ে গোলাঘাটি বাজারে লুকিয়ে রাখেন। জনতা পূর্ব নির্দ্দেশমত হরি সাহার ধান আনতে গেলে পুলিশ অতর্কিতে জনতার উপর গুলি চালায়। এই গুলি চালনায় একজন মুসলমান কৃষক এবং ৮ জন উপজাতীয় কৃষক নিহত হন। এই গুলি চালনার সময় পুলিশপুঙ্গব ছিলেন দারোগা মিহির চৌধুরী। এই মিহির চৌধুরী পরবর্তী সময়ে সামরিক শাসনের আমলে মিলিটারীর সাহায্যে উপজাতি নারীদের ধরে এনে সামরিক শিবিরে পাশবিক অত্যাচার চালিয়েছিল। এই নরপশু উপজাতি জনতার সর্বাধিক ঘৃণার পাত্র। এই গোলাঘাটির ধান আটকের প্রস্তাবনা থেকে গুলি চালনার মুহূর্তে পর্যন্ত কমরেড অঘোর দেববর্মা নেতৃত্ব দেন। গোলাঘাটির গুলি চালনা সম্পর্কিত এই রিপোর্ট কমরেড অঘোর দেববর্মার কাছ থেকেই শুনা। কুমারীবিলে অনুষ্ঠিত মুক্তি পরিষদের মিটিং-এ তিনি এই রিপোর্ট উপস্থিত করেন।

গোলাঘাটির হত্যাকান্ডের সংবাদ তড়িৎগতিতে ত্রিপুরার চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে উপজাতীয়দের মধ্যে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে। 'রক্ত দেবো, তবু কংগ্রেস সরকারের দমন নীতির কাছে নত হব না' — এ সঙ্কল্প ধ্বনিত হতে থাকে তাদের মুখে মুখে।

মুক্তি পরিষদের নেতাদের মধ্যে একমাত্র অঘোর দেববর্মা ব্যতীত আর কেউ তখন পর্যন্ত কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য নন। কাজেই আমাদের মধ্যে কারও আগরতলা বা সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন বা ব্যক্তিদের সাথে সরাসরি যোগাযোগ ছিল না। অঘোর দেববর্মার সাহায্যেই কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যোগাযোগ করে কলিকাতা হতে চিকিৎসক দল এনে আহতদের চিকিৎসা করাতে হয়েছিল। সেই সময় কমরেড সুধন্বা দেববর্মা গোলাঘাটি এলাকায় উত্তেজিত জনতার মধ্যে গিয়ে কাজ করেন। কমরেড অঘোর দেববর্মা উত্তেজিত জনতার বিরূপ প্রতিক্রিয়ার ভয়ে গুলি চালনার সংগে সংগে এলাকা ছেড়ে সদর উত্তরাঞ্চলে এসে আশ্রয় নেন। বলা যায় গোলাঘাটির ঘটনায় যারা আগাগোড়া সম্মুখভাগে ছিলেন তাদের প্রায় সকলেই এলাকা ছেড়ে অন্যত্র সরে পড়েন। নেতাদের এ ধরনের আচরণে সেই এলাকার জনগণ অত্যন্ত মর্মাহত ও বিক্ষুব্ধ হন।

বড়দা (দুর্গাচৌধুরী পাড়ার হিরণ্য দেববর্মা) সরজমীনে গিয়ে খবর সংগ্রহ করেন। তাঁরই কাছে জানতে পারলাম কমরেড অঘোর দেববর্মা সম্পর্কে জনতার বিরূপ মন্তব্য। কোথায় অঘোর নেতা? আগুন জ্বালিয়ে সরে পড়লেন কেন? আমাদের সাথে রইলেন না

কেন ? আমরা কি তাকে গিলে ফেলতাম ? ইত্যাদি। অবশ্য গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পর অন্যান্য কর্মীরা ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেন। হত্যাকাণ্ডের পর অবস্থা একটু শান্ত হয়ে এলে অঘোর দেববর্মাকে আবার তার কর্মস্থলে পাঠানো হয় বা তিনি ফিরে যান।

কমরেড অঘোরের এই ভূমিকা সম্পর্কে পরবর্তী সময়ে আমরা সমালোচনা করেছি। তিনি অবশ্য আমাদের সমালোচনা গ্রহণ করতে পারেন নাই। যিনি বা যাঁরা এই গোলাঘাটির ঘটনায় আগাগোড়া নেতৃত্ব দিয়েছেন তাদের বৈপ্লবিক সতর্কতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। নেতাদের বৈপ্লবের সতর্কতা থাকলে এভাবে অতর্কিতে জনতাকে পুলিশের গুলির সম্মুখে পড়তে হত না। শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে, অথচ শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করবে না-এটা কোন বৈপ্লবিক সতর্কতার পরিচয় নয়। মহাজনের ধান আটক করবে, আলাপ আলোচনাও চলবে অথচ মহাজন গোপনে পুলিশ বা গুন্ডা বাহিনী আমদানী করার চেষ্টা নিচ্ছে কিনা, সেদিকে কোন নজর রাখা হবে না— এটা কখনই বিপ্লবী নেতৃত্বের কাজ হতে পারে না। কমরেড অঘোর দেববর্মার বৈপ্লবিক সতর্কতার একান্ত অভাব ছিল। গোলাঘাটির হত্যাকাণ্ডের পর সেই এলাকার বেশ বড় অংশ জনতার কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছিল। অতিরিক্ত মাথা গরম, অতি বিপ্লবী তাঁর সম্পর্কে এই ধরনের বিরূপ উক্তিই কর্মী এবং জনতার মুখ থেকে নিঃসৃত হতে শুনা গিয়েছিল। তাঁর বিশ্বস্ত কর্মীরূপে তাঁর সাথে সাথে থেকে বিধি দেববর্মা (অবসরপ্রাপ্ত মিলিটারী জমাদার) গুপ্তচর বৃত্তির কাজ করে তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল এটাও তিনি টের পান নাই। যে এলাকায় তিনি আগাগোড়া কাজ করেছেন সেই এলাকা থেকেই তিনি দুই দুইবার গ্রেপ্তার হন।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, কমরেড অঘোর দেববর্মার হঠকারী ঝোঁক সমগ্র সদর দক্ষিণ অঞ্চলে কোথাও সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে উঠতে সাহায্য করে নাই। টাকার-জলা থেকে সূতার মুড়া পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ এলাকার কোথাও সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা করা হয় নাই। সশস্ত্র বাহিনীর মোকাবেলা করার মত লড়াকু সংগঠন গড়ে উঠে নাই। অথচ খোয়াই -এর মত এত ব্যাপক না হলেও সদর দক্ষিণাঞ্চলেও সশস্ত্র মিলিটারী বাহিনী উপজাতীয়দের ঘরে আগুন জ্বালিয়েছিল। রামনগর, সূতারমুড়া প্রভৃতি গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছিল। গ্রামবাসীদের গ্রেপ্তার করেছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা সংগঠিত ভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলবার প্রচেষ্টাও নিয়েছিলেন। সঠিক নেতৃত্বের অভাবে খোয়াই বিভাগ এবং সদর উত্তরাঞ্চলের মত সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে উঠে নাই। তাই, শত্রুপক্ষকে সদর দক্ষিণাঞ্চলে তেমন ক্ষয় ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নাই।

সশস্ত্র প্রতিরোধের প্রাথমিক পর্ব

গোলাঘাটির হত্যাকান্ডের পর কংগ্রেস সরকারের চন্ডনীতির তীব্রতা আরও বেড়ে যায়। উপজাতি অঞ্চলে, বিশেযত সদর ও খোয়াই বিভাগে এবং কমলপুর বিভাগে উপজাতীয় পাড়াগুলিতে সশস্ত্র মিলিটারীর টহল বৃদ্ধি পায়। জনতার উপর ধমক, নির্যাতন বাড়তে থাকে। অপরদিকে, গণমুক্তি পরিযদ সশস্ত্র প্রতিরোধের জন্য স্থানে স্থানে প্রতিরোধ স্কোয়াড গড়ে তুলে। প্রতিরোধ স্কোয়াডগুলিকে সামরিক শিক্ষাদানের জন্য প্রাক্তণ সৈনিকদের অনেকেই এগিয়ে আসেন। ত্রিপুরার উপজাতীয়রা তীর ধনুক ব্যবহারে অভ্যস্ত নন। তাঁরা বন্দুক ব্যবহারে অভ্যস্ত। গ্রামাঞ্চলে তীর ধনুক ব্যবহারে অভ্যস্ত সাঁওতাল, শবর,মুন্ডা, প্রভৃতি উপজাতীয়দের কাছ থেকে তীর ধনুক চালনার ট্রেনিং নিতে থাকে। যুবকদের ব্যাপকভাবেই তীর ধনুকের ট্রেনিং দেওয়া হয়। এই শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের নিয়ে রাজনৈতিক আলোচনা করা হত। প্রায় প্রতি গ্রামেই কর্মী যুবকদের মধ্য থেকে দুই এক জনকে বাছাই করে পত্রবাহক (কুরিয়ার) সংগঠন গড়ে তোলা হয়। একস্থান থেকে অন্য স্থানে জরুরী খবর পৌছিয়ে দেওয়া, শত্রুর গতিবিধি বা আনা গোনা সম্পর্কে নেতৃবর্গ এবং জনগণের কাছে খবর পৌছিয়ে দেবার কাজে এই পত্র-বাহক সংগঠনের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শত্রুপক্ষের চোখে ধূলো দিয়ে, এমনকি সাধারণ জনতাকে অজ্ঞ রেখে এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের গুপ্ত রাস্তা খুঁজে বের করতেন। তাদের সেই সংবাদ সরবরাহের গুপ্ত পথগুলি আত্মগোপনকারী কর্মীদেরও যাতায়াতের পথ ছিল। সেগুলিই পরবর্তী সময়ে প্রতিরোধ বাহিনীও ব্যবহার করেছিলেন।

প্রথম প্রতিরোধ সংঘর্ষ

১৯৪৯ সালের গোড়ার দিকে পদ্মবিলে উপজাতি জনগণের সাথে সশস্ত্র মিলিটারীর প্রথম সংঘর্ষ হয়। মিলিটারীরা পদ্মবিলের খামার পাড়ায় গিয়ে তিতুন দেবার অর্থাৎ তাদের মালপত্র বহন করে অন্য গ্রামে পৌছিয়ে দেবার জন্য উপজাতীয় মহিলাদের পীড়াপীড়ি করে। পূর্ব থেকেই প্রচার ছিল যে সশস্ত্র মিলিটারী বা পুলিশ আগের মত গ্রামে এসে জোর জুলুম করলে তাদের আর অক্ষত দেহে ফিরে যেতে দেওয়া হবে না। গোলাঘাটির প্রতিশোধ নিতে হবে। ফলে গ্রামের মেয়েরা একত্রিত হয়ে তিতুন দিতে অস্বীকার করে। ইত্যবসরে সেই গ্রামের মেয়েরা দৌড়ে গিয়ে পার্শ্ববর্তী পাড়াগুলিতে খবর দেয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যেই মিলিটারীর আগমন এবং গ্রামের মেয়েদের উপর 'তিতুন' দেবার জন্য পীড়াপীড়ি করার সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। পদ্মবিল এলাকা ঘন বসতি এলাকা। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই উপজাতীয় মেয়েরা খামার পাড়ায় সমবেত হন। সংবাদ পেয়ে

পার্শ্ববর্তী গ্রামগুলি থেকে পুরুষরাও তীর ধনুক নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় জঙ্গলে লুকিয়ে এম্বুস করেন। এদিকে মেয়েদের সাথে মিলিটারীর তর্কাতর্কি হবার সময় একজন উপজাতি পুরুষ বাঁশ কেটে বাড়ীতে ফেরেন। মিলিটারীরা তাকে পাকড়াও করে। দলে দলে নারীদের এসে একত্রিত হতে দেখে মিলিটারী বাহিনী সেই পুরুষ এবং কয়েকজন নারীকে জোর করে ধরে নিয়ে রওয়ানা হয়। তখনই উপজাতি নারীরা দলবদ্ধভাবে সশস্ত্র মিলিটারীদের উপর দা, লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত ধাওয়া করেন। মিলিটারীরা যে কয়েকজন নারী ও পুরুষকে গ্রাম থেকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। মিলিটারীরা জনতাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায়। জঙ্গলে লুক্কায়িত পুরুষ তীরন্দাজরাও মিলিটারীদের লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়েন। এই সংঘর্ষে কুমারী দেববর্মা, মধুতী দেববর্মা ও রুপশ্রী দেববর্মা এই তিনজন উপজাতি মহিলা নিহত হন এবং আরো অনেকেই আহত হন। দা, লাঠি ও তীরের আঘাতে মিলিটারী বাহিনীর ক্ষয়ক্ষতির সঠিক হিসাব পাওয়া যায় নাই। তবে মিলিটারীদের সকলেই যে অক্ষত দেহে ফিরে যেতে পেরেছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। এই সশস্ত্র মিলিটারীর সাথে ব্রজেন্দ্রকিশোর দেববর্মা (লালু কর্ত্তা'র ছেলে) রমেন্দ্র কিশোর দেববর্মা (ননী কর্ত্তা)ও ছিলেন বলে কেউ কেউ বলেছেন। এ সম্পর্কে সত্য মিথ্যা যাচাই করার সুযোগ ছিল না। পদ্মবিলের এই নারী হত্যা ঘটেছিল ১৯৪৯ সালে। সম্ভবতঃ ১৩ই চৈত্র। (সঠিক তারিখ মনে পড়ছে না)।

তিতুন প্রথা কি?

রাজতন্ত্রের আমলে ত্রিপুরার পথঘাট দুর্গম ছিল। রাজার আমলারা (কর্মচারীরা) পাহাড়ে উঠলেই বিনা মজুরীতে তাদের মালপত্র বহন করে তাদের এক গ্রাম থেকে অন্যগ্রামে পৌঁছিয়ে দিতে হত। ইহাকেই তিতুন প্রথা বলা হয়। এটা প্রত্যেক উপজাতিদের উপর বাধ্যতামূলক ছিল। এই 'তিতুন' দেবার জন্য সরকারী কর্মচারী আসুক আর নাই আসুক প্রত্যেক পাড়াতে (২) দুই জন লোককে দৈনিক প্রস্তুতি থাকতে হত। পাড়ার লোকগুলিকে পালাক্রমে দুই জন করে তিতুন দেবার অপেক্ষায় পাড়ার চৌধুরীর ঘরে গিয়েপ্রস্তুত থাকতে হত। সরকারী কর্মচারীরা আসা মাত্র তাদের নির্দেশ মত তৎক্ষনাৎ তাদের মালপত্র বহন করে তারা যেখানে যেতে চান, সেই গন্তব্যস্থলে যাবার পরবর্তী তিতুন পয়েন্টে পৌঁছিয়ে দিতে হত। এই তিতুন পয়েন্টগুলি অর্থাৎ কোন পাড়ার তিতুন কোন পাড়া পর্যন্ত পৌঁছিয়ে দিতে হবে তা পূর্ব থেকেই নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। (এটা একটা কনভেনশনে পরিণত হয়েছিল।) অপর পাড়া থেকে যারা 'তিতুন' দিতে আসতেন তাদের জল তামাক দেবার পর্যন্ত সময় দেওয়া হত না। সরকারী কর্মচারীরা আসা মাত্র বাড়ীর উঠানে প্রবেশের আগেই 'তিতুন' বলে একটা ডাক দিতেন। সঙ্গে সঙ্গে চৌধুরীর

ঘরে অপেক্ষমান লোক দৌড়ে গিয়ে অপর গ্রাম থেকে যারা 'তিতুন' বহন করে আনতেন তাদের মাথায় মালপত্র নিজের মাথায় তুলে নিতে হত। একটু বিলম্ব হলেই পিঠে বেত্রাঘাত। গ্রামে কোন কারণে পুরুষ উপস্থিত না থাকলে বা যাদের তিতুন দেবার কথা তারা অসুস্থ হলে তাদের ঘরের মেয়েদের এই 'তিতুন' দিতে হত।

এই 'তিতুন প্রথা'র বিরুদ্ধে ত্রিপুরার উপজাতীয়রা যে কোন কালেই বিদ্রোহ করেন নাই তা নয়। কিন্তু সেই বিদ্রোহ বা প্রতিবাদ ছিল সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বা সীমিত এলাকাগত। এই প্রতিবাদের পেছনে জনগণের গুপ্তভাবে জনসমর্থন থাকলেও সংগঠিত জনতার প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারে নাই। রাজার দাপটে তা হওয়াও তখন সম্ভব ছিল না। যে জনতা রাজাকে সাক্ষাৎ দেবতার প্রতিনিধি অর্থাৎ 'নররূপী নারায়ণ বলে মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন রাজাদের দ্বারা চালু করা এই তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে সেই জনতাকে সরাসরি প্রতিবাদ মুখর করে তোলা রাজার জীবিতকালে তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। জানা যায় যে, সদর উত্তরের কামালঘাট অঞ্চলের খামার পাড়ার মহার্মনি দেববর্মা (তখনকার রাজার মনোনীত মন্ডলী সর্দার) এই তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। রাজার নিজস্ব প্যারা মিলিটারী সংগঠনের লোক বৃন্দিয়াদের (বিনন্দিয়া) বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর মন্ডলের পরিসীমায় তিতুন দেওয়া সম্পূর্ণ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এই অপরাধে মহামনি দেববর্মাকে রাজা কর্ত্তৃক দৈহিক নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছিল। কিন্তু সদর উত্তরে তিতুন প্রথা চালু করতে রাজা আর সাহস করেন নাই।

এই তিতুন প্রথার বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদের তীব্র আন্দোলনের ফলেই পদ্মবিলে এই সংঘর্ষ ঘটে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এই তিতুন প্রথা কেবলমাত্র উপজাতীয়দের উপরেই চাপানো হত। শহরগুলি থেকে উপজাতি পাড়াগুলি বেশ দূরে। শহর থেকে বের হয়েই বাঙ্গালী পাড়াগুলি অতিক্রম করতে হত। বাঙ্গালী হিন্দু ও মুসলমান পাড়াগুলি অতিক্রম করে আসার সময় সরকারী কর্মচারীদের মজুরী দিয়ে মালপত্র বহন করে আনতে হত। এটা ও উপজাতীরা স্বচক্ষে দেখতেন। কাজেই, কেবলমাত্র নিরীহ উপজাতীয়দের উপরেই এই বেগার প্রথা কেন চালু থাকবেও এটা ও উপজাতীয়রা উপলব্ধি করতে শুরু করেছিলেন।

গণমুক্তি পরিষদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রাম এবং পদ্মবিলে তিনজন ত্রিপুরী মহিলা শহীদদের রক্তদান বৃথা যায় নাই। সেই ঘটনার পর থেকে এই পীড়ণমূলক তিতুন প্রথা ত্রিপুরার মাটি থেকে চির নির্বাসিত হল।

চাম্পাহাওরের প্রতিরোধ সংগ্রাম ও সংগ্রামের নতুন কৌশল

পদ্মবিলের এই হত্যাকান্ডের পর বৈশাখ মাসে মিলিটারীরা সামরিক অভিযান চালায় চাম্পাহাওরের এলাকায়। এই সামরিক বাহিনীর লক্ষ্য ছিল পাড়ায় পাড়ায় কমবিং (Combing) অপারেশন চালিয়ে বিদ্রোহীদের গ্রেপ্তার করা এবং জনগণের উপর পাইকারী হারে দৈনিক নির্যাতন চালিয়ে লুণ্ঠন করে, জনগণের সংগ্রামী মনোবল ভেঙ্গে দিয়ে , বিদ্রোহীদের সান্নিধ্য থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা। ঘন চিরুনী দিয়ে মাথায় চুল আচড়ালে যেমন মাথার উকুন ধরা পড়ে তেমনি ৩/৪টি গ্রাম মিলিটারীর দ্বারা এক সাথে ঘেরাও করে, বেষ্টনী রচনা করে ঘরে ঘরে তল্লাসী চালালে এবং গ্রামের পার্শ্ববর্তী ঘন বন, ঝোঁপে তল্লাসী চালালে গ্রামবাসীদের উপর নানানভাবে উৎপীড়ন চালালে কারা এই আন্দোলনে সক্রিয় নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদের গ্রেপ্তার করা সম্ভব হবে এই ধারণা থেকে এই ধরণের অপারেশন। এই ধরণের অভিযানে আরও বহু উপজাতীয় ব্যক্তিসহ চাম্পাহাওরের আমার জেঠতুতো ভাই রাজকুমার দেববর্মাকে বাড়ীতে না পেয়ে তাঁর স্ত্রী মধুতী দেববর্মাকেও শিশু কন্যাসহ গ্রেপ্তার করে কয়েকমাস খোয়াই জেলে আটক করে রাখা হয়েছিল।

এই চাম্পাহাওর অভিযানের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামের নেতৃত্ব দিতে প্রথম এগিয়ে আসেন রবীন্দ্র দেববর্মা ও রামচরণ দেববর্মা প্রমুখ নেতৃস্থানীয় কর্মীরা। এগিয়ে আসেন শত শত জনতা এবং সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত প্রাক্তন সৈনিকরা (সকলেই ত্রিপুরা সম্প্রদায়ভুক্ত)। খোয়াই নদীর পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড় থেকে প্রায় দুই হাজারের উপর জনতা চাম্পাহাওর গিয়ে জড় হন মিলিটারীর সেই অভিযান রুখবার জন্য। কমরেড রবীন্দ্র দেববর্মা ও অন্যান্য কর্মী এবং প্রাক্তন সৈনিকদের সাথে আলোচনা করে সেই প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। অপরদিকে প্রচুর সংখ্যক জনগণের সমাবেশের আঁচ পেয়ে মিলিটারী বাহিনী (সম্ভবতঃ আরও অধিক মিলিটারী সমাবেশের অপেক্ষায়) বর্তমান চাম্পাহাওর বাজারের অপর পাড়ে শিবির করে আক্রমণের জন্য অপেক্ষা করছিল।

আমি তখন সদর দক্ষিণের পদ্রাই গালেম পাড়ায় সদর দক্ষিণের বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে এক ঘরোয়া বৈঠকে ছিলাম। সংবাদ বাহক রবীন্দ্র দেববর্মার এক চিঠি নিয়ে উপস্থিত। চিঠি খুবই সংক্ষিপ্ত। ''দাদা, চাম্পাহাওরে মিলিটারী শিবির করেছে অভিযান চালানোর জন্য। জনতা নিয়ে আমি চাম্পাহাওর অভিমুখে রওয়ানা দিচ্ছি। কি করতে হবে সত্বর নির্দেশ পাঠাবেন।'' এটাই তার চিঠির মর্ম।

খবর পেয়ে তৎক্ষনাৎ আমি মিটিং ছেড়ে চাম্পাহাওর অভিমুখে রওয়ানা হই। তখন বিকেল তিনটা। পথে কোথাও এক দন্ড বিশ্রাম না করে দ্রুতগতিতে পায়ে হেঁটে চাম্পাহাওর পৌঁছতে লেগেছিল ২৭ ঘন্টার মত। পথে তিনবার সঙ্গী বদল করেত হয়েছিল। বড়মুড়া ও আরো ছোট খাট পাহাড় পর্বত ডিঙ্গিয়ে যেতে হয়েছিল। এই দিবারাত্রি হাঁটার সময় একমাত্র মুইচিং বাড়ীর সৌমেন দেববর্মার বাড়ী ছাড়া আর কোথাও জল,ভাত বা তামাক খাবারের নাম করে পাঁচ মিনিটের জন্যও দাঁড়াই নাই । এই অবস্থান বাধ্যতামূলক ছিল না। সেখান থেকে খোয়াই- কল্যাণপুর সড়ক এবং খোয়াই নদী অতিক্রম করতে হলে অগ্রগামী দল পাঠিয়ে শত্রুর গতিবিধি আছে কিনা পরখ না করে চট করে অতিক্রম করা সতর্কতার নিদর্শন হতে পারে না। হাজার হাজার জনতা নিম্নস্তরের অস্ত্র অর্থাৎ তীর ধনুক এবং কিছু গাঁদা বন্দুক (muzzle order)নিয়ে উন্নত ধরনের অস্ত্র শস্ত্রে সজ্জিত সামরিক বিদ্যার শিক্ষা প্রাপ্ত মিলিটারীর সাথে সম্মুখ সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে যাচ্ছেন এ খবর পাবার পর নিজের উদর-পূর্তির জন্য কোথাও এক মুহূর্ত কালক্ষেপ করার মত আমার মনে গতি ছিল না। সম্মুখ সংগ্রামে এক সংঘর্ষে এতগুলি মূল্যবান জীবন অযথা বলি হয়ে যাবে এই চিন্তায় আমি অধীর হয়ে উঠলাম। অনাহার, অনিদ্রায় পায়ে হেঁটে দীর্ঘ ও বন্ধুর পথ অতিক্রম করার দুঃখ কষ্ট অনুভব করার মতন তখন আমার মানসিক অবস্থা ছিল না।

বিকাল ৫টায় চাম্পাহাওরে পৌঁছি রবীন্দ্র দেববর্মা, রামচরণ দেববর্মা, মানিক দেববর্মা (হাবিলদার), পদ্মমোহন দেববর্মা (প্রাক্তন সৈনিক — লাল মিঞা নামে পরিচিত। মোহন্ত হাবিলদার, নন্দকুমার হাবিলদার (নব), লক্ষ্মণ দেববর্মা (মন্ডলী সর্দার— তখনই তাঁর বয়স ৬০ বৎসেরর উর্দ্ধে) সৌমেন দেববর্মা এবং আরো বিশিষ্ট কর্মীদের নিয়ে সংগ্রামের কৌশল আলোচনা করি। এই এক ঘন্টার মত সংক্ষিপ্ত বৈঠকে আমি নিম্নলিখিত সংগ্রামী কৌশল অবলম্বন করার জন্য সুপারিশ করি। যেমন ঃ বিরাট জনতা নিয়ে সামনা সামনি সশস্ত্র শত্রুর মোকাবিলা করে হবে না। তাতে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ বেশী হবে। তদুপরি অনুন্নত্ অস্ত্র নিয়ে সশস্ত্র মিলিটারী বাহিনীকে এক স্থানে আবদ্ধ করে রাখা যাবে না। পদ্মবিলের অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরি। কায়দায় পেলে ক্ষীপ্র গতিতে শত্রুকে আক্রমণ করে, ক্ষিপ্রগতিতে সরে পড়তে হবে। একইস্থানে এক সঙ্গে পাঁচ জনের বেশী শত্রুকে আক্রমণ করার জন্য এম্‌বুস করা চলেব না। শত্রুর উপর গুলী করার সঙ্গে সঙ্গে নিরাপদ স্থানে সরে যেতে হবে। ধান গাছ, ঘন বন, ছন বন, এমনকি সমতলের বাঁশের ঝাড় মিলিটারীর আগমন টের পেলে আত্মগোপন করারসহায়ক বটে, কিন্তু সেই সবের আড়ালে অবস্থান করে শত্রুর বিরুদ্ধে গুলী চালাবে না। এগুলির আড়ালে এম্বুস করে

গুলী চালানো মূর্খতা। তাতে শত্রুর দৃষ্টি থেকে নিজেকে আড়াল করা যায় বটে, কিন্তু ধান গাছ, ছন বন, বা ঘন বন প্রভৃতি বুলেটের গতি রোধ করতে পারে না। একমাত্র উঁচু নীচু মাটিই বুলেটের গতি রোধ করতে পারে । এটাই এম্বুস করে লড়াই করার পক্ষে উৎকৃষ্ট ক্ষেত্র। মাটির প্রোটেকশান না পেলে শত্রুকে চলে যেতে বা এগিয়ে আসতে দিতে হবে। তাতে যদি গ্রামে এসে ওরা লুটপাট করে, ঘরে আগুন দেয়, তাও চোখ বুজে সহ্য করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে সুবিধাজনক জায়গায় গিয়ে শত্রুকে ঘায়েল বা নাকাল করার জন্য সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দলবদ্ধভাবে দুর্বল অস্ত্র নিয়ে সরকারের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সামনা সামনি সংগ্রাম করে তাদের গতিরোধ করে একটা নির্দ্ধারিত সীমানা বা গন্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখার চিন্তাধারা বা মনোভাব এখন পরিত্যাগ করতে হবে। শত্রুর শিবিরে গিয়ে এখন ই আক্রমণ করা চলবে না। তার দূর্গে শত্রু শক্তিশালী এবং সর্বদা সতর্কতা রক্ষা করে চলে। সেখানে আক্রমণ করার অর্থ বিপদ ডেকে আনা। কখন শত্রুর শিবিরে হানা দেওয়া হবে তা পরে দেখা যাবে। কেননা সংগ্রামের বর্তমান স্তরে তা করতে যাবার অর্থ হবে প্রতিরোধ সংগ্রামকে দুর্বল করা। আমাদের বর্তমান স্তরের কাজ হবে— সশস্ত্র মিলিটারী বাহিনী যাতে গ্রামাঞ্চলে অবাধে প্রবেশ করে এক তরফা লুটপাট, ধর্ষণ ও হত্যা করে অক্ষত দেহে যতে না পারে সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা এবং এভাবে গ্রামাঞ্চলে অবাধে প্রবেশ করে আক্রমণ করার তাদের মনোবল ভেঙ্গে দেওয়া। গ্রামাঞ্চলে প্রবেশ করলেই অজানা আতঙ্কে তাদের বুক যেন কেঁপে উঠে। বেশী সময় ধরে গ্রামে থেকে লুটপাত করতে সাহস না করে। আমাদের কাজ হবে — সেই পরিস্থিতি সৃষ্টি করা। এভাবেই আপন ব্যূহে প্রবেশ করতে দিয়ে কায়দায় প্রাথমিক প্রতিরোধ সংগ্রাম পরিচালনা করার কতকগুলি অবশ্য ফেলে শত্রুকে ঘায়েল করা। একাজ করতে পারলেই আমাদের প্রতিরোধ সংগ্রামের প্রাথমিক সাফল্য আনা যাবে। এভাবে গেরিলা কায়দায় পালনীয় শর্ত্ত সম্পর্কে আমার বক্তব্য উপস্থিত করি। খুব সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে আমাদের আলোচনা বৈঠক সমাপ্ত করতে হয়। কমরেডগণ আলোচনার জন্য আর ও কিছু সময় চেয়েছিলেন। সেই মুহূর্তে আমাকে একরকম ডিক্টেটারের মতনই কাজ করতে হয়েছিল। মাত্র এক মাইল দূরে শিবির করে আক্রমণের সুযোগের অপেক্ষা করছে, কৌশল সম্পর্কে বিতর্ক করে চুলচেরা বিচারের জন্য দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করার মত পরিস্থিতি বা সময় ছিল না। উপস্থিত কমরেডগণ আমার এই বক্তব্য বা প্রতিরোধ সংগ্রামের কৌশল মেনে নেন।

দুই সহস্রাধিক জনগণের সমাবেশে (অর্থাৎ যারা প্রতিরোধের জন্য বিভিন্ন এলাকা থেকে তথায় সমবেত হয়েছিলেন) তাদের সামনে কর্মীদের দ্বারা অনুমোদিত আমার

সেই প্রস্তাব উপস্থিত করি। জনগণের কেউ কেউ প্রথমে আমার প্রস্তাব গ্রহণ করতে রাজী হন নাই। কেউ কেউ উত্তেজিত হয়ে বলেন, " আপনার এই প্রস্তাব আমরা মানতে পারছি না। মরতে হয় এক সঙ্গে মরব। চোখের সামনে ঘর বাড়ী লুঠ করতে দেবো না। মা, বোনদের বলাৎকার করতে দেব না। দলবদ্ধভাবে মিলিটারীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে হয় তাদের গতিরোধ করে দেবো না হয় এক সাথে লড়তে লড়তে মরে যাব"। আমি ধৈর্য্য সহকারে আমার কৌশল সম্পর্কে জনতার সামনে বক্তব্য বার বার ব্যাখ্যা করি। এবং বলি — বন্ধুগণ, আপনারা সকলেই সাহসী, দেশপ্রেমিক, জাতির তিলক। জাতির মুক্তির জন্য নিপীড়িত ও শোষিত উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের শিকল ছিঁড়ে ফেলতে আপনারা সংকল্পবদ্ধ। তা আমি আন্তরিক ভাবে বুঝতে পেরেছি। আপনারা হাসিমুখে বুকের রক্ত ঢেলে দিয়ে জাতি রক্ষা, দেশ রক্ষার এবং মা বোনদের শলীনতা রক্ষার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে এসেছেন। আমাদের এই দৃঢ় প্রত্যয় হয়েছে। তাই আমি গর্বিত। সমগ্র উপজাতিরা আজ গর্বিত। নতুবা এই রণাঙ্গণে আপনাদের সাথে আমার দেখা হবে কেন? তবে একটি ছোট কথা আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। তা হল, নিছক মরবার জন্যই আমাদের এই সংগ্রাম নয়। বাঁচার জন্যই আমাদের এই সংগ্রাম। কম লোকক্ষয়ে, কায়দায় ফেলে শত্রুকে একটির পর একটি প্রত্যাঘাত করেই আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। কম লোকক্ষয়ের সংগ্রামে জয়লাভ করতে হবে। ঘরবাড়ী পুড়ে গেলেও ঘর বাড়ী পাওয়া যাবে কিন্তু মানুষ মরে গেলে তাকে আর ফিরে পাওয়া যাবে না। তাই আমি আবার অনুরোধ করছি যে, আপনারা এই প্রতিরোধ সংগ্রামের কৌশল পরীক্ষামূলক ভাবে গ্রহণ করুন। যদি এই কৌশলে কাজ না হয় তখন একে পরিবর্তন করার আপনাদের সকলের অধিকার অটুট আছে। মূল লক্ষ্য সংগ্রামে সাফল্য অর্জন।

এই বক্তব্যের পর আর কেহ আপত্তি করেন নাই। জনগণ করতালি দিয়ে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। তখন আমি শেষ বক্তব্য রাখি— এই কৌশল এখন আর আমার একার রইল না। এটা আপনাদের সিদ্ধান্তে পরিণত হল। অতএব বিপুল সংখ্যক জনগণের অনুমোদিত এই প্রস্তাব অনুসরণ করে, মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বের প্রতি আস্থা রেখে আপনারা এখন যথাস্থানে ফিরে যান। কেবল আমি যাদের থাকতে বলব তাঁরাই থেকে যাবেন। তাঁরাই চাম্পাহাওর রণাঙ্গণ দেখাশুনা করবেন। আপনারা ফিরে গিয়ে যার যার এলাকায় প্রতিটি গ্রামকে প্রতিরোধ দূর্গে পরিণত করুন। বক্তব্যগুলি কগবরকে (ত্রিপুরী ভাষায়) রাখা হয়।

এই জনসভার শেষে সমবেত জনতা যার যার গ্রামে ফিরে গেলে রাত্রে কর্মী এবং

বাছাই করা ব্যক্তিদের নিয়ে প্রতিরোধ ইউনিট গড়ে তোলা হয়। সমগ্র চাম্পাহাওরে এলাকার প্রতিরোধ সংগ্রামের জন্য প্রতি ইউনিটে ১০ জন করে মাত্র ৩টি ইউনিট গঠন করা হয়। প্রাক্তন সৈনিক এবং উৎসাহিত যুবকদের নিয়েই এই প্রতিরোধ ইউনিট গঠন করা হয়। ইউনিটগুলি কাদের নিয়ে গঠন করা হয়েছিল তা এখানে প্রকাশ না করাই ভাল। তবে ৬০ বৎসর বয়সের উর্ধে এবং বন্দুক চালনায় অভিজ্ঞ সুদক্ষ শিকারী কমরেড লক্ষ্মণ দেববর্মা (রাজার আমলে প্রভাবশালী মন্ডলী সর্দ্দার) এই প্রতিরোধ ইউনিট-গুলি র অন্যতম সদস্য ছিলেন। ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে ৮৮ বৎসর বয়সে তিনি পরলোক গমন করেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য ছিলেন। তবে বার্দ্ধক্যের জরাগ্রস্ত অবস্থায় জীবনের শেষ ৫-৬ বৎসর শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন।

তখন থেকেই সামরিক বাহিনীর আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য সর্বত্র যুবক যুবতীদের শারীরিক ও সামরিক শিক্ষাদানের কাজ শুরু হয়ে যায়। এই শিক্ষাপ্রাপ্তদের মধ্য হতে বাছাই করা কর্মঠ যুবকদের নিয়ে গেরিলা ইউনিট, শত্রুর গতিবিধি সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখার সংগঠন, মিলিটারী আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার তাগিদে মিলিটারী অভিযানের সময় জঙ্গলে আত্মগোপনকারী নর নারী, শিশু বৃদ্ধদের দেখাশুনা করা প্রভৃতি কাজের জন্য সর্বত্র বিভিন্ন ধরনের কর্মী দল গড়ে তোলার কাজে হাত দেওয়া হয়। প্রত্যেক প্রতিরোধ ইউনিটের সাথেই কমপক্ষে দুইজন নিরস্ত্র অগ্রগামী ব্যক্তি থাকতেন। তাঁদের কাজ ছিল— সশস্ত্র রাহিনীর গতিবিধি সম্পর্কে ফাইটারদের পূর্বাহ্নে অবহিত করা। এভাবেই মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ত্রিপুরার পাহাড়ে কন্দরে প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে উঠে। অবশ্য আমাদের এই সংগঠন প্রধানতঃ খোয়াই, কমলপুর এবং সদর বিভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে উপজাতি অঞ্চলের আদিবাসী কিছু হিন্দুস্থানী তীরন্দাজ যুবক এই প্রতিরোধ ইউনিটগুলিতে যোগ দিয়েছিলেন। সমতল অঞ্চলের মুসলমান জনতার সক্রিয় সমর্থন পাওয়া গিয়েছিল। সমতল বা শহরাঞ্চলের দৈনন্দিন খবরাদি তাঁরা আমাদের কাছে পৌঁছে দিতেন।

(জ্বালা।। ৫ম বর্ষ ১ম/২য় সংখ্যা নভেম্বর ' ৭৪— ফেব্রুয়ারী ' ৭৫)

ত্রিপুরী সমাজের কর্তৃত্ব গ্রহণ মুক্তি পরিষদের ঐতিহাসিক ঘোষণা

১৯৪৯ সাল ত্রিপুরা রাজ্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্ব উপলব্ধি করলেন যে, কেবলমাত্র রাজনৈতিক শ্লোগান দিয়ে অনগ্রসর জনতাকে সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রামে বেশী দিন ধরে রাখা যাবে না। জনগণকে সংগ্রামমুখী করে তুলতে হলে তাঁদের সামনে কংগ্রেসের বিকল্প নূতন কর্মসূচী তুলে ধরতে হবে। সাধারণ মানুষের যে দৈনন্দিন সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলির সমাধানের ছোটখাট কাজকর্ম করে জনগণের মনে এই প্রত্যয়আনতে হবে যে, মুক্তি পরিষদ সত্য সত্যই শোষিত ও অবহেলিত ত্রিপুরার উপজাতি জনতার কল্যাণে এক নতুন সমাজব্যবস্থা গড়তে চায়। মুক্তি পরিষদ কাজকর্মের ভেতর দিয়ে উপজাতি জনগণের মধ্যে এই প্রত্যয় সৃষ্টি করতে না পারলে উপজাতি জনতা মুক্তি পরিষদের ডাকে সারা দেবেন কেন?

শোষণহীন সমাজ গড়ে তোলার সংগ্রামে জনগণকে আকৃষ্ট করতে হলে, তাঁদের সংগ্রামী চেতনার উন্মেষ ঘটাতে হলে, তাঁদের ধর্মীয় কুসংস্কার রক্ষনশীলতার বিবর থেকে মুক্ত করতে হবে। নতুনবা কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূরা এবং তাদের দালালরা 'গুরুদেবের অভিপ্রায় নয় যে জনগণ শিল্পপতি ও জমিদারদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, মা ত্রিপুরা সুন্দরীর (কালী) বা চতুর্দশ দেবতার অভিপ্রায় নয় যে জনগণ সরকারের বিরুদ্ধে হাত তুলেন' এই সব কথাবার্তা বলে ধর্মভীরু ও দৈব শক্তির উপর বিশ্বাসী ব্যক্তিদের রণাঙ্গন থেকে ফিরিয়ে দিতে পারে। ধর্মীয় অনুশাসন, সোজা কথায় ধর্মীয় কুসংস্কার থেকে মুক্ত করার জন্য মুক্তি পরিষদ নির্ভীকভাবে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে।

প্রতিরোধ সংগ্রাম তীব্রতর হবার সাথে সাথে দেখা গেল ত্রিপুরী উপজাতি জনগণের সরকারী অফিস-আদালত যাতায়াতে দ্রুত ক্ষীণ হয়ে এল। তার একটি কারণ হল ত্রিপুরী জনতা বুঝতে শুরু করলেন যে, সরকারী অফিস-আদালতগুলো হল — শোষণ,পীড়ন ও প্রতারণার নরককুন্ড। এই নরককুন্ডকে কেন্দ্র করে এক দল প্রতারক, শোষক ও সুবিধাভোগীর দল ওৎ পেতে বসে থাকে শিকার ধরার জন্য। কেহ মামলায় জড়িত হলে বিষয়- আশয় নিয়ে বিপাকে পড়লে এদের কুম্ভী - পাকে পড়ে অনেক কিছু খোয়াতে হয়। অপর কারণ হল অফিস আদালতে গেলে ত্রিপুরীদের পুলিশের হাতে অনেক নিগৃহীত হতে হয়। আত্মগোপণকারীদের সন্ধান নেবার অজুহাতে পুলিশ যাকে তাকে যেখানে

সেখান অপদস্ত ও জোর জুলুম করে। ফলে জনগণের কাছ থেকেই দাবী উঠতে থাকে যে, " যে সরকারের বিরুদ্ধে আমরা বন্দুক ধরছি বিচারের জন্য সেই সরকারের কাছে যাব কেন ? আমাদের ব্যবস্থা আমরা করব।" আমাদের আভ্যন্তরীণ বিরোধগুলির নিষ্পত্তি আমরাই করব।

জনগণের প্রতিক্রিয়া এবং সংগ্রামের পর্যালোচনার জন্য সদর উত্তরে পাটনী পাড়ায় পার্শ্ববর্তী একটি পরিত্যক্ত পাড়ায় (ত্রিপুরী ভাষায় কামিচং- বলা হয়) মুক্তি পরিষদের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন বসেছিল। সেই অধিবেশনেই মুক্তি পরিষদ ত্রিপুরী সমাজের সকল দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব গ্রহণ করে এবং তিন সহস্রাধিক লোকের প্রকাশ্য অধিবেশনে সেই তিনদিন ব্যাপী বৈঠকের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সমূহ ঘোষণা করে। পাটনী পাড়ায় পরিত্যক্ত গ্রামের আম্রকুঞ্জের এই জনসভায় এই ঘোষণা সমূহ পাঠ করেন মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট দশরথ দেববর্মা (দশরথ দেব)। এই ঘোষণা করা হয় ১৯৪৯ সালের মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে (চৈত্রমাসে)। ঘোষণার বয়ানগুলির যতটুকু সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, তা থেকে এখানে কিছু কিছু উদ্ধৃত করার চেষ্টা করব। যথা ঃ

" আজ থেকে ত্রিপুরা সমাজের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক দায়িত্ব মুক্তি পরিষদ গ্রহণ করিল। আজ থেরে সরকারী জমির খাজনা দেওয়া বন্ধ ঘোষণা হইল। সরকারী অফিস - আদালতে যাওয়া নিষিদ্ধ হইল। যেখানে আমরা সুবিচার পাই না, সেই নরককুন্ডে আমরা আর পা দিব না। আমাদের বিচার ব্যবস্থা আমরা গড়িয়া তুলব। ইহা আমাদের জন্মগত অধিকার।"

এই প্রয়োজন মিটানোর জন্য মুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে অনেকধরনের কমিটি গড়ে ওঠে। প্রত্যেকেরই পৃথক পৃথক দায়িত্ব ছিল। প্রয়োজনে বন্দুক ধরতে হবে সকলেরই। রাজনৈতিক কমিটি, সামাজিক কমিটি, সালিশী কমিটি এই ধরনের কনিটি গড়ে তোলা হয়। এই কমিটিগুলির স্তর ছিল— গ্রাম্য, আঞ্চলিক, বিভাগীয় এবং কেন্দ্রীয় স্তর।

সালিশী কমিটিগুলি গঠিত হবার পর সালিশী কমিটিগুলির সদস্যদের অনেকেরই আত্ম দুর্বলতা প্রকাশ করতে থাকেন এবং বলেন ঃ " আমরা লেখা পড়া জানি না। আইন পুস্তক পড়ি না। ন্যায় অন্যায় বুঝব কি করে?" মুক্তি পরিষদের প্রেসিডেন্ট সালিশী কমিটির সম্পাদকদের উদ্দেশ্যে এক সারকুলারে জবাব দিলেন— " আমরা বুর্জোয়া আইনের ভিত্তিতে সালিশী করিতেছি না। কাজেই বুর্জোয়া আইন কানুন না জানার জন্য আপনাদেরপ জনগণের বিরোধ মিমাংসা করিতে অসুবিধা হবে না। বরং ঐ কুটীল মারম্যাচ বিদ্যা আয়ত্ব থাকিলেই আপনাদের দ্বারা বিচারের প্রার্থীদের প্রতারিত ও বঞ্চিত

হইবার বেশী আশঙ্কা থাকিত। আপনাদের আপনাদের কাজন হইবে— গ্রামের চোর ও দুষ্ট প্রকৃতির লোকদের দমন করা। চোর, ডাকাত এবং নারী ধর্ষণকারীদের চিনিবার জন্য আইন পুস্তক পড়িতে হয় না। আপনারা জমির বিরোধ মীমাংসা করিবেন। তার জন্য বেশী আইন পড়িতে হইবে না। কে কোন জমি আবাদ করিয়াছেন, কত বৎসর ধরিয়া দখল করিতেছেন, তাহা যাচাই করিবার জন্য তহশীল কাছারির রেকর্ড দেখিতে হইবে না। গ্রামের প্রাচীন বা প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছ হইতেই ইহার সঠিক বিবরণ সংগ্রহ করিতে পারিবেন। সরকারী কর্মচারীদের ঘুষ দিয়া অন্যের আবাদী জমি নিজের নামে রেকর্ড করাইয়া লইলেই তাহাকে জমির মালিকানা দিব না। যে ব্যক্তি জমি আবাদ করিয়াছেন তিনিই মালিক হইবেন। মনে রাখিবেন কেহ গোপনে জমি আবাদ করিতে পারেন না! জঙ্গলা জমি আবাদ করা একদিন বা এক রাত্রির কাজ নহে। জঙ্গল ভাঙ্গা এবং মাটি কাটার সময় গ্রামের কেহ নাও দেখিতে পারেন। এই সত্যটুকু খুঁজিয়া বাহির করিতে বেশী পুঁথিগত পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন পড়ে না।"

" মনে রাখিবেন সরকারী অফিস আদালত, বুর্জোয়া বিচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করিয়া আইনের নামে, সুবিচারের নামে যে এক শ্রেণীর শোষক, প্রতারক ও স্বার্থান্ধ দল গড়িয়া উঠিয়াছে তাহারা দুষ্টদের শাস্তি দেয় না। শিষ্টের পালন করে না! বরং নানা ছল ছাতুরী ও প্রতারণার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সমাজের দেহে অপরাধ প্রবণতা বাড়াইয়া দেয়। এই পথ আপনাদের পথ নহে। গ্রামের জনগণই আপনাদের কাজে সহায়ক হইবেন। তাহাদের সতর্ক দৃষ্টি এড়াইয়া চলিবার উপায় খুনী, ডাকাত, চোর ও বদমায়েসদের থাকিবে না। আপনাদের ন্যায়-নিষ্ঠা এবং জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা থাকিলে যে কোন জটিল মালা মীমাংসা করিতে আপনাদের বেশী বেগ পাইতে হইবে না। মনে রাখিবেন, আমাদের ত্রিপুরী সমাজে এখন পর্যন্ত মারাত্মক ধরণের অপরাধ প্রবণতা মাথা চাড়া দিয়া উঠে নাই। ত্রিপুরীগণ এখন পর্যন্ত নিখুঁতভাবে মিথ্যাকে সাজাইয়া বলিতে শিখেন নাইএ। কাজেই আপনাদের কাজে বেশী বেগ পাইতে হইবে না।"

অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে, প্রেসিডেন্টের (লেখকের) এই প্রত্যয় সালিশী কমিটির সদস্যগণ এবং জনতা বাস্তব কাজকর্মের দ্বারা সঠিক বলে প্রমাণিত করেছেন। এই সালিশী কমিটিগুলি গুপ্ত-হত্যাকান্ডের রহস্য উদ্‌ঘাটন করতেও সমর্থ হয়েছেন। বিচারকদের নিষ্ঠা এবং জনগণের সহযোগিতাই এই সাফল্যের মূল কারণ।

মুক্তি পরিষদের অপর আর একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে ঃ জমির ফসলের উৎপাদন বাড়িতেছে না, অথচ হালবলদের ভাড়া ও জমি বর্গার হার বাড়িতেছে। ইহা কংগ্রেস

শাসনের নূতন অভিশাপ। ইহা নিঃসন্দেহে গরীব কৃষক ভাগ চাষীদের জীবন ধারণের উপর আর একটি নূতন চ্যালেঞ্জ। গরীবদের উপর এই নূতন হামলার মোকাবেলা করার জন্য মুক্তি পরিষদ বদ্ধ পরিকর। সশস্ত্র প্রতিরোধ সংগ্রাম সাফল্যমণ্ডিত করিয়া ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের জন্য শোষণহীন, নির্যাতন বিহীন, সুখী ও সম্পদশালী ত্রিপুরা গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ প্রয়োজন গরীব, মাঝারী এবং ধনিক কৃষকদের সংগ্রামী ঐক্য গড়িয়া তোলা। মুক্তি পরিষদ সেই সংগ্রামী ঐক্য এবং পারস্পরিক মৈত্রী সম্পর্ক গড়িয়া তুলিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের বৈপ্লবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে চায়। তাই প্রাথমিক সূচনা হিসাবে মুক্তি পরিষদ নিম্নলিখিত ঘোষণা দিতেছে।

১) এক হাল বলদের বর্গার ধান বৎসরে ৯ মণের বেশী হইতে পারিবে না। (বর্তমান উর্দ্ধে বার মণ ধান চালু আছে।) ২) এক হাল মহিষের বর্গার ধান ১২ মণের বেশী হইতে পারিবে না। (বর্তমানে উর্দ্ধে ১৫ মণ চালু আছে)। ৩) এক কাণি জমির বর্গার ধানের হার (আউস এবং আমন ফসল একত্রে) বার্ষিক তিন মণের বেশী হইতে পারিবেন না। সাধারণতঃ এই তিন মণ ধান আমন ফসলের সময় দেওয়া হইবে। ৪) জমির মালিক যদি হালের বলদ এবং বীজ ধানের পরিমাণ ধান বর্গাদারের নিকট হইতে পাইবেন। জমি বর্গার ভাড়ায় ধানের সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নেই। ৫) প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা ঘোরতর অসুখ বিসুখের জন্য বর্গাদার ঠিকমত ফসল করিতে না পারিলে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে সালিশী কমিটিগুলি উপরোক্ত হারের তারতম্য করিতে পারিবে এবং সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় কমিটির অনুমোদন লাগিবে।

মহাজনী শোষণের বিরুদ্ধে মুক্তি পরিষদের অপর আর একটি ঘোষণায় বলা হয়েছে — "ত্রিপুরার পর্বতবাসীদের দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে মহাজন সম্প্রদায় প্রদত্ত ঋণের উপর অতিরিক্ত চড়া হারে এবং চক্রবৃদ্ধিহারে সুদ আদায় করিয়া তাহাদিগকে সর্বস্বান্ত করিতেছে। এই শোষিত ও লুণ্ঠিত গরীব অংশের জনগণকে রক্ষা করিবার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়া মুক্তি পরিষদ ঘোষণা করিতেছে যে, আজ থেকে প্রদত্ত ঋণের মূলধনের উপর সোয়াইয়া (শতকরা ২৫ ভাগ) হারের বেশী সুদ লইতে পারিবে না। মহাজনরা কর্জ বা দাদন যে সর্ত্তেই ঋণ দিয়া থাকুন না কেন সর্ব ক্ষেত্রেই এই সোয়াইয়া হার প্রযোজ্য হইবে। পরিশোধের সময় পণ্যের বাজার দরের নিরিখে মাল দেওয়া হইবে। অর্থাৎ একমণ পাট বা কার্পাস বা ধান বা তিল দিবার সর্ত্তে যদি ৫টাকা দাদন নেওয়া হয় আর যদি পরিশোধের সময় ঐ পণ্যের মূল্য পনের টাকা হয় তাহা হইলে ৬ টাকা ৪ চার আনা নগদ টাকা (ক্যাশ) অথবা ঐ মূল্যের পণ্য দেওয়া হইবে। আগের সর্ত্তমতে ১৫ টাকা মূল্যের একমণ পণ্য দেওয়া হইবে না। মুক্তি পরিষদ মনে করে এই হারে দেওয়া

হইলে মহাজনদের উপর কোন অবিচার করা হয় না। তাহারা শতকরা ২৫ ভাগ সুদ পাইতেছেন কাজেই তাহাদের লোকসান নাই।

শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা মুক্তি পরিষদের লক্ষ্য। কিন্তু মুক্তি পরিষদ এ বিষয়ের সচেতন যে ত্রিপুরার বর্তমান সমাজ কাঠামোতে (ত্রিপুরায় গরীবদের কৃষি কাজ পরিচালনা করতে আরো কিছুদিন মহাজনদের দ্বারস্থ হইতে হইবে। তাহাদিগকে এখনই সম্পূর্ণ বর্জন করা সম্ভব হইবে না। কেন না মুক্তি পরিষদ এখনই বিকল্প পুঁজি লগ্নির ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারিতেছেন না। গরীব কৃষকদের কর্মোদ্যোগ সচল রাখার জন্য মহাজনদেরকে এই কনসেসন (সুবিধা) দিতে বাধ্য হইতেছে। মহাজনদেরও এই ব্যাপারে সহযোগিতা করা উচিত। ইহাই হইবে মহাজনী শোষণ নিয়ন্ত্রণের নিম্নতম প্রাথমিক পদক্ষেপ।"

"ত্রিপুরী সমাজের সামাজিক যৌথ উদ্যোগ প্রত্যেকটি গ্রাম কমিটির নেতৃত্বে ধর্মগোলা গড়িয়া তুলিতে হইবে। স্বচ্ছল কৃষকদের নিকট হইতে আপোষ আলোচনার ভিত্তিতে এই ধান সংগ্রহ করিতে হইবে। অভাবে মরসুমে তাহা গরীবদের খোরাকী এবং বীজধান রূপে বিলি করা হইবে। ফসল উঠার সঙ্গে সঙ্গেই প্রদত্ত ধান আদায় করা হইবে। সোয়াইয়া হিসাবে সুদ গ্রহণ করা হইবে। কয়েক বৎসর পরিচর্যা করিবার পর ধর্মগোলার কলেবর বৃদ্ধি হইলে বিনাসুদে ধর্মগোলার ধান কর্জ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হইবে। ধর্মগোলার উদ্দেশ্য হইল— বিকল্প মহাজনী ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা নয় ; সুদখোরী মহাজনী ব্যবস্থার বিনিময়ে সুদ হীন লগ্নি পাইবার বিকল্প ব্যবস্থা গড়িয়া তোলা। জনগণের যৌথ উদ্যোগ এবং পরিচর্যার উপরই নির্ভর করিতেছে গ্রামের গরীবদের জন্য বিকল্প পুঁজির ব্যবস্থা গড়িয়া তোলার এই ধর্মগোলার সাফল্য।"

" যৌথ উদ্যোগে বিল জলাশয়গুলিতে মাছের চাষ করিতে হইবে। পরিত্যক্ত গ্রামের ফলের গাছগুলি আর বেওয়ারিশ মাল হিসাবে ফেলিয়া রাখা হইবে না। কমিটির রক্ষণাবেক্ষনে সেই পরিত্যক্ত আম, কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের বাগানগুলি থাকিবে। ফসল বিক্রয়ের অর্থ কমিটির নিয়ন্ত্রণে ব্যয়িত হইবে।"

" যৌথ শ্রমদানের ভিত্তিতে ধর্মগোলার জন্য পতিত ও খাস জমিতে যৌথ চাষ, যৌথদানের ভিত্তিতে অবস্থাবান কৃষকদের মাঠে কাজ করিয়া ধর্মগোলার জন্য অর্থ সংগ্রহ প্রভৃতি কাজে কর্মদ্যোগ গড়িয়া তুলিতে হইবে। গ্রাম কমিটিগুলির বিবেচনায় এই ঐ অর্থ ব্যয়িত হইবে। উচ্চ কমিটিগুলি এই তহবিলে হাত দিবে না। ধর্মগোলায় হাত দিবে না।"

মুক্তি পরিষদের সমাজ সংস্কার ঘোষণায় বলা হয়েছে — " আজ থেকে ত্রিপুরী

সম্প্রদায়ের সামাজিক দায়িত্ব মুক্তি পরিষদ গ্রহণ করিল। সরকারী আদালতেব বিচারপতিরা ত্রিপুরী সমাজের লোক নহেন। তাঁহারা ত্রিপুরী সমাজের রীতিনীতি জানে না। তাঁহারা ত্রিপুরী ভাষা জানে না। সামাজিক মামলায় জড়িত হইলে ত্রিপুরী নারী ও পুরুষেরা বাংলা ভাষা না জানার জন্য বাঙ্গালী বিচারকদের সামনে মনের ভাব প্রকাশ করিয়া বলিতে পারেন না। সুবিচার পাওয়া ত দূরের বস্তু। মহারাজার আমলেও সামাজিক প্লবিচার ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডলীদের হাতে ন্যস্ত ছিল। সামন্ত যুগীয এই বিচার কাঠামো বর্তমানে অচল। তাই মুক্তি পরিষদ রাজার মনোনীত "ত্রিপুর ক্ষত্রিয় মন্ডল বাতিল ঘোযণা কবিয়া সামাজিক কর্তব্য গ্রহণ করিল। মামলায় জড়িত ত্রিপুরী সমাজের নারী পুরুষ সালিশী বিচারকদের সামনে কক-বরকে বক্তব্য রাখিতে পারিবেন। প্রেমিক যুগলকে আর চিহ্নিত হতিে হইবে না — " চুংব কক্ ওয়ান্‌জুয় মান্‌য়া, হাকিম কক্-বরক মানযা, দিন অ দিন দশা নাংগুই ফাইফুরু তমা জবান ব রিনাই।" এই কথা বলে।

এই গান ত্রিপুরী সমাজে প্রচলিত। কোন এক যুবক এক যুবতীর কাছে প্রেম নিবেদন করলে যুবতী গানের মাধ্যমে জবাব দেন যে আমরা বাংলা ভাষা জানি না। বাঙ্গালী হাকিন ত্রিপুরী ভাষা জানেন না। দৈব বিপাকে যদি আমাদের হাকিমের দরবাবে উপস্থিত হতে হয় তা হলে কোন ভাষায় জবাব দিয়ে আমরা আর পার পাব? যুবকটি তাব সদোত্তর দিতে না পেরে কেবল বলেছিল— "কক্ নি বদলা ফিকুং রিংয়ানুত্‌মা নুং বন ওযানা।" ভাষায় বদলে পিঠ দেবো তার জন্য ভাবনা কি।

সেই সামাজিক সাবকুলাবে আবো বলা হয়েছে যে— " সামন্ত যুগীয জীর্ণ কু আচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ত করিবেই, তদুপবি ত্রিপুবীদের মাতৃভাযায় সামাজিক বিচারাদি পরিচালণা করিতেও বদ্ধ- পরিকর। ত্রিপুবী প্রেমিক যুগলেব অন্তবের বেদনাপ্লুত আশঙ্কার নিরসন করিতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।"

(জ্বালা।।মার্চ-এপ্রিল, ১৯৭৫)

জমি সিলিং এর কয়েকটি দিক

ত্রিপুরা ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন ১৯৬০ সালে প্রথম পার্লামেন্টে পাস হয়। ১৯৭৪ সালে ত্রিপুরা বিধানসভায় এই আইন দ্বিতীয়বার সংশোধন করা হয়। ১৯৭৫ সালে এই আইন তৃতীয়বার সংশোধন করা হয় এবং ১৯৭৬ সালে তা চতুর্থবারের মত সংশোধন করা হয়। এই সংশোধনের পর ভূমি হোল্ডিং এর উর্দ্ধসীমা যা দাঁড়াল তা নিম্নরূপ ঃ

১। একজন প্রাপ্ত বয়স্ক অবিবাহিত ব্যক্তি দুই স্ট্যান্ডার্ড হেক্টর অর্থাৎ ১২ কানি ১০ গন্ডা জমি রাখতে পারবেন

২। কোন পরিবারের যদি একজন মাত্রই জীবিত থাকেন তা হলে তিনি দুই হেক্টর অর্থাৎ সাড়ে বার কানি জমি রাখতে পারবেন।

৩। যে পরিবারে দুইজন বা তার অধিক ব্যক্তি আছেন কিন্তু পাঁচ জনের উর্দ্ধে নয়, সেই পরিবারের সর্বোচ্চ পরিমাণ চার হেক্টর অর্থাৎ ২৫ কানি জমি রাখতে পারবেন।

৪। যে পরিবারে পাঁচ জনের অধিক সংখ্যক লোক আছে সেই পরিবারের প্রথম পাঁচ জনের জন্য ২৫ কানি এবং অতিরিক্ত প্রত্যেকের জন্য মাথা পিছু ৩ কানি ১৫ গন্ডা ভূমি রাখতে পারবেন। পরিবার জনসংখ্যা যতই হউক না কেন কোন অবস্থাতেই ৭.২০ হেক্টর অর্থাৎ ৫০ কানির বেশী জমি সেই পরিবার রাখতে পারবেন না।

একান্নভুক্ত পরিবারের যতজন ব্যক্তির নামে জমি থাকার সবগুলিই একত্রে হিসাব করে তা সেই পরিবারের জমিরূপে গণ্য করা হবে।

পরিবারের সংজ্ঞা

১। পরিবারের কর্তা, তার স্ত্রী অথবা স্বামী এবং অন্যান্য বয়স্ক সন্তানগণ সকলেই পরিবারভুক্ত বলে গণ্য হবেন।

২। পরিবারের কর্তার অবিবাহিত প্রাপ্ত - বয়স্ক পুত্র যার নামে জমি নাই তাকেও পরিবারভুক্ত গণ্য করা হবে।

৩। পরিবারের কর্তার বিবাহিত পুত্র ও পুত্রবধু এবং তাদের সন্তানগণকে পরিবার অন্তর্ভুক্ত বলে ধরা হবে যদি তাদের কারো নামে জমি না থাকে।

৪। পরিবারের কর্তার বিধবা পুত্রবধু এবং তার সন্তানগণকেও সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত গণ্য করা হবে যদি তাদের কার ও নামে জমি না থাকে।

৫। পরিবারের কর্তার মৃত পুত্র ও মৃত পুত্রবধুর ছেলে বা মেয়েরা অবিবাহিত হলে এবং এদের নামে অন্য কোন জমি না থাকলে এরাও সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে গণ্য হবে।

উপরোক্ত আইনের ধারা অনুযায়ী দেখা যায় যে জমির মালিকের বিবাহিত পুত্রের নামে জমি থাকলে তার জমি সেই পরিবারের জমি বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ পৃথক পরিবার বলে গণ্য হবে।

এখন জমির সিলিং নির্ণয় করতে গিয়ে উপজাতি পরিবারগুলির ক্ষেত্রে একটি আইনগত অসুবিধা দেখা দিয়েছে। প্রথমতঃ চিরাচরিত প্রথামতে প্রায় উপজাতি পরিবারগুলির জমিই পিতা বা বড় ভাই এর নামে। মৌখিকভাবে ভাগাভাগি করে অংশীদাররা নিজ নজ প্লটের জমি নিজ নিজ নামে নামজারী করেন নাই। বর্তমান সিলিং আইন প্রয়োগ করতে গিয়ে উক্ত জমিগুলি একই ব্যক্তির নামে গণ্য হয়ে যাওয়ায় কোন কোন ক্ষেত্রে সিলিং লিমিটের উর্দ্ধে বলে একটা অংশ সরকারের দখলে যাবার উপক্রম হয়েছে। অথচ পরিবারগুলি দীর্ঘ দিন ধরেই পৃথক হয়ে নিজ নিজ প্লট চাষ আবাদ করে এসেছেন। এই ধরণের জমিগুলির সিলিং আওতায় আনার সময় তাদের পৃথক পৃথক পরিবার রূপে গণ্য করা প্রয়োজন বস্তুত এরা পৃথক পরিবার।

এমন ঘটনাও দেখা গিয়েছে যে ১০/১২ বৎসর আগে অ নেক পিতারা মৌখিকভাবে নিজ কন্যা বা পুত্রকে জমি ভাগ করে দিয়েছেন। তদাবধি তাঁরা সেই জমি চাষ করছেন এবং পিতার পরিবার থেকে পৃথকভাবেই বাস করছেন। কারো কারো ছেলে মেয়েরা বিবাহযোগ্য হয়েছেন। এই জমি আইনগতভাবে রেজিষ্ট্রি করে না দেবার মূলে একটি মনস্তত্বঃ কাজ করছিল। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে, জমি নাম জারী করে দেবার পর জামাতা বা পুত্রগণ সেই জমি বিক্রয় করে ভূমিহীনে পরিবর্তন হন। এই ধরনের দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যই অনেকে জমি রেজিষ্ট্রী করে দেন নাই। ১৯৭৪ সালে সিলিং আইন পাস হবার পর কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে পূর্ব থেকে এই ধরনের ভাগ করা জমি বিবাহিত পুত্র বা মেয়ের নামে রেজিষ্ট্রী করে দেওয়া হয়েছে। যেহেতু ১৯৭৪ সালের ত্রিপুরা ভূমি রাজস্বও ভূমি সংস্কার আইনের ১৬৮ ধারায় বলা হয়েছে যে, ১৯৭১ সালের ২৪ শে ফেব্রুয়ারী থেকে কোন ব্যক্তি তার জমির সিলিং নির্ণয় না হওয়া পর্যন্ত নিজ জোতের কোন ভূমি বিক্রয়, দান,বন্ধক, বিনিময় প্রভৃতি করতে পারবেন না। কাজেই এই ধারা অনুযায়ী ১৯৭১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর পর থেকে যারা নিজ ছেলে বা মেয়েকে জমি রেজিষ্ট্রারী করে দিয়েছেন তাদের সেই হস্তান্তরিত আইনের চোখে বৈধ গণ্য হচ্ছে না। কিন্তু ১৯৭১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর পর হস্তান্তর রেজিষ্ট্রী করা হলেও বস্তুত আরও ১০/১২ বছর আগে সেই

জমিগুলি বর্তমান দখলদারদের ভাগ করে দেয়া হয়েছিল। কাজেই যে সব ক্ষেত্রে ছেলে মেয়ে পৃথক পরিবার রূপে বাস করছেন এবং পিতার মৌখিক অনুমতিক্রমে সেই জমি চাষ করছেন সেই সব ক্ষেত্রে পিতার জমির সিলিং নির্দ্ধারণের সময় সেই জমি বাদ দেওয়া দরকার। ১৯৭১ সালের ২৩ শে ফেব্রুয়ারীর পর হস্তান্তর রেজিষ্ট্রী করা জমি সেই পুত্র বা কন্যাকেই দেওয়া উচিত। পিতার হোল্ডিং এ অন্তর্ভুক্ত করে সেই জমি সিলিং লিমিটেডের বহির্ভূত বলে সরকারী দখলে এনে সেই জমি থেকে দখলদার পুত্র বা কন্যাকে বঞ্চিত করার কোন স্বার্থকতা নেই যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের হোল্ডিং সিলিং লিমিটেডের বেশী জমি না হয়। এই ধরণের হস্তান্তর যাতে আইনগত সিদ্ধ হয় তদনুযায়ী আইন সংশোধিত হওয়া দরকার। আইন পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উপজাতিদের চিরাচরিত প্রথা রাতারাতি বদলে যায় না। কাজেই যা বেনামী হস্তান্তর নয়, যা জীবন্ত ছেলে মেয়েদের নামে হস্তান্তর করা হয়েছে রেজিষ্ট্রী হলেও তা আইনের স্বীকৃতি পাওয়া দরকার। উপজাতি পরিবারদের এই অসুবিধার দিকটার প্রতি কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে।

এখানে বলা দরকার যে, আইন ফাঁকি দিয়ে সিলিং বহির্ভূত প্রচুর জমি রাখার মত পরিস্থিতি উপজাতিদের নাই বললেও চলে। যা ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তা আসলেই পৃথক পরিবার। এবং বস্তুতই নিজ ছেলে মেয়েদেরই ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। আর একটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত উপজাতি জোতদারদের সিলিং বহির্ভূত বাড়তি জমি পাওয়া যাবে তা উপজাতি গরীব ও ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করতে হবে। উপজাতির জমি অউপজাতিদের নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ ভূমি আইনের সেই ধারাটি সে ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে হবে। উপজাতি এলাকার অখন্ডতা রক্ষার প্রয়োজনেই উপজাতি জোতদারদের বাড়তি জমি অউপজাতির নিকট হস্তান্তর নিষিদ্ধ হওয়া উচিত।

('দেশের কথা', ১০ ম বর্ষ, ৪০ শ সংখ্যা, শুক্রবার ১১ই আষাঢ় ১৩৮৩ বাংলা ২৫ শে জুন, ১৯৭৬ ইং)

কপট উপজাতি দরদ

এবারকার ৬ষ্ঠ লোকসভা নির্বাচন আরও স্পষ্ট করে দিল যে , সি পি আই এবং উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের স্বার্থরক্ষার পথে সকল প্রকার বাঁধা সৃষ্টি করেছেন। এই রাজনৈতিক দলই উপজাতি দরদী সেজে উপজাতিদের জন্য কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন আর ঠিক প্রয়োজন মুহূর্তে উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার পথের কাঁটা হয়ে উঠেন। আলোচ্য প্রবন্ধে তার কয়েকটি উদাহরণ তুলে ধরব। তবে এই প্রসঙ্গে যাবার আগে অতীত ইতিহাস সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলতে চাই।

প্রথমতঃ এটা অস্বীকার করা যায় না যে তেরশত বৎসর ত্রিপুরার রাজাদের শাসন ত্রিপুরায় উপজাতিদের 'অজ্ঞানের অন্ধকারে' আবদ্ধ রেখে এই নিরীহ জনগণের উপর অবাধ শাসন এবং শোষণ চালিয়ে ছিলেন। এই রাজাদের কাছে উপজাতিরা পেয়েছিলেন কেবল শোষণ, নির্যাতন, প্রতারণা, বঞ্চনা, নিরক্ষরতা ও দারিদ্র্যের চরম অভিশাপ। নিরীহ উপজাতি জনগণ এই দুরবস্থাকে সামন্ত শাসনের অভিশাপ বলে ভাবতে পারেন নাই - তাই এই অবস্থার বিরুদ্ধে তাদের কোন প্রতিবাদ ছিল না। কোন অভিযোগ ছিল না। এই সরল ও সোজা মানুষগুলো একে বিধিলিপি বলে মেনে নিয়েছিলেন। এই অচেতন উপজাতিদের প্রথম ঘুম ভাঙ্গালেন ত্রিপুরা রাজ্য জনশিক্ষা সমিতি।

ভারত স্বাধীন হবার পর যদিও আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তি ঘটে ১৯৪৯ সালে অর্থাৎ মহারাজা বীর বিক্রমের মৃত্যুর পর, কিন্তু বীর বিক্রমের জীবিত কালেই ১৯৪৬ সালেই ত্রিপুরার ভারতভুক্তি পাকাপাকি হয়ে যায়। মহারাজা এবং তার উত্তরাধিকারীগণ বার্ষিক সাড়ে তিন লক্ষ টাকা রাজন্য ভাতা, মালঞ্চবাস (বর্তমান গর্ভনর হাউস) সমেত কুঞ্জবনের সমগ্র ভূমি ও উজ্জয়ন্ত রাজপ্রসাদ সহ রাজবাড়ী কমপাউন্ডের সমগ্র ভূমি ব্যক্তিগত সম্পত্তি রূপে পাবেন। আর ত্রিপুরা রাজ্যের শাসনভার রাজাদের হাতে থাকবে না। আনুষ্ঠানিক ভাবে ত্রিপুরার ভারত ভুক্তির পর তাই হল।

যে উপজাতিরা মহারাজাকে 'নরনারায়ণ' মনে করতেন, দেবতুল্য ভক্তি শ্রদ্ধা করতেন, নিজেদের একমাত্র নির্ভরযোগ্য মনে করতেন সেই উপজাতিদের কথা কিন্তু মহারাজা আদৌ ভাবলেন না। সেই অন্তর্ভূক্তির দরকষাকষির সময়, অন্তর্ভূক্তির আলোচনার সময় কেবল আপন পরিবারের লোকদের কথাই ভাবলেন। তাই অন্তর্ভূক্তির সনদে ত্রিপুরার উপজাতিদের বিশেষ রক্ষা কবচের কোন উল্লেখই রইল না।

মহারাজা বীরবিক্রমের মৃত্যুর পর ত্রিপুরার দেওয়ানী শাসন প্রবর্তিত হল।

নাবালক কিরীট বিক্রমের পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনার জন্য কিরীট বিক্রমের বিধবা মাতা মহারাণী কাঞ্চন প্রভা দেবীকে চেয়ারম্যান করে ত্রিপুরার রিজেন্সী কাউন্সিল গঠিত হল। রিজেন্সি কাউন্সিল বস্তুতঃ শিখন্ডী হয়ে থাকল আর প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী হলেন দিল্লীর কংগ্রেস সরকার প্রেরিত দেওয়ান উপাধিকারী ব্যক্তিটি।

এই আমলা প্রধানটি এসেই জনশিক্ষা সমিতির নেতাদের বিরুদ্ধে ওয়ারেন্ট জারী করলেন। তাদের গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে সমগ্র উপজাতি জনগণের উপর তীব্র দমননীতি চালালেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ১৯৪৫ সালে জনশিক্ষা সমিতির নেতৃত্বে ত্রিপুরায় নিরক্ষতা দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু হয়। গ্রামে গ্রামে বেসরকারী প্রাইমারী স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই খোয়াই সদর ও কমলপুর বিভাগে উপজাতিদের মধ্যে নবজাগরণ দেখা দেয়। মহারাজা বীর বিক্রম যেমন জনশিক্ষা আন্দোলনের নেতাদের জেলে আটক করে নিজেদের বশংবদ ব্যক্তিদের নিয়ে 'ত্রিপুর সংঘ' নামে একটি পাল্টা দল গঠন করে জনশিক্ষা সমিতিকে ধ্বংস করতে অগ্রসর হয়েছিলেন, তেমনি পরবর্তী শাসক কংগ্রেস সরকার এই জনশিক্ষা সমিতির উপর আক্রমণ শুরু করলেন। নেতৃবৃন্দকে জেলে আটক করার জন্য ওয়ারেন্ট জারী করলেন। তাদের গ্রেপ্তারের জন্য উপজাতিদের গ্রামে গ্রামে পুলিশী সন্ত্রাস চালালেন। গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হওয়ায় শেষ পর্যন্ত সমগ্র খোয়াই বিভাগে সামরিক শাসন জারী করলেন। সোজা কথায় সিভিল এডমিনিস্ট্রেশনের পরিবর্তে মিলিটারী শাসন কায়েম করলেন।

শুধু তাই নয়, উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল বিশেষতঃ উপজাতিদের জন্য ১৯০১ সাল থেকে সংরক্ষিত (ট্রাইবেল রিজার্ভ) ভূমির এক বিরাট অংশ মুক্ত করলেন রিজেন্সী কাউন্সিলের চেয়ারম্যান মহারাণী কাঞ্চনপ্রভা দেবীর আদেশ অনুবলে। এই সর্ব প্রথম কংগ্রেস সরকার উপজাতিদের রক্ষা কবচের উপর আঘাত হানলেন। এই রিজার্ভ মুক্তিই পরবর্তী সময়ে ত্রিপুপার শত শত উপজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদের প্রক্রিয়াকে তরান্বিত করে। ট্রাইবেল কমপ্যাক্ট এলাকা ছিন্ন ভিন্ন করে, হাজার হাজার জুমিয়াদের ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হবার সকল সম্ভাবনা নির্মূল করে দেয়।

অথচ উপজাতি যুব সমিতির নেতারা এই কংগ্রেস সরকারকেই উপজাতিদের বন্ধু মনে করেন। ত্রিপুরার উপজাতিদের রক্ষা কবচ সমূহের উপর কংগ্রেস সরকারের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি দৃঢ়তার সাথে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে এসেছেন উপজাতি যুব সমিতি কংগ্রেসের সহযোগিতন্দ্বয়

সেই উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করেন। তাদের এই কাজ উপজাতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধে।

১৯৪৮ সাল থেকে কংগ্রেস সরকার যে বর্বর দমণ পীড়নের সাহায্যে ত্রিপুরায় উপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমণ করতে সচেষ্ট ছিলেন, ট্রাইবেল রিজার্ভ কার্যতঃ অকেজো করে রেখে উপজাতিদের জমি থেকে উচ্ছেদের যজ্ঞে মত্ত হয়ে উঠেন সে সম্পর্কে ত্রিপুরার রাজন্য ভাতা ভোগীরা ভুলেও টু শব্দ করেন নাই। নাবালক কিরীট বিক্রম সাবালক হলেও উপজাতি জনগণের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে একটি কথাও উচ্চারণ করেন নাই, উপজাতি জনগণের আত্মরক্ষার সংগ্রামে তাদেব পাশে এসে দাড়ান নাই, ত্রিপুরায় উপজাতিদের সম্পর্কে কিছু ভাবা তো দূরের কথা, ত্রিপুরাযে শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত এক উপজাতি জনসমষ্টি রয়েছেন তাও রাজপুত্র কিরীট বিক্রমের চিন্তা চেতনায় ছিল কিনা বলা শক্ত। ১৯৬৭ সালে কংগ্রেস তাকে লোকসভার প্রার্থী দাঁড় করাবার পূর্ব পর্যন্ত তাঁর চেহারা দেখা তো দূরের কথা তার নামটুকুও বেশীর ভাগ উপজাতিদের জানাচ্ছিল না।

লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় উপজাতিদের রক্ষা কবচ সম্পর্কে তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হওয়ার পর ত্রিপুরায় উপজাতিদেব রক্ষা কবচ সম্পর্কে তিনি লোকসভার ভেতরে এবং বাইরে কিছু বলেছেন কিনা তা আজ পর্যন্ত ত্রিপুরাবাসীর অজানাই রয়ে গেল। এও দেখা গেল - ট্রাইবেলদের উপর কংগ্রেস সরকারের আক্রমণের সম্পর্কে যে ব্যক্তিটি মুক ও বধির ছিলেন তিনি রাজন্য ভাতা বিলোপের প্রশ্নে আবার সরব হয়েই উঠেননি। প্রতিবাদে কংগ্রেস ছাড়েন। লক্ষ্য করা দরকার, উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রে যে কিরীট বিক্রম মুক ও বধির সেই কিরীট বিক্রমকেই উপজাতি যুব সমিতি বেছে নিলেন ট্রাইবেল স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামের সেনাপতি হিসেবে, উপজাতি যুব সমিতির পৃষ্ঠপোষক ও উপদেষ্টা হিসেবে। উপজাতি যুব সমিতি আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুরূপে বেছে নিলেন রাজা বা রাজপুরুষরা নন, যারা ত্রিপুরায় উপজাতিদের শত শতাব্দী ধরে পঙ্গু, বধির ও অন্ধকার রেখেছিলেন, সে কংগ্রেস নন, যাদের জাঁতা কলে পিষ্ট হয়ে ত্রিপুরার উপজাতি এই তিন দশক সময়ের মধ্যেই সম্পূর্ণ ক্ষত বিক্ষত, তারা আক্রমণের লক্ষ্য বস্তুরূপে বেছে নিলেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ যারা রাজরোষ অগ্রাহ্য করে কংগ্রেস সরকারের সকল অত্যাচার ও উৎপীড়ন অগ্রাহ্য করে উপজাতিদেরক বিশেষ অধিকার রক্ষার জন্য নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে এসেছেন।

১৯৭১ সালের লোকসভার নির্বাচনেও উপজাতি যুব সমিতির আক্রমণের

লক্ষ্যছিল মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি। পূর্ব ত্রিপুরার সংরক্ষিত আসনে তারা কিরীট বিক্রমকে সমর্থন করেন আর পশ্চিম ত্রিপুরার সাধারণ আসনে নিজস্ব প্রার্থী দাঁড় করিয়ে ট্রাইবেল ভোট বিভক্ত করে কংগ্রেসের জয়ের পথ দেখেন। বিশুদ্ধ উপজাতি আন্দোলনের আওয়াজ তুলে যাঁরা ট্রাইবেল জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চান বাঙ্গালী প্রধান কংগ্রেসকে সরাসরি সমর্থন করলে তাঁদের মুখোস খসে পড়বে এটা তারা ভালভাবেই জানেন। তাই অন্যভাবে কংগ্রেসকে তারা সাহায্য করেন।

কিরীট বিক্রম উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের চোখে ত্রিপুরায় উপজাতিদের ঐতিহ্যের রক্ষক বা পৃষ্ঠপোষক হতে পারেন কিন্তু বাস্তব বিচারে তা নয়।

উজ্জয়ন্ত রাজপ্রসাদ ও সেখানের সজ্জিত আসবাবপত্র এতদিন ত্রিপুরার দর্শনীয় বস্তু হিসাবে সমাদৃত। যত নগন্যই হোক এগুলির সাথে ত্রিপুরায় ঐতিহাসিক স্মৃতি বিজড়িত। রাজতন্ত্রের অবসান আমাদের কাম্য কিন্তু যা রাজতন্ত্রের সাথে ত্রিপুরাবাসীর ঐতিহ্য জড়িত তা ধ্বংস করা ত্রিপুরাবাসীর কাম্য হতে পারে না। রাজপ্রাসাদে রক্ষিত স্মৃতি বিজড়িত বস্তুগলি যাদুঘরে রক্ষিত হওয়া উচিত ছিল। রুশ বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাশিয়ায় জারতন্ত্রের ধ্বংস হয়েছে কিন্তু রাশিয়ার কমিউনিস্ট সমাজ জারেব আমলের স্মৃতি ধ্বংস করেন নাই। সযত্নে ঐ বস্তুগুলি যাদুঘরে রক্ষিত আছে। কারণ ঐ গুলিকে বাদ দিয়ে রুশয দেশের ইতিহাস লেখা যায় না। নিজস্ব সংস্কৃতি প্রত্যেক জাতির কাছেই ঐতিহাসিক গুরুত্ব বহন করে। কিন্তু কিরীট বিক্রমের কাছে তার মূল্যবোধ রইল না। তিনি উজ্জয়ন্ত প্রসাদ বিক্রয় করলেন। প্যালেসের সমস্ত জিনিস বিক্রয় করে দিয়ে ত্রিপুরার শেষ স্মৃতি টুকু ও মুছে ফেললেন। বণিক দৃষ্টিভঙ্গীর এর চেয়ে বড় নিদর্শন আর কি হতে পারে? এই ব্যক্তিটিই নাকি উপজাতি যুব সমিতি নেতাদের চোখে আদর্শ পুরুষ। এবারের নির্বাচনেও তাঁরা তাকেই প্রার্থী করায় দরবার করতে দিল্লী ছুটেছিলেন। নিজেদের প্রার্থীর আমানত জব্দ হবে একথা নিশ্চিত জেনেও যে ট্রাইবেল বা বরাবর মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নিকটবর্তী ছিলেন সাম্প্রদায়িক বিষ ঢেলে তাদের বিভ্রান্ত করে তাদের ভোট বিভক্ত করে কংগ্রেস প্রার্থী কিরীট বিক্রমের জয়ের পথ করে দিতে সক্রিয় ছিলেন।

উপজাতি যুব সমিতির কার্যকলাপ নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, তাদের আসল উদ্দেশ্য রাজা জমিদার ও বৃহৎ পুঁজিপতিদের তল্পীবাহক শাসক কংগ্রেসের দালালী করা, কংগ্রেসকে ক্ষমতাসীন রাখা। আইনে আছে বিশেষ আর্থিক কারণ ছাড়া ট্রাইবেলদের জমি নন ট্রাইবেলদের কাছে হস্তান্তরের অনুমতি দেয়া হবে না। কোন আর্থিক সংকটে নিমজ্জিত হয়ে কিরীট বিক্রম তার কুঞ্জবনের জমি, রাজবাড়ীর জমি নন ট্রাইবেলদের কাছে অবাধ

হস্তান্তরের প্রতিবাদ করেছেন কি? এত জমি একটি পরিবারের হাতে রাখা যায় না এটা ঠিক, কিন্তু সেই জমি কেন ট্রাইবেলদের দেয়া হলো না? কারণ খুবই স্পষ্ট ধনিক ননট্রাইবেল ছাড়া এই জমির চড়ামূল্য ট্রাইবেলদের পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। লক্ষপতি কিরীট বিক্রমের হাতে আরো কয়েক লাখ টাকা তুলে দিতে হবে। তাই কোন প্রতিবাদ হয় না। কংগ্রেস সরকার কোন আপত্তি তুলেন না — বরং ঢালাও ভাবে অনুমতি দেন। গ্রামাঞ্চলের ট্রাইবেল ছাত্র-ছাত্রীদের সহরে আকার জায়গার অভাবে পড়া ছেড়ে দিতে হয়। কিরীট বিক্রমরাজবাড়ীর কিছু জমি কি দান করতে পারেন না ট্রাইবেল বোর্ডিং এর জন্য? উপজাতি যুব সমিতি তাদের প্রিয় নেতা কিরীট বিক্রমের কাছে সেই দাবী তুলেছেন কি?

১৯৭২ সালের বিধানসভার নির্বাচনে কংগ্রেস জয়ী হয়ে ত্রিপুরায় পুনরায় সরকার গঠন করেন। দেখা গেল সুখময় সেনগুপ্তের মন্ত্রীসভা গঠনের সাথে সাথে অভিনন্দন জানালেন উপজাতি যুব সমিতির নেতারা। এই উপজাতি স্বার্থ বিরোধী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসেনগুপ্তের গোপন কক্ষে ছলা পরামর্শের পরই ১৯৭৪ সালে এই উপজাতি মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষ সংগ্রামে নামেন। এই সংগ্রামের পেছনে কলকাঠি নাড়লেন সেনগুপ্ত সরকার। সকল প্রকার মদত যোগালেন সেনগুপ্ত সরকার। উপজাতি যুব সমিতি পরিকল্পিতভাবে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রতিটি জনসভায় হামলা করলেন আর সেই হামলায় মদত যোগালেন সেনগু প্ত সরকার। এখানে লক্ষ্যণীয় যে বাঙ্গালীদের ত্রিপুরার উপজাতি বর্তমান দুরাবস্থার জন্য দায়ী করে বাঙ্গালীদের উপজাতিদের প্রধান শত্রুরূপে চিত্রিত করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ট্রাইবেল নেতা ও কর্মীদের বাঙ্গালীর দালাল আখ্যা যে উপজাতি যুব সমিতি নেতারা উপজাতি জনগণকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছেন। বাঙ্গালী কংগ্রেস নেতা ও মন্ত্রীদের জনসভা গুলিতে ট্রাইবেলদের জড়ো করায় কাজে তাদেরই সবসময়ই সহযোগিতা করতে দেখা গেছে কংগ্রেসীদের সাথে একত্রিত হয়েই মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির মিটিংগুলির উপর হামলা চালান। এটা সকলেরই দেখা।

যে কংগ্রেস একটানা ৩০ বৎসরের শাসনে ত্রিপুরায় উপজাতিদের ঘর বাড়ী ভস্মীভূত ট্রাইবেল রিজার্ভের অস্তিত্ব বিলুপ্ত, বেআইনী ভাবে জমি হস্তান্তরিতের ফলে শত শত উপজাতি কৃষক আজ দিনমজুর ও ভিক্ষুকে পরিণত বন রিজার্ভের রাক্ষসী গ্রাসে জুম কাটার অধিকাংশ জীবন জীবিকা থেকে বঞ্চিত সেই কংগ্রেসকে ক্ষমতার গদীতে টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে এতদিন উপজাতি যুব সমিতি নিরলস ভাবে বশংবদ ভৃত্যের মত কাজ করছেন।

দেখা গেল রাজ্য সভার নির্বাচনের সময় থেকে সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভা নিজের দলের কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়কদের (এম এল এ) সাথে বিক্ষুব্ধ কংগ্রেসের ভোট একত্রিত হল। সুখময় সেনগুপ্তের সমর্থকরা পরাজিত হবার পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। তখন এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারাই বিধানসভায় থেকে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করা যাবে না, এই বিধানসভা বর্জন করা দরকার ইত্যাদি উপজাতি দরদের মুখরোচক। শ্লোগান তুলে উপজাতি সম্প্রদায়ভূক্ত এম এল এদের পদত্যাগ দাবী করেন। এল এল এরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করলে দলবদ্ধভাবে তাঁদের বাড়ী বাড়ীতে হামলা করে পদত্যাগ পত্রে সই করতে বাধ্য করতে উপজাতি ছাত্র যুবকদের উস্কানী দিতে থাকেন।

এই শ্লোগানের আসল উদ্দেশ্য ছিল সেনগুপ্ত সরকার যে বিপদমুক্ত করা। রাজ্যসভার নির্বাচনে যে বার জন কংগ্রেস এম এল এ কংগ্রেস প্রার্থীর বিরুদ্ধে ভোট দেন তাদের মধ্যে ১২ জন অউপজাতি। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিধায়কদের মধ্যে মাত্র ১৬ জন অউপজাতি। কাজেই বিধানসভার ১৯ জন উপজাতি সদস্য পদত্যাগ করলে বাকী থাকবে৪০ জন (একটি পদ শূন্য)।এই ৪০ জনের মধ্যে সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে থাকবে মাত্র সতের জন আর সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার সমর্থনে থাকবে ২৩ জন।(সংখ্যাগরিষ্ঠ)। উইপজাতি স্বার্থরক্ষা কথাটা উপজাতি যুব সমিতির একটা চাল মাত্র। আসল উদ্দেশ্য সেনগুপ্ত সরকারকে আসন্ন পতনের হাত থেকে রক্ষা করা। সেদিন তাদের এই কৌশল সফল কাম হলে আজ আজ সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার পতন এবং কোয়ালিশন সরকারের জন্ম হত না।

উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের বিবেক মতে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার প্রধান উপায় হল মার্ক্সবাদীদের খতম করা, ত্রিপুরার কংগ্রেসকে টিকিয়ে রাখা, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিষাক্ত করা। এটা যে কত মারাত্মক ভুলপথ, গণতান্ত্রিক শক্তিকে উপজাতিদের রক্ষা কবচের সমর্থনে টানতে না পারলে রক্ষা করা যাবে না একথা উপজাতি যুব সমিতির নেতারা উপলব্ধি করতে না পারলেও উপজাতি জনগণের উপলব্ধি করতে হবে। বুর্জোয়া নেতাও বুর্জোয়া দলের পেছনে ছুটে গরীব উপজাতিদের অধোগতি ছাড়া উর্দ্ধগতি হবার কোন কারণ নেই। অথচ উপজাতি যুব সমিতির নেতারা কংগ্রেসকে প্রভু সাজিয়ে রাখার চেষ্টার ত্রুটি করেন নাই।

উপজাতি যুব সমিতির নাটের গুরু সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভার পতনের শোক বিহ্বলতা কাটিয়ে উঠতে পারেন নাই। উপজাতি যুব সমিতির নেতারা প্রথমে গণজোয়ারের মুখে প্রথম কোয়ালিশন সরকারের প্রতি স্বাগত জানালেন। এখন আবার লোকসভার নির্বাচনের ফলাফলের ধূয়া তুলে এই মন্ত্রিসভার পতন ঘটাতে সরব হয়ে উঠেন। স্লোগান হলো- সি

পি আই (এম) লোকসভার দুইটি আসনেই পরাজিত হয়েছেন। কাজেই এদের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভায় স্থান হতে পারে না। সি পি আই(এম) কে মন্ত্রিসভা থেকে খারিজ হওয়ার অর্থই হল হয় মন্ত্রিসভার পতন কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসন, না হয় এককভাবে সি এফ ডি সরকার গঠন। এই অবস্থা উপজাতি জনগণের কাম্য হতে পারে না। অথচ উপজাতি যুব সমিতির কিছু নেতা তাই চান।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরায় কোনদিন সরকারী ক্ষমতায় বসেন নাই। কাজেই ক্ষমতার লালসার প্রশ্ন অবান্তর। তবে যে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা জন্ম লগ্ন থেকে দাবার গুটি হিসাবে চালিত হয়ে এসেছেন তাদের কাছে এই বাস্তববোধ আশা করা বাতুলতা মাত্র।

কোয়ালিশন সরকারের শরিক দল হিসাবে সরকারের মাধ্যমে এই সীমাবদ্ধ ক্ষমতার মধ্যে উপজাতি জনগণের কল্যাণ মূলক কিছু কিছু কাজে হাত দিতে শুরু করেছেন, কোয়ালিশন সরকারের অন্য শরিক দলের সাথে যৌথ উদ্যোগ গ্রহণে তৎপর হতে শুরু করেছেন এগুলো যে উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের কারো চক্ষুশূল হবে অভাবনীয় নয়। যারা উপজাতি দরদী ভূমিকায় অভিনয় করে আসলে তাদের কাছে এই ধরনের জঘন্য ভূমিকা ছাড়া মানুষ আর কি হতে পারেন। যে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা নিজ দলের প্রার্থীদের নিশ্চিত জামানত জব্দ হবে জেনেও নির্বাচনে প্রার্থী দেন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবিত উপজাতিদের ভোট নষ্ট করতে সেই মার্ক্সবাদীদের কোয়ালিশন সরকারের শরিক হতে দেখে এই উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের একাংশ অস্বস্তি বোধ করবেন এট অনবোধ্য নয়।

দুর্নীতিবাজ প্রাক্তন কংগ্রেসমন্ত্রীদের দলের নাম বদল করিয়ে মার্ক্সবাদীদের বাদ দিয়ে নতুন সরকার গঠিত হলে এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা স্বাগতই জানাতেন। মার্ক্সবাদীরা সরকারে না থেকে যে কোন দল সরকার গঠন করলে এই উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের একাংশের আর মনপীড়ার কারণ ঘটে না বা ঘটবে না।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠনের পূর্বাহ্নেই ঘোষণা করেছিলেন যে, আগামী বিধানসভার নির্বাচন সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা, রাষ্ট্রপতির শাসন এড়ানো এবং এই স্বল্প সময়ে যতটুকু সম্ভব রাজ্যে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি করা এবং যতটুকু সম্ভব জনগণকে কিছু রিলিফ দেবার লক্ষ্য সামনে রেখেই অন্তবর্তীকালীন কোয়ালিশন সরকারে যোগ দেবে। উপজাতি যুব সমিতির অহেতুক আতঙ্কের প্রয়োজন নেই। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি বিধানসভা নির্বাচন এড়াতে চান না।

পরিশেষে এটা বলা দরকার যে, ত্রিপুরায় উপজাতি ছাত্র ও যুবকগণ যারা এতদিন উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের কপট বাণীতে বিভ্রান্ত হয়েছেন বা এখনো হচ্ছেন তাদের কাছে আমাদের কথা হল তা ঐ নেতাদের প্রতিটি কার্যকলাপ পরখ করে দেখা। মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে দুর্বল করার অর্থ হল গণতান্ত্রিক শক্তিকে দুর্বল করা। গণতান্ত্রিক শক্তির দুর্বল হওয়া মানেই হল দুর্বল উপজাতিদের বাঁচার সংগ্রাম দুর্বল করা।

উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের যে অংশ অন্ধ কমিউনিস্ট বিদ্বেষী তাদের কাছে আমাদের এই আবেদনের হয়ত কোন মূল্য থাকবে না কিন্তু যাদের বিবেকবিকৃত নয়। এমন অন্ধ কমিউনিস্ট কেবল সাময়িকভাবে বিভ্রান্ত। তারা নিশ্চয়ই আমাদের এই বক্তব্যের যথাযথ মূল্য দেবেন। কেন্দ্রে ক্ষমতা বদলের পর কোন ক্ষমতাশীল দলের গোঁ ধরবেন এই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা তাও ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ লক্ষ্য রাখছে।

।। দেশের কথা, ১১ বর্ষ ৩২ এবং ৩৩ সংখ্যায় ১৯৭৭ ইং ।।

চাকুরীতে ত্রিপুরার তফসিলী জাতি-উপজাতির স্থান কোথায়? একটি সমীক্ষা

ত্রিপুরার সরকারী চাকুরীতে তফসিল উপজাতি এবং তফসিল জাতির স্থান কোথায় তা এখানে দেওয়া গেল। এই তথ্য ১৯৭৬ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বরের অবস্থান অনুযায়ী।

এখানে তফসিল উপজাতি, তফসিল জাতির মোট প্রাপ্য আসন এবং অন্যান্যদের জন্য খোলা আসনের যে হিসাব দেওয়া হয়েছে তা সংবিধান অনুযায়ী ত্রিপুরার ক্ষেত্রে উপজাতির জন্য শতকরা ২৯ ভাগ এবং তপসিল জাতির জন্য শতকরা ১৩ ভাগ সংরক্ষিত এবং অন্যান্য সম্প্রদায়ের জন্য শতকরা ৫৮ ভাগ খোলা - সরকার কর্ত্তৃক ঘোষিত এই সূত্রানুযায়ী হিসাব করা হয়েছে।

১ম শ্রেণীর কর্মচারী

নন টেকনিক্যাল পদ

পূরণযোগ্য মোট পদ -৮৫ মোট নিযুক্ত ৬২

তফসিল উপজাতির প্রাপ্য - ২৪ মোট নিযুক্ত ৪ (৬.৪৫%)

তপসিল জাতির প্রাপ্য -১১ মোট নিযুক্ত —

অন্যান্যদের জন্য খোলা -৩৫ মোট নিযুক্ত ৫৮ (৯৩.৫৪%)

দেখা যায়, আরও ২৩টি আসন শূন্য রয়েছে। নির্দ্ধারিত সংরক্ষিত কোটা তফসিল উপজাতিরা ২০টি এবং তফসিল জাতিরা ১১টি আসন কম পেয়েছেন। অন্যান্যরা তফসিল উপজাতি ও তফসিল জাতির জন্য সংরক্ষিত আসনের ২৩টি ইতিমধ্যে দখল করেছে। তাই আইনতঃ বর্তমানে ২৩টি আসন খালি রয়েছে তা উপজাতি এবং তফসিল জাতির প্রাপ্য।

টেকনিক্যাল পদ ঃ

পূরণ যোগ্য মোট পদ - ২১৫ মোট নিযুক্ত ১৫২

তফসিল উপজাতির মোট - প্রাপ্য ৬২ মোট নিযুক্ত ৮ (৫.২৬%)

তফসিল জাতির মোট প্রাপ্য - ২৭ মোট নিযুক্ত ৪(২.২৬%)

অন্যান্যদের মোট প্রাপ্য - ১২৬ মোট নিযুক্ত ১৪০ (৯২.৬০%)

দেখা যায় ৬৩ আসন শূন্য রয়েছে। নির্দ্ধারিত কোটা থেকে তফসিল উপজাতিরা ৫৪টি এবং তফসিল জাতিরা ২৩টি আসন কম পেয়েছেন।

পক্ষান্তরে অন্যান্যরা ২৪টি আসন বেশী নিয়েছেন। তাই আইনতঃ যে ৬৩টি আসন শূন্য রয়েছে তা কেবল উপজাতি ও তফসিল জাতির প্রাপ্য।

দ্বিতীয় - শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে

নন টেকনিক্যাল পদ ঃ—

পূরণ যোগ্য মোট আসন - ৮৬৪ মোট নিযুক্ত ৬৬৪

উপজাতিদের মোট প্রাপ্য - ২৫০ মোট নিযুক্ত ৩৮(৭.৭২%)

তফসিল জাতির প্রাপ্য - ১১২ মোট নিযুক্ত ২৬(৩.৯১%)

অন্যান্যদের জন্য খোলা - ৫০২ মোট নিযুক্ত ৬০০ (৯০.৩%)

দেখা যায়, মোট ২০০টি আসন খালি আছে। নির্দ্ধারিত কোটা থেকে উপজাতিরা ২১২টি এবং তফসিল জাতিরা ৮৬টি আসন কম পেয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা দখল করেছেন ৯৮টি অতিরিক্ত আসন। কাজেই আইনত বাকী খালি ২০০টি আসনের সবটিই কোটা অনুযায়ী তপসিল উপজাতির প্রাপ্য।

টেকনিক্যাল পদ

পূরণ যোগ্য মোট আসন - ৩১৩ মোট নিযুক্ত ২৭২

উপজাতিদের প্রাপ্য - ৯০মোট নিযুক্ত ৪ (১.৪%)

তফসিল জাতির প্রাপ্য - ৪০মোট নিযুক্ত ৯ (৩.৩১%)

অন্যান্যদের - ১৮৩ মোট নিযুক্ত ২৫১ (৯৫ ২২%)

দেখা যায় আরও ৪১টি আসন খালি আছে। নির্দ্ধারিত সংরক্ষিত কোটা থেকে উপজাতিরা ৮৬টি এবং তপসিল জাতিরা ৩১টি আসন কম পেয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা ৭৬টি আসন অতিরিক্ত নিয়েছেন। কাজেই যে ৪১টি আসন খালি আছে তা উপজাাতি এবং তফসিল জাতির প্রাপ্য ঃ

তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারীর ক্ষেত্রে

পূরণ যোগ্য মোট আসন - ৫১৮৯টি মোট নিযুক্ত ৪৫২

উপজাতিদের প্রাপ্য আসন - ১৫০৪ মোট নিযুক্ত ৪৯৭ (১০.৯৯%)

তফসিল জাতির মোট প্রাপ্য আসন - ৬৭৪মোট নিযুক্ত ২৭৮ (৬.১৫%)

অন্যান্যদের জন্য খোলা আসন - ৩০১১ মোট নিযুক্ত ৩৭৪৫ (৮২.৮৫%)

দেখা যায় আরও ৬৬৯টি আসন খালি আছে। নির্দ্ধারিত সংরক্ষিত কোটা থেকে উপজাতিরা ১০০৭টি এবং তফসিল জাতিরা ৩৯৬টি আসন কম পেয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা অতিরিক্ত ৭৩৪টি আসন দখল করেছেন। কাজেই আইনতঃ ৬৬৯টি শূন্য

আসনের সবকটি তফসিল উপজাতি ও তফসিল জাতির প্রাপ্য।

৪র্থ শ্রেণীর ক্ষেত্রে নন টেকনিক্যাল পদ ঃ -

পূরণ যোগ্য মোট আসন - ৫৯৩০ মোট নিযুক্ত ৫২৪৯

উপজাতির প্রাপ্য আসন - ১৭১৯ মোট নিযুক্ত ৮৮৭ (১৬.৮০%)

তফসিল জাতির প্রাপ্য আসন - ৭৭০মোট নিযুক্ত ৬৭৬ (১২.৮৭%)

অন্যান্যদের প্রাপ্য আসন - ৩৪৪১ মোট নিযুক্ত ৩৬৮৬ (৮২.৮৫%)

দেখা যায় বর্তমানে মোট ৬৮১টি আসন খালি আছে। নির্দ্ধারিত সংরক্ষিত কোটা থেকে উপজাতিরা ৯৩২টি এবং তফসিল জাতিরা ৯৮টি আসন কম পেয়েছেন। পক্ষান্তরে অন্যান্যরা অতিরিক্ত ২৪৫টি আসন দখল করেছেন।

টেকনিক্যাল পদ ঃ

পূরণ যোগ্য মোট আসন - ১০৯৯মোট নিযুক্ত ৯৮০

উপজাতির প্রাপ্য আসন - ৩১৮ মোট নিযুক্ত ১৯৫ (১১.৮৯%)

তফসিল জাতির প্রাপ্য মোট আসন - ১৪২ মোট নিযুক্ত ১৪৩ (১৪.৫৯%)

অন্যান্যদের প্রাপ্য মোট আসন - ৬৩৯ মোট নিযুক্ত ৬৪২ (৬৪.৫১%)

দেখা যায় এখানেও মোট ১১৯টি পদ খালি আছে। নির্দ্ধারিত সংরক্ষিত কোটা থেকে তফসিল উপজাতিরা ১২৩টি আসন কম পেয়েছেন। তফসিল জাতিরা ১টি আসন ও অন্যান্যরা ৩টি অতিরিক্ত আসন দখল করেছেন। তা উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত কোটা থেকেই গেছে। কাজেই আইনত বাকী ১১৯টি শূন্যপদের সবকটি উপজাতির প্রাপ্য বিঃ দ্রঃ নিয়োগনীতি ঘোষণা করেছেন তা হল ক) ত্রিপুরার ক্ষেত্রে প্রতি বৎসর যে নতুন পদ সৃষ্টি হবে তার শতকরা ২৯ ভাগ উপজাতিদের জন্য এবং শতকরা ১৩ ভাগ তফসিল জাতির জন্য সংরক্ষিত থাকবে। আর মাত্র ৫৮% ভাগ আসনে অন্যান্যরা কমপিট করতে পারবেন। খ) যোগ্য প্রার্থীর অভাবে সংরক্ষিত আসনগুলি পূরণ না করা গেলে যাদের জন্য সেই আসনগুলি সংরক্ষিত তাদের জন্য পর পর তিনটি নিয়োগ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখতে হবে। এর ইংরেজী পরিভাষা হল carried forward ।

কাজেই এই নীতি অনুযায়ী ত্রিপুরায় বিভিন্ন দপ্তরে বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীর পদে যে আসনগুলি খালি আছে, যার সংখ্য সর্বমোট ২৮৮০টি, সবগুলিই উপজাতি এবং তফসিল জাতির জন্য সংরক্ষিত অপূরিত আসন। নীতি অনুযায়ী এই আসনগুলি পর পর তিনটি নিয়োগ বছর পর্যন্ত সংরক্ষিত রাখতে হবে। এই আসনগুলি রিজার্ভ ভুক্ত না করা পর্যন্ত তাতে অন্যদের নিয়োগ করা যায় না। দ্বিতীয়ত প্রতি বছর যে নতুন পদ সৃষ্টি করা হবে

তাও উপরোক্ত হারে সংরক্ষিত রাখতে হবে। অর্থাৎ মাত্র শতকরা ৫৮ ভাগ অন্যান্যদের জন্য খোলা থাকবে। এই সংবিধান স্বীকৃত নীতি সরকার অনুসরণ করতে আইনতঃ বাধ্য।

সংসদ সদস্য শ্রীশচীন্দ্র লাল সিংহ এবং তার অনুগামী মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল দাস মহাশয় সদাসর্বদা ভাষণ দিচ্ছেন যে তাঁরা উপজাতি এবং তফসিল জাতি দরদী এবং তাদের সাং বিধানিক গণতন্ত্র রক্ষায় বদ্ধপরিকর। এখন দেখা যায় এই সংরক্ষিত খালি (অপুরিত) ২৮৮০টি আসন যা উপজাতি ও তফসিল জাতির প্রার্থীদের প্রাপ্য তাতে কাদের নিয়োগ করেন তা দেখার বিষয়। এখানেই তাদের কথা ও কাজের সামঞ্জস্য খুঁজে দেখার সুযোগ মিলবে।

তৃতীয়তঃ অন্যান্য বেকার যুবকদের নিয়োগের জন্যও নিশ্চয়ই নতুন পদ সৃষ্টি করতে হবে। তবে তফসিল সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের নায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে নয়।

(ডেইলী দেশের কথা' ১১বর্ষ, ৪৫ সংখ্যা, শুক্রবার ২০ শ্রাবন ৮৪ বাংলা, ৫ আগস্ট ১৯৭৭ইং)

কগ-বরক ছীরীঙ

(কগবরক শিক্ষা)

(প্রথম সংস্করণ)

১৯৭৭ সাল

লেখক — দশরথ দেববর্মা

(' কগ -বরক ছীরীঙ' বইটির প্রচ্ছদ) (ক)

কগ -কীচার

কগ - বরক ছাৗরীঙ' বই কগবরক মাননাই মানয়া জর্তনিন' ছামুঙগ' নাঙগানু। বাংলা মানয়া বরক ব ইংরাজি বায় কগ-বরক কগথাই ছাৗরীঙ মানানু। বাংলা মাননাই ব ছাৗরীঙ মানানু। কগ-বরক মাননাই ব মানুযব — গনি বুমুঙ বাংলা ইংরাজি'বায ফার মানানু।

দশরথ দেববর্মা

নিবেদন

কগ ববক ছাৗবীঙ (কগ ববক শিক্ষা) এই পুস্তকে কগববক লিখন, পঠন প্রণালী দেওয়া হযেছে। কগবরক শব্দাবলীব বাংলা এবং ইংবেজী অর্থ পাশাপাশি দেওযা হয়েছে। অ — কগ বরক ভাষীদের পক্ষে কগববকেব প্রাথমিক জ্ঞান লাভে এই পুস্তিকা সহাযক হবে বলে আমাব বিশ্বাস।

দশরথ দেববর্মা

('কগ-বরক ছাৗবীঙ' নামক বইটির ভূমিকা) **(খ)**

সূচীপত্র (Index)

(দশরথ দেব রচিত 'কগ-বরক ছাঁরাঁঙ' নামক বইটির সূচিপত্র) (গ)

কগ ছঙ বচন (Number)

'কগবরগ' কগছঙ দালনীয়। ছঙছা, ছঙবাং।

ছঙছা	ছঙবাং
একবচন	বহুবচন
(Singular Number)	(Plural Number)
পুইলা বরক — আঙ (1st Person)	চীঙ
কীচার বরক— নীঙ (2nd Person)	নরগ
কুছু বরক ব (3rd Person)	বরক

জরা (কাল-Tense)

কগবরক' জরা দালথ ম। তাবুক, লাইমা, ফায়মা।

তাবুক জরা — বর্তমানকাল

(Present Tense)

ছঙছা	ছঙবাং
১। আঙ চাঅ	চীঙ চাঅ
২। নীচ চাঅ	নরগ চাঅ
৩। ব চা অ	বরগ চাঅ

লাইমা জরা — অতীত কাল

(Past Tense)

ছঙছা	ছঙবাং
১। আঙ চাখা	চীঙ চাথা
২। নীঙ চাখা	নবগ চাখা
৩। ব চাখা	বরগ চাখা

অ-তঙমা জরা—

(Present Perfect Tense)

ছঙছা	ছঙবাং
১। আঙ চা অই তঙগ—	চীঙ চানই তঙগ

য়াবীরীয়	য়াবীরাইরক —		জীবজন্তু		
মানুয়	পশু	Beast	মীছা	বাঘ	Tiger
ছিংহ	সিংহ	Lion	মীছা চীলা	বাঘ(পুং)	Tiger
ছিংহ বুরুয়	সিংহী	Lioness	মায়ঙ	হাতি	Elephant
করায়	ঘোড়া	Horse	মায়ুঙ বুরুয়	হস্তিনী	Female Elephant
করায় বুরুয়	ঘোড়ী	Mare			
করায় চীলা	টাট্টু ঘোড়া	Ponny	মছক	হরিণ	Deer
দেকা	ষাঁড়	Ox, Ball	মছক চীলা	হরিণ(পুং)	Deer Stag
মুছুকমা	গাভী	Cow	মছক বুরুয়	হরিণী	Hind
মুছুক বীছা	মুছুর	Calf	গেগুমা	নেকড়ে বাঘ	Wolf
ছীই	কুকুর	Dog	টেকফিয়াপুরা	চিতাবাঘ	Leopard

(দশরথ দেব রচিত 'কগ-বরক ছীবীঙ' নামক বইটির ২৮নং পৃষ্ঠার অংশ বিশেষ) (ঘ)

কগবরক লেখার পথরেখা

(মুল লেখা কগবরক। কগবরক থেকে বঙ্গানুবাদ করা হয়েছে সকলের সুবিধার জন্য। মতামত পেলে ভাল হয়।)

বাংলা হরফে কগবরক লিপিবদ্ধ করিতে হইলে প্রধানতঃ নিম্নলিখিত স্বরবর্ণের প্রয়োজন পড়িবে।

স্বরবর্ণ

প্রথম লেখ্যরূপ	দ্বিতীয় লেখ্যরূপ
অ, আ, ই উ	া, ি, ে, ু, ূ
ঊ ,এ,ও	

ব্যবহারের নিয়ম ঃ

১) সাধারণতঃ কগবরক লিখিতে ও বর্ণের প্রথম এবং দ্বিতীয় লেখ্যরূপ ব্যবহার করা হইবে না। যেমন ঃ ওল, ওফিল, বানান লেখা হইবে না। উল, উফিল লেখা হইবে।

২) কগবরক লিখিতে সব সময় ঊ বানান লেখা হইবে।

৩) উ বর্ণের দ্বিতীয় লেখ্যরূপ ু লেখা হইবে। যেমন ঃ বুকুঙ, বুমুল।

৪) 'কগবরক' এ এমন ধ্বনি বা উচ্চারণ আছে যাহা বাংলা বা রোমান লিপির এক বর্ণের সাহায্যে উচ্চারণ আসে না। একমাত্র দেবনাগরী ব্ব লিপিই এককভাবে সেই উচ্চারণ সূচিত করিতে পারে। বাংলা < ও > স্বরবর্ণের সাথে য়া — প্রত্যয় যোগ করিয়া সেই ধ্বনি লিপিবদ্ধ করিতে হইবে। যেমন ঃ ওযানজুই, ওয়া ওয়ান্দাল।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, কগবরক 'এ ও বর্ণের প্রথম রূপ ব্যবহার করা হইবে না। কিন্তু এই বিশেষ 'ধ্বনি' লিপিবদ্ধকরিতে < য়া > প্রত্যয়ের পূর্বে < ও > ব্যবহৃত হইবে। দেবনাগরী ব্ব লিপি ইহার বিশুদ্ধ উচ্চারণ প্রকাশ করিতে সক্ষম। কিন্তু বাংলা বর্ণমালার পরিবারে এই একটি মাত্র দেবনাগরী লিপি সংযোগ করিতে চাই না।

৫) কগবরক ধ্বনিগোষ্ঠীতে সরাসরি < ঋ > ধ্বনি নাই। ইহার প্রথম কিংবা দ্বিতীয় কোনও রূপেরই ধ্বনি নাই। কাজেই বিশুদ্ধ কগবরক শব্দগুলি লিখিবার সময় < ঋ > লিপির ব্যবহার থাকিবে না। কিন্তু বাংলায় উক্ত লিপির ব্যবহার আছে। আর সেই ধ্বনিবোধক বহু বাংলা শব্দ কগবরক আত্তীকরণ করিয়াছে। সোজা কথায় বাংলা শব্দ ভান্ডার হইতে ঋণ করিয়াছে। আবার সেই ঋণকৃত শব্দগুলির বেশীর ভাগ বাংলা শব্দগুলিরই কগবরক প্রতিশব্দ (পরিভাষা) আবিষ্কৃত হয় নাই। সেই ক্ষেত্রে বাংলায় যেভাবে বানান লেখা হয় সেইভাবে লেখাই সর্বাধিক নিরাপদ। যেমন ঃ কৃপন, ঋণ, খৃষ্টান, নৃপেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় হইল — উক্ত শব্দগুলি কগবরক উচ্চারণমতে (অর্থাৎ বাংলার বিকৃত উচ্চারণ মতে) কিরপন, রিন,খিরছটান, নিরপেন প্রভৃতি। এই বানান লিখিলে বাংলা লিখিবার সময়, দারুণ বানান বিভ্রাট দেখা দিবে, তাই সেই ক্ষেত্রে বাংলা বানান পদ্ধতি অনুসরণ করাই নিরাপদ।

৬) <ও> র দ্বিতীয় লিখনরূপ < ো > লেখা হইবে না।

৭) <উ> র প্রথম এবং দ্বিতীয় উভয় লিখনরূপই লিখা হইবে।

৮) উ়।। কগবরক ধ্বনিগোষ্ঠীগুলির মধ্যে <উ়> উচ্চারণ নাই। কিন্তু কগবরক লিখিতে এই লিপির প্রয়োজন পড়িবে। <অ> বাংলা ধ্বনি সূচিত করিবার জন্য কগবরক' এই <উ়> ব্যবহার করা হইবে না।

কগবরক ধ্বনিগোষ্ঠীতে এমন একটি বিশেষ ধ্বনি আছে; যাহা বাংলা বা রোমান কোন লিপির দ্বারাই লিপিবদ্ধ করা যায় না। সেই বিশেষ ধ্বনি লিপিবদ্ধ করিতে আমরা <উ়> র আশ্রয় গ্রহণ করিব। অর্থাৎ <অ> এবং <উ> এই দুইটি ধ্বনির মাঝামাঝি ধ্বনির নির্দেশক হিসাবে ব্যবহার করিব।

যেমন ঃ তু়'য়। ইহার উচ্চারণ তয় এবং তু'য় এর মাঝামাঝি। তু় য় — জল। তু় ক ইহার উচ্চারণ তক এবং তুক এর মাঝামাঝি।

নুঙগূই— পান করিয়া।

চা'উ়ই — খাইয়া।

এখানে <উ়> বাংলার ধ্বনির ব্যতিক্রম ধ্বনি হিসাবেই ব্যবহৃত হইবে। তবে কগবরক ভাষী ছাড়া অন্য ভাষাভাষীদের মুখে এই উচ্চারণ আসা খুবই কঠিন।

ব্যঞ্জনবর্ণ

১। কগবরক লেখার জন্য সাধারণতঃ নিম্নলিখিত ব্যঞ্জন বর্ণমালা ব্যবহার হইবে। এখানে মনে রাখা দরকার যে, বিশুদ্ধ কগবরক শব্দগুলির বানান লিখিতে কেবলমাত্র এই লিপিগুলির সাহায্যেই লিখিতে হইবে।

ক খ গ

চ ছ জ

ত থ দ

প ফ ব

ঙ ম ন

ং ঁ য়

র ল হ্

কগবরক ধ্বনিতে দীর্ঘ' (গুরু) উচ্চারণ নাই। কেবল হ্রস্ব (লঘু) আছে। তাই ট, ঠ, ধ, ভ, ঢ, ঘ কগবরক লিপিগোষ্ঠী হইতে বাদ দেয়া হইয়াছে। একটি মাত্র দ,ত,থ, ছ কগবরক লেখার লিপি গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হইয়াছে। এই বানান পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করিতে হইবে। যেমন ঃ রর্মদি, ছাল, ছামুঙ, দার্কতি , দাইতি, তথা, তইলিঙ ।

২। <ং> এবং < ঙ > এই দুইটি বর্ণই প্রায় একই ধ্বনির নির্দেশ করে। কিন্তু কগবরক শব্দভান্ডারে প্রায় কাছাকাছি ধ্বনিবোধক এমন কতকগুলি শব্দ আছে যাহার অর্থ সম্পূর্ণ পৃথক পৃথক। কাজেই সেগুলির বানান লিখতে হইলে আমাদের এই দুইটি লিপির সাহায্য গ্রহণ করা নিরাপদ

গমন অর্থে অথবা গুরু উচ্চারণ নির্দেশ করিতে <ং> বানান লিখিতে হইবে।

যেমন ঃ থাংদি -- যাও

বৃতাং --- ছড়া

কৃচাং --- শীতল,ঠান্ডা

থাংগৃই তঙদি --- যাইতে থাকুন।

জীবিত বা অন্য অর্থবোধক বাকী শব্দগুলির বানান <ঙ> লেখা হইবে। অর্থাৎ কগবক শব্দগুলির বানান লিখিতে < ঙ > ব্যাপকহারে ব্যবহৃত হইবে।

যেমন ঃ থাঙগ' — বাঁচা

থাঙগৃই তঙথুন — বাঁচিয়া থাকুক।

৩। কগবরক লেখার বর্ণলিপিতে <ক্ষ> বর্ণ রাখা হয় নাই। এই ধ্বনিবোধক শব্দ কগবরক' এ নাই। কিন্তু এই লিপিতে লেখা বানান দিয়া কিছু বাংলা শব্দ কগবরক আত্তীকরণ করিয়াছে। সেই সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে বাংলা বানান অনুসরণ করিলেই ভাল। বাংলা লেখার সময় বানান বিভ্রাটের আশংকা কম থাকে।

যেমন ঃ ক্ষমতা। খমতা লেখা হইবে না। ''ক্ষমত্র'' শব্দের কগবরক প্রতিশব্দ ''ফান'' । কেউ যদি ''ফান'' না লিখিয়া ''ক্ষমতা'' লিখিতে চান তাহা হইলে 'ক্ষ' লিপিই ব্যবহার করিতে হইবে। বর্তমানে কগবরক ভাষীরাও ''ফান'' শব্দের স্থলে বহুলাংশে 'ক্ষমতা' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন।

৪। কগবরক বর্ণমালা শ্রেণীতে ঘ, ঝ, ধ, ট, ড, শ, স, য বর্গমালাগুলি রাখা হয় নাই। আগেই বলা হইয়াছে যে এই বর্ণগুলির ধ্বনি কগবরকে নাই।

কিন্তু কগবরক শব্দভান্ডারে কতকগুলি বাংলা শব্দ এমনভাবে মিশিয়া গিয়াছে যে সেগুলি কগবরক ভাষীরাও কগবরক হিসাবেই ব্যবহার করিয়া থাকেন। সেগুলির কগবরক প্রতিশব্দ রচনা বা আবিষ্কার হয় নাই। আবিষ্কারের প্রচেষ্টাও আজ পর্যন্ত হয় নাই। সেই আত্তীকৃত বা ঋণকৃত বাংলা শব্দগুলি কগবরক এর জন্য নির্দেশিত লিপিগুলির সাহায্যে লিপিবদ্ধ করা হইলে কগবরক ধ্বনির প্রয়োজন মিটিবে একথা ঠিক কিন্তু সেই শব্দগুলি বাংলা ভাষার ভান্ডার থেকে সংগৃহীত, কাজেই লিখিবার সময় বাংলা বানান পদ্ধতি অনুসরণ করাই নিরাপদ। তাই বংলা বানান লিখিতে হইবে।

যেমনঃ

কগবক ধ্বনি অনুসরণে বানান	**বাংলা ধ্বনি অনুসরণে বানান**
ছুবিদা	সুবিধা
ছুজুক	সুযোগ
অইবাছ	অভ্যাস
রাছত্র	রাষ্ট্র

থিক	ঠিক
দরম'	ধরম', ধর্ম
ছমাজ	সমাজ
লাব	লাভ
জাত্রা	যাত্রা

বানান বদলাইলেও শব্দগুলির অর্থ বদলাইয়া যাইতেছে না। একই অর্থ সূচিত করে। কাজেই, সেই ক্ষেত্রে চিরাচরিত অনুসৃত বাংলা বানান লেখাই নিরাপদ। তাহাতে শিক্ষার্থীরা বাংলা লিখিবার সময় ভুল করিবে না।

৫। সাধারণতঃ কগবরক লিখিতে <য> অথবা ইহার দ্বিতীয় লেখারূপে <্য> (য ফলা) লেখা হইবে না। কগবরক লিপিগোষ্ঠীতে <য> এবং ইহার দ্বিতীয় লেখারূপে <্য> (য- ফলা) রাখা হয় নাই।

তবে বাংলা শব্দ কগবরকে হুবহু লিখিতে হইলে বাংলা লিখার বানান অনুসরণ করিবে। যেমন ঃ

কগবরকে জন্য নির্দেশিত লিপি অনুসরণে		**বাংলা বানান অনুসরণে**	
'জ্ইগ'		যোগ	
ভাইগ'	X	ভাগ্য	+
রাইজ'		রাজ্য	

X এই লেখা হইবে না।

+ এই বানান লেখা হইবে ।

৬। নিম্নলিখিত শব্দগুলি বিশুদ্ধ কগবরক। অর্থাৎ বাংলা ভাষা হইতে সংগৃহীত নয়। তাই সেগুলির বানান কগবরক লিখিবার জন্য নির্দেশিত বানানে লিখিতে হইবে।

লিখিতে হইবে	লিখা ঠিক নয়
ফাতরা	ফাত্রা
মূখরা	মুখ্রা
নিছুরা	নিছ্রা
অকরা	অক্রা
চাকূরাক	চাক্রাক

১। প্রত্যেকটি ব্যঞ্জন বর্নের সাথে অ ধ্বনি আছে।

যেমন ঃ ক + অ = ক

খ + অ = খ

ব + অ = ব ইত্যাদি

২। শব্দের প্রথম বর্ণের অ ধ্বনি সূচিত করিতে কোন চিহ্ন দেওয়া হইবে না। স্বাভাবিকভাবে তাহাতে <অ> ধ্বনি উচ্চারিত হইবে।

যেমন ঃ কগ= ক + অ + গ, কগ, রম = র + অ + ম, রম

এখানে ক এবং র বর্ণে পরে অ কিংবা অ ধ্বনি সূচক কোন চিহ্ন দেওয়া হইবে না।

৩। সাধারণত ঃ দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের প্রথম বর্ণের পরে অ এবং দ্বিতীয় বর্ণের পরে হস্ উচ্চারিত হইবে। অ কিংবা হস্ (্)লিখা হইবে না।

যেমন ঃ খম = খ + অ + ম্ = খম

নক= ন + অ + ক্ = নক

৪। দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের দ্বিতীয় বা শেষের বর্নের শেষে <অ> উচ্চারণ সূচিত করিতে হইলে বর্ণের শেষে <অ> না লিখিয়া (') চিহ্ন লিখিতে হইবে। এই চিহ্ন কেবল দুই অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের ক্ষেত্রেই নহে, যে কোন সংখ্যক অক্ষর বিশিষ্ট শব্দের শেষের বর্ণের পর অ ধ্বনি বা উচ্চারণ সূচিত করিতে হইলে সেই অক্ষরের শেষে (') চিহ্ন দিতে হইবে। অপর পক্ষে যে কোন বর্ণ বা অক্ষরের শেষে (') চিহ্ন থাকিলে বুঝিতে

হইবে সেই বর্ণের সাথে স্বরবর্ণের <অ> উচ্চারণ করিতে হইবে।

অনুরূপ ভাবে দ্বিতীয় <ম> বর্ণ বর্ণের সাথে

হস (্) যুক্ত = ম্

৪র্থ বর্ণ ক এর সাথে হস্ (্) যুক্ত = ক্

বম্তক্ ঃ অনুরূপভাবে রন্ দক্ = ১ম এবং ৩য় বর্ণের সাথে অ এবং দ্বিতীয় ও ৪র্থ বর্ণের সাথে হস্

(্) যুক্ত র এবং দ এর সাথে অ, যেমন

র + অ = র

দ + অ = দ

ন এবং ক এর সাথে হস্ (্)

ন্ এবং ক্।

কিন্তু **লিখতে** হইবে হস্ চিহ্ন বাদ দিয়া।

যেমন বমতক, রনদক।

৭। শব্দের শেষ অক্ষরের সাথে <অ> ধ্বনি উচ্চারিত হইলেই ক-বর্গ এবং প - বর্গের প্রথম বর্ণের স্থলে বর্গের তৃতীয় বর্ণ বসিবে।

অর্থাৎ <ক> স্থলে গ, এবং <প> স্থলে <ব> হইবে।

যেমন ঃ খলপ = খলব', কক = কগ' চাপ = চাব', চাপক = চাপগ'

৮। <ং> এবং <ঙ> বর্ণের পর অ ধ্বনি থাকিলে ং এবং ঙ বর্ণের পর অ না বসিয়া গ বসিবে।

যেমন ঃ থাং = যাওয়া ; থাংঅ না লিখিয়া থাংগ লিখিতে হইবে। অর্থাৎ অ না লিখিয়া গ লিখিতে হইবে। গ এর সাথে অ নির্দেশক (') চিহ্ন দিতে হইবে না। ং এবং ঙ বর্ণের পর ব্যঞ্জনবর্ণের যে বর্ণই বসুক ইহার সাথে অ ধ্বনি থাকিবে।

থাঙ = বাঁচিয়া থাকা। থাঙঅ না লিখিয়া থাঙগ লিখিতে হইবে। এক্ষেত্রে গ এর সাথে (') চিহ্ন বসিবে না।

'ই' এবং 'য়' এর প্রয়োগ

লঘু উচ্চারণে 'য়' এবং গুরু উচ্চারণে 'ই' প্রয়োগ করিবে। শব্দের পৃথক অর্থ বুঝাইবার জন্য — এই ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

যেমন ঃ

লঘু			গুরু		
খায়	=	করা	খাই	—	কমান
খায়দি	=	কর	খাইদি	—	কমাও
খায়	=	শিঙ দিয়া গুতানো	খাইকা	—	কমাইয়াছে।
খায়কা	=	করিয়াছে	খাইতকয়া	—	কমাইতে অসুবিধা
খায়কা	=	শিঙ দিয়া আঘাত করিয়াছে।	খাইরকদি	—	দয়া কর। সহানুভূতিশীল হও
ছুয়দি	=	লিখ	ছুইদি	—	সরু কর, চোখা কর।
ছুয়'	=	লিখে	ছুইঅ	—	সরু করে।
তুয়	=	জল	ছুইদি	—	ধুইয়া সাফ কর।
ফাই	=	আসা	ছুদি	—	ধৌত কর, কাচ।
ফায়দি	=	আসুন	তুই	—	লওয়া।
ফায়গ্রাদি	=	একটু আসুন।	তুইদি	—	লও
			তুই	—	মিষ্টি
			ফাই	—	মটকান
			ফাইদি	—	মচকাইয়া ভাঙ্গ।
			মুয়া ফাইদি	—	বাঁশের করুল তোল বা ভাঙ্গ

সংযোজনী

'কগবরক লেখার পথরেখা' বইটির প্রকাশের পর কিছু বর্ণ এবং বানানের ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়েছে এবং সেগুলি সর্বজনস্বীকৃত।

১। স্বরবর্ণের 'উ' বর্তমানে 'অী' এবংার দ্বিতীয় লেখ্যরূপ 'ী' । যেমন ঃ তীয়, সীয়, খীই ইত্যাদি।

২। দেবনাগরীর 'ব' লিপির অনুকরণে স্বরবর্ণ 'ও' কে চিহ্নিত করা হয়েছিল। বর্তমানে 'উ' তে 'া' দিয়ে তা লেখা হয় এবং ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যেমন ঃ উা, উানজুই, উানদাল প্রভৃতি।

৩। ব্যঞ্জনবর্ণের 'ছ' এর পরিবর্তে বর্তমানে 'স' ব্যবহৃত হচ্ছে। যেমন ঃ -- সম, সিলাই, সানদাই ইত্যাদি।

৪। 'কগবরক' শব্দের বানান বর্তমানে অধিকাংশ লেখকই 'কগবরক' লিখেছেন এবং এটাই বাঞ্ছনীয়।

বামফ্রন্ট সরকার উপজাতিদের মিত্র নয় কি? বামফ্রন্ট সরকারের দশমাসের কার্যকলাপ কি বলে?

দশ মাস পূর্ণ হল ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের আয়ু। রাজ্যের জনগণের পর্বত প্রমাণ সমস্যার কুল কিনারা করা এই দশ মাস সময় এমন কিছু নয়। তবে এটাও ঠিক এই দশমাসের সময়ে বামফ্রন্ট সরকার যে সকল কাজকর্ম করেছেন সেগুলি ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের অনুকূলে করা হয়েছে কি না, উপজাতি সাধারণ মানুষের স্বার্থরক্ষার কিছু কাজ করা হয়েছে কিনা তা অবশ্য বিচার করা প্রয়োজন।

গত ৩০ বৎসরে কংগ্রেস ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের জন্য কি করেছিলেন, ট্রাইবেল কতটুকু লাভ লোকসান হয়েছে আর এই দশমাসে বামফ্রন্ট ট্রাইবেলদের জন্য কতটুকু করেছেন এবং আরও কি করতে চান তা খতিয়ে দেখা প্রয়োজন। নতুবা কে ট্রাইবেলদের আপন, কে তাদের পর তা বুঝতে ভুল হতে পারে। এর ফলে কে সমর্থনযোগ্য কে অসমর্থনযোগ্য— আরও সোজাভাবে গেলে বলা যায় কে মিত্র, কে রিপু তা বাছাই করার ক্ষেত্রে ভুল পদক্ষেপ হতে পারে।

সংক্ষেপে বলা যায় যে গত ত্রিশ বৎসর কংগ্রেস রাজত্বে ট্রাইবেলদের উপর যথেষ্ট অত্যাচার ও উৎপীড়ন হয়েছে। বর্বরভাবে তাদের গণতান্ত্রিক আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করা হয়েছে। উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে। ট্রাইবেলদের জমি সরকারের অনুমোদন ব্যতিরেকে অউপজাতি মহাজন ও জোতদারদের কাছে হস্তান্তরিত হয়ে গেছে। সিংহভাগ জমি যাতে ট্রাইবেলদের ফেরত দিতে না হয় সেই অনুকূলে ভূমি রাজস্ব ও ভূমি সংস্কার আইন কংগ্রেস সরকার ১৯৭৪ সালে সংশোধন করে নিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত ভূমিতে উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে মহারাজার আমলে সৃষ্ট ট্রাইবেল রিজার্ভের অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে দিয়েছেন। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা ত্রিপুরার অর্থনীতিতে অনু প্রবেশের ফলে এবং আধা জুম এবং আধা কৃষি এই দুর্বল অর্থনীতির উপর একমাত্র নির্ভরশীল উপজাতি জনগণকে এই পুঁজিবাদী শোষণের কবল থেকে রক্ষা করার কোন কার্য্যকরী ব্যবস্থা না থাকায় ত্রিপুরার ট্রাইবেলদের এক বিরাট অংশের ঘর সংসার প্রায় ভেঙ্গে পড়ছে। ট্রাইবেলদের এক বিরাট অংশ অসহায় দিন মজুরে পরিণত হয়েছে। প্রতি বৎসর ট্রাইবেলদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ বনের আলু এবং বাঁশের করোল সিদ্ধ খেয়ে বৎসরের একটা সময় কাটাতে হয়েছে। ট্রাইবেল মেয়েদের এক অংশ বাঙ্গালী গ্রামগুলিতে ধর্ণা দিয়ে নামমাত্র মজুরীতে মাঠে কাজ করতে হচ্ছে। এই চিত্র সত্যিই

ভয়াবহ। খেয়াল খুশী মত বন রিজার্ভ সম্প্রসারণ - বনদপ্তরের জুলুম, জুমকাটার উপর জুলুম প্রভৃতি ত্রিপুরার উপজাতি জুমিয়াদের উপর দারুণ আঘাত এনেছে। জুমিয়াদের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছে।

এই শোচনীয় অবস্থার নিরসন নিশ্চয়ই দশ মাস বা এক বৎসর সময়ের মধ্যে করা সম্ভব নয়। তবে এই দশ মাসের ত্রিপুরা সরকার তাদের সম্পর্কে নীরব দর্শক সেজে থাকেন নাই।

গরীব কৃষকদের দুরবস্থার দিকে লক্ষ্য রেখে দুই বৎসরের বকেয়া খাজনা মুকুব করেছেন। খাজনা আদায়ের জন্য জোর জুলুম বন্ধ করেছেন। এতে ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল গরীব অংশই বেশী উপকৃত হয়েছেন। কংগ্রেস সরকারের আমলে বকেয়া খাজনা মকুব হয় নাই এমন নয়। তবে তা করতে কৃষকদের অনেক আন্দোলন করতে হয়েছিল, জেলে যেতে হয়েছিল, এমন কি রক্ত ও দিতে হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার যে গরীব উপজাতি ও অউপজাতি জনগণের সংগ্রামের সহায়ক শক্তি উপরোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্যেই তার প্রমাণ। বামফ্রন্ট সরকার আইন করেছেন জমির উপর কোন খাজনা থাকবে না। জমির আয়ের উপর কর (ট্যাক্স) বসবে। প্রথম তিন একর জমির করের পরিমাণ নির্দ্ধারিত হয়েছে একর প্রতি ২৫ পয়সা মানে সাড়ে সাত কানির জন্য কর দিতে হবে সর্ব মোট ৭৫ পয়সা। এরই অপর নাম সাড়ে সাত কানি পর্যন্ত জমি নিষ্কর। পুঁজিবাদী শ্রেণীর দলের হাতে সরকারী ক্ষমতা থাকলে এগুলি হতো না। এ গুলি কি প্রমাণ করে না যে বামফ্রন্ট সরকার গরীবদের স্বার্থের প্রতি চোখ রেখেই কাজ করছেন।

বনদপ্তর এবং বনরিজার্ভ গরীব উপজাতি সাধারণ মানুষের কাছে এতদিন ছিল নিপীড়ন ও নির্যাতনের প্রতিভূ। জুমিয়াদের জীবন মরণ সমস্যা বিচার না করে খেঁয়াল খুশীমত বনরিজার্ভের সীমানা সম্প্রসারণ করে জুমচাষ বন্ধ কলে দিয়ে এমন কি যেটা বন রিজার্ভের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন বনাঞ্চলও ভবিষ্যতে রিজার্ভ ভুক্ত করা হবে এই অছিলায় জুম চাষ বন্ধ করে দিয়ে কংগ্রেস সরকার উপজাতি জুমিয়াদের চরম দুর্গতি ডেকে এনেছিল। বামফ্রন্ট সরকার এই নিপীড়ন মূলক ব্যবস্থার প্রতিকারের প্রচেষ্টা নিয়েছেন। প্রথম, বন রিজার্ভের বাইরে যে কোন স্থানে জুম চাষ করার বন নির্দ্ধারিত করে দেবার জন্য বনদপ্তরের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন। এইবার প্রায় সব জুমিয়া পরিবারই নির্ঝঞ্ঝাটে জুম চাষ করতে পেরেছেন। বনরিজার্ভ সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও এলাকাবাসীর সাথে আলাপ আলোচনা করেই তা করা হবে।

কাজের মরসুমে ত্রিপুরায় প্রায় প্রতিবৎসরই খাদ্য শস্যের চড়া দাম এবং কাজের

অভাব দেখা দিত। ট্রাইবেলদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কাজের অভাবে, রোজগারের অভাবে মাসের অধিকাংশ দিনগুলিতে অভুক্ত, না হয় অর্দ্ধভুক্ত অবস্থায় বনের আলু বাঁশের করোল বা কাঁটা কাঠাল সিদ্ধ খেয়ে দিন কাটাতেন। মজুরী কখনও কখনও দৈনিক দুটাকার নীচে নেমে যেত। এইবার বামফ্রন্ট সরকার আংশিক ভাবে হলেও গ্রামের কর্মঠ শ্রমিক, বেকার কাজ পেয়েছেন। তাতে একদিকে যেমন অনেক সংখ্যক গ্রামের নূতন রাস্তা হয়েছে বা পুরানো রাস্তার সংস্কার সাধন হয়েছে। তেমনি অনেক বেকার কাজ পেয়েছেন। পূর্বে স্কুল ঘর তৈরী বা মেরামত, পুকুর কাটা বা রাস্তা করা সবগুলিই কন্ট্রাক্টরের মাধ্যমে করা হত। এইবার তা করা হয়েছে এবং হচ্ছে গ্রামবাসীদের দ্বারা। নির্বাচিত পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমে। বন দপ্তর এবং পূর্ত দপ্তর এবং কাজের বদলে খাদ্য এই প্রকল্পগুলিতে দৈনিক নিম্ন পাঁচ টাকা মজুরীর হার চালু থাকায় প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রাইভেট পার্টি যারা মজুর খাটান তারাও পাঁচ টাকা হারে মজুরী দিতে বাধ্য হয়েছেন। কাজের বদলে খাদ্য এই প্রকল্পে আধা দেবার ফলে এইবার ত্রিপুরার বেশীর ভাগ স্থানেই এক কেজি চালের মূল্য আড়াই টাকার উপর উঠতে পারে নাই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দুই টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থেকে গেছে। আমরা একথা নিশ্চয়ই বলব না যে বেকার সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। তবে এ কথা নিশ্চয়ই বলব কিছু গ্রামীণ বেকারদের কাজ দেওয়া গেছে এবং চালের দর অন্যান্য বৎসরগুলির তুলনায় নিম্নমান রাখা হয়েছে।

এই সম্পর্কে অমরপুরের এক মহিলার মন্তব্য এখানে উল্লেখ করতে চাই। তিনি বলেছেন— "বাবু কে রাজা কে উজির হল সেটা আমি বুঝি না। তবে বামফ্রন্ট সরকার কাজ দিয়েছে। বনের আলু সংগ্রহ করতে হয় নাই। বনে ঢুকলে পূর্বের মত এত বেশী আলু তোলার গর্ত দেখতে পাবেন না। চালের দাম ও বাড়ল না বেশী। আসল কথা হল এবার অভুক্ত থাকতে হয়নি।" ত্রিপুরার ইতিহাসে— ঐ কাজ গুলি একটা ভাল পদক্ষেপ এবং গরীব মানুষের স্বার্থের অনুকূলে।

জুমিয়া পুনর্বাসনের পুরান স্কীম একই বদল করা হয়েছে। পূর্বের পুনর্বাসন প্রাপ্ত জুমিয়াদের নতুন করে প্রয়োজন ভিত্তিক সাহায্য দেবার কথা ভাবা হচ্ছে। পশু পালন, ফলের বাগান এবং রাবার বাগান করার পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। উক্ত বাগান থেকে ফসল না পাওয়া পর্যন্ত তাদের বাঁচার ব্যবস্থা কিভাবে করা যায় তারও সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ঐ নূতন স্কীমে থাকবে। তাছাড়া বড় কলোনী বাদেও যেখানে যত সংখ্যক পরিবারের জন্য জমি পাওয়া যাবে সেখানে তত সংখ্যক পরিবারকেই পুনর্বাসন দেওয়া হবে।

পুনর্বাসন পাওয়ার যোগ্য পরিবারগুলি বাছাই করবেন গ্রামের জুমিয়া কমিটিগুলি।

প্রত্যেক গাঁওসভায় নির্বাচিত ট্রাইবেল সদস্যদের নিয়ে গ্রাম পঞ্চায়েত ভিত্তিক জুমিয়া কমিটি গঠিত হবে। এই কমিটি নিজ নিজ গ্রাম সভার অন্তর্ভুক্ত জুমিয়া পুনর্বাসন যোগ্য প্রার্থীদের নামের তালিকা তৈরী করবেন। এই তালিকা ব্লক পঞ্চায়েত সমিতি বাজেট অনুযায়ী নির্দ্ধারিত বৎসরে কত পরিবারকে পুনর্বাসন দেবেন এবং কোন কোন পরিবারকে দেবেন তা ঠিক করবেন। সেই প্রস্তাব মতে সরকার জুমিয়া পুনর্বাসনের কাজ করবেন। জনগণের সহযোগিতা ভিন্ন সঠিক প্রার্থী নির্বাচন করা কঠিন। তাই এই নতুন ব্যবস্থা। কৃষি ক্ষেত্রেও জমি উন্নয়ন, বাধ বা গভীর নলকূপ খননের মাধ্যমে জল সেচ, বীজ ধান ও সার বিলির ব্যবস্থা উন্নয়নের কাজে হাত দেওয়া হয়েছে। ল্যাম্পস খোলা হয়েছে গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের ঋণ দেবার পথ সহজতর করার লক্ষ্য সামনে রেখে। গ্রামাঞ্চলে বিভিন্ন ব্যাঙ্কের শাখা খোলা হয়েছে এবং আরও খোলা হবে। ল্যাম্পসের তত্ত্বাবধানে গ্রামাঞ্চলে ন্যায্য মূল্যে জিনিষ বিক্রয়ের দোকান খোলা হচ্ছে স্থানে স্থানে তাতে উপজাতি জনগণ কিছুটা উপকৃত হবেন।

কংগ্রেসের আমলে অন্য দলে পুষ্ট পঞ্চায়েতগুলিকে বসিয়ে রাখা হতো। তাদের উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হত না। বামফ্রন্ট সরকার সকল দলের দখলীকৃত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে কাজ করার সমান সুযোগ দিচ্ছে। গণতন্ত্রের ভীত শক্ত করছেন। প্রথম দিকে ম্যাট্রিক পাশ ট্রাইবেল সুপার ভাইজার পদে চাকুরী পাওয়া যেত। পরবর্তী সময়ে সেই পদের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা বাড়িয়ে বি এ পাশ করা হয়। এতে স্বাভাবিক ভাবেই ট্রাইবেল প্রার্থীর সংখ্যা কমে যায়। যার ফলে উপজাতি কল্যাণ দপ্তরে ট্রাইবেল সুপার ভাইজার পদের কিছু আসন ট্রইবেলদের জন্য রিজার্ভ থাকা সত্ত্বেও ট্রাইবেলদের প্রবেশ পথ বন্ধ হয়ে যায়। এখন তফসিল জাতি ও তফসিল উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত প্রার্থীরা ম্যাট্রিক বা তার সমতূল্য পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই সেই পদেরপ জন্য যোগ্য বিবেচিত হবেন।

গ্রাম পঞ্চায়েত এর সেক্রেটারী, মৎস্য চাষের দপ্তরের প্রচারক, বালোয়ারী স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং ককবরক ভাষার শিক্ষকতা প্রভৃতি পদগুলির জন্য নন ম্যাট্রিক হলেই যোগ্য বিবেচিত হবেন। পূর্বে ঐ পদগুলিতে ম্যাট্রিক বা ততসমতূল্য শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পন্ন ছাড়া কেহইযোগ্য বিবেচিত হতেন না।

চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ২৯% টি আসন ট্রাইবেলদের জন্য এবং শতকরা ১৩% আসন তফসিলিভুক্ত সম্প্রদায়ের প্রার্থীদের জন্য রিজার্ভ আইনগত ভাবে রয়েছে। এই আইন মতে এতদিন নিয়োগ করা হত না। ফলে উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত আসনে

অ-উপজাতি প্রার্থীদের চাকুরীতে নেয়া হত। বামফ্রন্ট সরকারে আসার সাত দিন আগেও ট্রাইবেলদের জন্য সংরক্ষিত সাতটি ট্রাইবেল সুপারভাইজার পদে নন্ ট্রাইবেল নেওয়া হয়েছিল। বামফ্রন্ট সরকার সেই সাতটি পদ ট্রাইবেলদের জন্য খালি করেছেন। সেই আসনগুলিতে ট্রাইবেল প্রার্থী ছাড়া অন্যদের নেওয়া হবে না। যারা ছাঁটাই হয়েছেন চারজন বাদে তাদের সকলকেই অন্য চাকুরীতে নিয়োগ করা হয়েছে। গতবার যে এক হাজার প্রাইমারী শিক্ষক নিয়োগ করা হয়েছিল তাতে তফসিল সম্প্রদায়ের এবং তফসিল উপজাতি প্রার্থীদের যথাক্রমে ১৩০ এবং ২৯০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। অর্থাৎ এই নিয়োগের ক্ষেত্রে তাদের কোটা অনুযায়ী দেওয়া হয়েছে। শুধু চাকুরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রেই নয় প্রমোশনের উপরেও তফসিলী জাতি এবং তফসিলী উপজাতি ভুক্ত কর্মচারীদের জন্য আসন সংরক্ষণ রাখা হয়েছে। এবং সেই নিয়ম অনুযায়ী কিছু কর্মচারী ইতিমধ্যে প্রমোশন পেয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকারের ঐ কাজগুলি সমাজের অনগ্রসর অংশ ত ফসিলী উপজাতি এবং তফসিলী জাতিদের অনুকূলে হয়েছে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। যারা আজ তফসিলী জাতির নেতা বলে আশা প্রচার করে, তফসিলি জাতিদের প্রতি দরদ দেখিয়ে অ শ্রু বিসর্জন করেন, তাদের অনেকেই কিন্তু বিগত ত্রিশ বৎসর ধরে যারা ত্রিপুরা শাসন করেছেন সেই রাজনৈতিক দল কংগ্রেসের সাথে গাঁট ছড়া বাঁধা ছিলেন। তাঁদের কংগ্রেস সরকার কিন্তু ঐ সামান্য কাজটুকুও তফসিলী সম্প্রদায়ের জনগণের জন্য করেন নাই। অনুরূপভাবে বলা যায় আজকে যারা উপতাজিদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের ইজারাদার রূপে নিজেদের পরিচয় দিচ্ছেন এদের অনেকেই সেদিনও কংগ্রেসের গুণমুগ্ধ ছিলেন বা নানাভাবে কংগ্রেসকে মদত দিয়েছিলেন। এখনও কংগ্রেসের সাথে এদের কারও কারও রাজনৈতিক সম্পর্ক নাই এমন কথা হলপ করে বলা কঠিন। এরা বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে যত কথাই বলুন না কেন যে কাজগুলি বামফ্রন্ট সরকার করেছেন সেগুলি ট্রাইবেলদের স্বার্থে গিয়েছে এমন কথা বলতে পারবেন না। যদি বলেন, তা চক্ষুস্মানদের কাছে গৃহীত হবে না।

উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরৎ দেবার পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকার গ্রহণ করেছেন। শান্তিপূর্ণ ভাবে যাতে এই কাজ করা যায়—, গরীব অউপজাতি যারা সেই জমি ফিরিয়ে দিলে নিঃস্ব হয়ে পড়বেন তাদের যাতে অর্থ এবং জমি গিয়ে পুনর্বাসন দেওয়া যায় বামফ্রন্ট সরকার তার একটা সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণের কথা ঘোষণা দিয়েছেন। এটা শুধু ঘোষণাই নয়, কাজেও পরিণত করা হচ্ছে। এই সংবিধান স্বীকৃত কাজটি করতে গিয়ে বামফ্রন্ট সরকার অউপজাতি জনসমষ্টির একাংশের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হচ্ছেন। যারা বিরোধিতা করছেন তারা উগ্রবাঙ্গালী জাতীয়তাবাদীর ভাবধারার সাথে চরম

সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াচ্ছেন। আর উপজাতিদের মধ্যেও একটি অংশ উগ্রপন্থী রয়েছেন যারা 'বিদেশী' দের হাত থেকে (অর্থাৎ বাঙ্গালীদের হাত থেকে) ট্রাইবেলদের রক্ষার নামে ইতিমধ্যেই বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েকটি স্থানে বাঙ্গালী সাধারণ মানুষদের রাস্তা ঘাটে আটকানো বা অন্যভাবে ভীতি প্রদর্শন এবং ওদের মতাবলম্বী নন এমন ট্রাইবেলদের ধমক দেওয়া প্রভৃতি কাজে লিপ্ত হয়েছেন। এর পরিণতি ভয়াবহ। এতে ট্রাইবেলদের কোন লাভ হবে না। ত্রিপুরার বিভিন্ন সংস্কৃতি ও বিভিন্ন ভাষাভাষী দুই বড় জনসমষ্টি বা গোষ্ঠী রয়েছেন। এরটি গোষ্ঠী বাঙ্গালী যারা নানা দিক দিয়ে ট্রাইবেলদের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রসর। আর অপর গোষ্ঠী হলো বিভিন্ন দফার ট্রাইবেল যারা বাঙ্গালীদের তুলনায় দুর্বল ও অনগ্রসর। এই দুই সম্প্রদায়ের শ্রমজীবী মানুষের পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সংগ্রামী ঐক্যই হবে ত্রিপুরার ট্রাইবেল জনগণের অগ্রগতির পথ। আজ যারা — এই দুই বড় জনগোষ্ঠীকে ঐক্যের পথ থেকে দূরে সরিয়ে নিয়ে একে অপরের বিরুদ্ধে মারমুখী করে তুলছেন তারা যে ট্রাইবেল বা রাজ্যব্যাপী সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম বন্ধু নন্ এই মুহূর্তেই তা বিশেষ ভাবে তলিয়ে দেখা প্রয়োজন।

ট্রাইবেলদের যে চার দফা দাবী তা কিভাবে পূরণ করা যায় বামফ্রন্ট সরকার সক্রিয় ভাবে বিচার করছেন। দুটি দাবী পূরণের জন্য ইতিমধ্যেই প্রাথমিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এক, কগবরক ভাষার উন্নতি সাধনের জন্য কগবরক ভাষীদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করা হয়েছে। দুই, বেআইনীভাবে হস্তান্তরিত জমি ফেরত দেবার কাজ বামফ্রন্ট সরকার ইতিমধ্যেই শুরু করেছেন। যেগুলিতে আইনগত বাধা রয়েছে সেগুলি সম্পর্কেও প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য বিচার বিবেচনা করছেন। অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল সম্পর্কেও সংবিধান পরিবর্তন না করে অর্থাৎ রাজ্য সরকারের এক্তিয়ারভুক্ত ক্ষমতায় কতটুকু করা যায় - তাও বিচার বিবেচনা করা হচ্ছে। তবে সংবিধান সংশোধন না করলে ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিলের হাত বেশী কার্যকরী ক্ষমতা রাজ্য সরকার দিতে পারবে না। এই ক্ষমতা একমাত্র কেন্দ্রীয় সরকারই দিতে পারেন সংবিধান সংশোধন করে।

রাজ্য সরকার ত্রিপুরা বিধানসভায় প্রস্তাব পাশ করে অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন অটোনমাস ডিষ্ট্রিক্ট কাউন্সিল ত্রিপুরায় চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করেছেন। শুধু প্রস্তাব পাশ করেই বসে থাকেনি। সেই বিষয়টির উপর বার বার কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে এই কাজ কতটুকু করা যায় সে সম্পর্কে বিধানসভায় বিরোধীদলের সদস্যদের সাথে আলোচনা করেছেন বামফ্রন্ট সরকার। এতেই বোঝা যায় — যে, ট্রাইবেলদের সেই চার দফা দাবী পূরণে বামফ্রন্ট সরকার খুবই আগ্রহশীল।

ত্রিপুরায় উপজাতি এবং অউপজাতি জনগণের গণতান্ত্রিক দায়িত্ব হলো এই কাজে বামফ্রন্ট সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা। উপজাতিদের চার দফা দাবী আদায়ের নামে আজ যারা সশস্ত্র বিদ্রোহের মহড়া দিচ্ছেন গ্রামাঞ্চলে অরাজকতা সৃষ্টির প্রস্তুতি চালাচ্ছেন, তাদের সাথে সহমত নন এমন বাঙ্গালী ও ট্রাইবেলদের উপর ভীতি প্রদর্শন করছেন। আসলে ট্রাইবেলদের ৪ দফা দাবী আদায় যে তাদের মূল লক্ষ্য নয়, তাদের মূল লক্ষ্য হল — বামফ্রন্ট সরকার আজ ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল শোষিত মানুষের স্বার্থে সীমিত সুযোগের মধ্যে দিয়ে এ সরকার যেটুকু ভাল কাজ করতে যাচ্ছেন তা বানচাল করা এবং শোষক শ্রেণীর হাত শক্তিশালী করা। ত্রিপুরার ট্রাইবেল এবং নন ট্রাইবেল সকল অংশের গণতান্ত্রিক মানুষের বক্তব্য হবে বামফ্রন্ট সরকারকে শক্তিশালী করা, বিভেদকামী এবং রাজ্যে অরাজকতা সৃষ্টি, প্রয়াসী শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রাম চালানো।

('দেশের কথা', ১৩ বর্ষ, ৫ ম সংখ্যা, ২৬ কার্তিক ১৩৮৫ বাংলা, ১৩ নমভেম্বর ১৯৭৮ ইং)

সাম্প্রদায়িকতা নয় প্রয়োজন গণতান্ত্রিক ঐক্যের

লোকসভার নির্বাচনে এইবার ত্রিপুরার অবাম দলগুলির চরম সাম্প্রদায়িকতার অস্ত্র শানিত করে আসরে নামছেন। তারা ত্রিপুরার ট্রাইবেল ও নন ট্রাইবেল এবং হিন্দু মুসলমানের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য ধূলিস্মাৎ করতে ত্রিপুরাবাসীদের আত্মঘাতি ভ্রাতৃকলহে নামাতে তৎপর হয়ে উঠেছেন। দীর্ঘদিন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি যে বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে তুলেছেন, সকল প্ররোচনা ও সাম্প্রদায়িক উস্কানীর বিরুদ্ধে নিরলস সংগ্রাম করে ত্রিপুরার সকল জাতি ও উপজাতি এবং সকল ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলেছেন তা বানচাল করতে ত্রিপুরার প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থবাদীরা নিজেদের শোষণ ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রাখার জন্য নানান রাজনৈতিক দলের জন্ম দিয়ে ত্রিপুরাকে একটা ভ্রাতৃকলহে লিপ্ত ভূখন্ডে পরিণত করতে নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। 'বিপুল জনসমর্থন পুষ্ট শোষিত জনগণের বাঁচার সংগ্রামের নির্ভরযোগ্য মিত্র বামফ্রন্টের মোকাবেলা করতে তারা সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বিদ্বেষের বিষ ছড়াচ্ছেন। এইভাবে নির্ব াচনী আবহাওয়া উত্তপ্ত করে তারা বাজীমাৎ করতে চাচ্ছেন।

অবশ্য শোষকশ্রেণীর পক্ষে এই অস্ত্র প্রয়োগ নতুন কিছু নয়। যখনই শাসকশ্রেণী শোষিত জনগণের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের সম্মুখীন হন, তখনই শ্রমজীবী জনগণকে জাতি ধর্মের ভিত্তিতে ভাগ করার জন্য তারা এই জঘন্য অস্ত্র প্রয়োগ করে থাকেন। আমরা দেখেছি এই প্রয়োগ করেই কংগ্রেস ত্রিপুরায় ত্রিশ বৎসর ক্ষমতায় ছিল। ঐ অস্ত্র প্রয়োগ করে আবার সঙ্গীতে ফিরে আসতে স্বপ্ন দেখছেন।

কংগ্রেস গত ত্রিশ বৎসরে বাঙ্গালী জনসমষ্ঠীর এক বড় অংশকে উপজাতি শ্রমজীবী জনগণ থেকে পৃথক করে রেখেছিলেন। শোষণের হাত থেকে তাদের মুক্তি পাওয়ার আন্দোলনকে "বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে আন্দোলন" বলে অপবাদ দিয়ে, বাঙ্গালী জনগণের এক বড় অংশকে উপজাতিদের সম্পর্কে এবং কমিউনিস্টদের সম্পর্কে সন্দিগ্ধ ও আতঙ্কগ্রস্ত করে রেখেছিলেন। শাঁক দিয়ে মাছ ঢাকার মত নিজেদের শোষণ ও উৎপীড়নকে ঢেকে রাখছিলেন বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের মনে অহেতুক ট্রাইবেল আতঙ্কের হিস্টিরিয়া (মৃগীরোগ) সৃষ্টি করে। যাত্রাভিনয় মঞ্চের নকল সেনাপতির মত পোষাক পরে বাঙ্গালী-দের রক্ষক সেজেছিলেন এতদিন। কিন্তু কংগ্রেস যে সাধারণ বাঙ্গালীদের রক্ষক না হয়ে ভক্ষকের কাজ করছিলেন সেই মুখোশ খসে পড়ল ১৯৭৮ সালে বিধানসভার নির্বাচনে। বাঙ্গালী সাধারণ মানুষ ঐ মুখোসপরা নকল বাঙ্গালী প্রেমিকদের স্বরূপ হাড়ে হাড়ে বুঝতে

পারলেন। তাদের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করলেন। বিপুল সংখ্যক গণতন্ত্রপ্রিয় বাঙ্গালী ভোটদাতাগণ বামফ্রন্টের পক্ষে ভোট দিয়ে বামফ্রন্টকে ক্ষমতায় বসালেন। কংগ্রেস ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। স্বনামী কংগ্রেসত ডুবলই, বেনামী কংগ্রেসীরাও ডুবলেন। অর্থাৎ যারা কংগ্রেসের ঘর ছেড়ে অন্য নতুন নামে নতুন ভাবে রাজনীতির ঘর সংসার পাততে চাইলেন তারাও ঐ স্বনামী কংগ্রেসীদেরই সাথী হলেন। বর্ণচোরাদের ত্রিপুরা বাসী ঠিকই চিনে ফেললেন। ঘৃণাভরে তাঁরা প্রত্যাখ্যাত হলেন জনগণ কর্তৃক।

ত্রিপুরায় যে কোন শান্তিপ্রিয় নাগরিক যে কোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন ব্যক্তি ঐ অবাম দলগুলির কার্যকলাপ ও উক্তিগুলি শুনলে হতবাক না হলেও উদ্বেগ বোধ করবেন। ত্রিপুরার জনগণকে জাতি ও উপজাতিতে বিভক্ত করে চরম সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বালিয়ে তারা ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের মারণ খেলায় মেতে উঠেছেন।

লক্ষ্য করুন উপজাতি যুব সমিতি লোকসভার দুইটি আসনে প্রার্থী দেবেন। ট্রাইবেলদের স্বার্থ রক্ষা করতে হলে, ত্রিপুরার উপজাতিদের বাঙ্গালীদের বাজত্বের অন্ধকূপ থেকে উদ্ধার করতে হলে নাকি উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের অবশ্যই লোকসভায় পাঠাতে হবে। তাঁরা লোকসভায় গেলে নাকি ত্রিপুরা থেকে বাঙ্গালী নির্মূল করবেন। কি চরম প্রবঞ্চনা। এই ধরনের প্রবঞ্চনার মধ্য দিয়েই তাঁরা ট্রাইবেলদের বিভ্রান্ত কবে বুর্জোয়া জমিদার, সুদখোর মহাজন প্রভৃতি কায়েমী স্বার্থের সেবা করতে চান। দেশের শোষকশ্রেণীকে তাড়াতে হলে উপজাতি ও অউপজাতি অংশের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ লড়াই এব প্রয়োজন এই মৌলিক সত্যটুকু গোপন রেখে উপজাতিদেব বাঙ্গালীদের বিরুদ্ধে ক্ষেপাতে চান।

ত্রিপুরার উপজাতি জনগণও জানেন যে, একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্য ছাড়া ভারতের আব কোন রাজ্যে উপজাতি যুব সমিতি নাই। উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্য গুলির যেখানে উপজাতিরা বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল রাজ্যগুলি উপজাতি রাজনৈতিক দলগুলির আসল চেহারা কি ? সেগুলি নামেমাত্র পৃথক উপজাতি সংগঠন, কিন্তু কাজে ভারতের কোন না কোন বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষাকারী বড় রাজনৈতিক দলগুলির সাথে জড়িত। কেউ কেউ ইতিমধ্যে কোন না কোন দলে ভিড়েও গেছেন। অরুণাচল প্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী গদী হারাবার সাথে সাথেই সদলবলে ইন্দিরা কংগ্রেসে নাম লিখিযে ফেলেছেন। যে নামেই ট্রাইবেল সংগঠন করুন না কেন বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর তল্পীবাহক রাজনৈতিক দলগুলির সাথে মিশে গিয়ে বা তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ইতি দিয়ে আপোষ করে বা তাদের লেজুড়বৃত্তি করে শোষিত বঞ্চিত অনগ্রসর উপজাতি জনগণের কোন কল্যাণ সাধন করতে

পারবেন না। তাতে কিছু সুবিধাবাদী ট্রাইবেল নেতাদের ভাগ্য, খুলতে পারে মাত্র। ত্রিপুরা উপজাতি জনগণের বেশীর ভাগই এই বাস্তব সত্যটুকু সম্পর্কে অবগত বলেই তাদের উপর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য উপজাতি সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজ্যগুলির উপজাতি সংগঠনগুলির তুলনায় ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি যুব সমিতি এই চরম সঙ্কীর্ণ ও বিভেদমূলক শ্লোগানের তেমন কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারছে না।

ত্রিপুরার ট্রাইবেলরা একথা ভাল করে জানেন যে, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর রাজত্বে তারাই সবচাইতে বেশী বঞ্চিত হয়েছেন। শ্রীমতী গান্ধীর আশীর্বাদ পেয়েই সেনগুপ্ত সরকার মহারাজার আমলের ট্রাইবেল রিজার্ভের অবলুপ্তি ঘটান। তাদের ছত্রছায়ায় আশ্রয় পেয়েই ত্রিপুরার সুদখোর মহাজন ও অসাধু ব্যবসায়ীরা অবাধে ত্রিপুরাতে গরীবদের লুন্ঠন করতে সমর্থ হন। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ করতে সমর্থ হন। অথচ উপজাতি যুব সমিতি এই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং সেনগুপ্তের সরকারের দুধ কলায় পুষ্ট হয়েই উপজাতি জনগণের সামনে লম্ফজম্ফ করছিলেন এবং জোর গলায় বলছিলেন যে তারা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে ভাঙবেন, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে উপজাতি এলাকা থেকে উচ্ছেদ করবেন। যে শোষক কংগ্রেস সরকারের যাঁতাকলে পড়ে ত্রিপুরার উপজাতিদের এত দুর্ভোগ এই যুব সমিতি নেতারা কিন্তু ভুলেও একটিবার উচ্চারণ করেন নাই যে তাঁরা সেনগুপ্ত সরকারকে ভাঙবেন, ইন্দিরা সরকারকে ভাঙবেন।

ত্রিপুরাবাসী অবশ্যই জানতে চাইবেন একটি কথা। এ কথা অবধারিত যে উপজাতি যুব সমিতির দুইজন প্রার্থীর অন্যান্য বারের মত এবারও জামানত জব্দ হবে। ধরুন, তর্কের খাতিরে যদি ধরে নেয়া যায়, তারা দুটি আসনেই জিতবেন, তাহলে কি ৫৪২ আসন বিশিষ্ট লোকসভায় আইন পাশ করে উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের পথ করে দিতে পারবেন? না, তারা তা করতে পারবেন না। বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রেখে তা করা যায় না। প্রয়োজন হল গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের সাথে ঐক্যবদ্ধ বুর্জোয়া জমিদারদের নাগপাশ থেকে দেশের সকল জাতি ও উপজাতি গোষ্ঠীভুক্ত শোষিত মানুষকে মুক্ত করার সংগ্রামকে তীব্রতর করা এবং এই সংগ্রামে সাফল্য লাভ করা।

লোকসভার নির্বাচনী সংগ্রাম কি ত্রিপুরা থেকে বাঙ্গালী রাজত্ব খতম করার? না, তা নয়। ত্রিপুরায় গত ত্রিশ বৎসর গোটা বাঙ্গালী জাতির রাজত্ব চলে নাই। যাছিল তা হল সর্বভারতীয় বুর্জোয়া জমিদারশ্রেণীর রাজত্ব। আর ত্রিপুরায় ছিল তাদের আর্শীবাদপুষ্ট বাঙ্গালী কায়েমী স্বার্থবাদী অংশের শাসন। এই শোষক অংশের বাঙ্গালীদের সাথে শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত বাঙ্গালী জনগণের স্বার্থের কোন সম্পর্ক নাই। তারাও গরীব ট্রাইবেলদের

মতই কংগ্রেসী রাজত্বে সমভাবে শোষিত ও বঞ্চিত। কংগ্রেসী রাজত্ব যদি গোটা বাঙ্গালীদের রাজত্ব হত, তা হলে এই কংগ্রেস রাজত্বে ৬০ হাজার শিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক আজ বেকার থাকতেন না। আড়াই লক্ষ বাঙ্গালী আজ ভূমিহীন হয়ে থাকতেন না।

কাজেই ত্রিপুরার ট্রাইবেল এবং নন - ট্রাইবেল অংশের সাধারণ মানুষ একথা ভাল ভাবেই জানেন যে, উপজাতি যুব সমিতি বামফ্রন্টের বিরোধিতার মধ্য দিয়ে গণতন্ত্রের বিরোধিতা করছেন, শোষিত মানুষের সংগ্রামী ঐক্যে ফাটল ধরাতে চাইছেন। সর্বোপরি ত্রিপুরা ভূখন্ডের সাধারণ মানুষের সাম্প্রদায়িক কলহে কলঙ্কিত করতে চাইছেন। কংগ্রেস রাজত্বের শোষন, বঞ্চনা ও উৎপীড়নের সেই অন্ধকারময় দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে চাইছেন। অন্ধকার রাত্রি অন্ধকারের জীবদের অবাধ বিচরণের পক্ষে বড়ই অনুকূল।

সম্প্রতি সাংবাদিক সম্মেলনে ইন্দিরা কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাখার নেতা শ্রী অশোক ভট্টাচার্যে উক্তি শুনে যে কোন গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন নাগরিক শিউরে উঠবেন। কী চরম সাম্প্রদায়িকতা ও জাতিবিদ্বেষ নিয়ে তিনি আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে লড়তে চান তার ইঙ্গিত দিয়েছেন। তিনি বলেছেন — আসন্ন লোকসভার নির্বাচনে তার দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি হলো তার দল জিতলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বাতিল করবেন। উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরতের আইন বাতিল করবেন।

তাঁর নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এগার বৎসর রাজত্ব বিশেষতঃ জরুরী অবস্থার সময়ে দেশের সাধারণ মানুষের কি ধরণের নিরাপত্তা ছিল সেকথা হয়ত অশোক বাবু এতদিনে ভুলে যেতে পারেন কিন্তু দেশবাসী এত সহজেই ভুলে যাবেন বলে অশোকবাবু ধরে নিলে হিসাবে মহাভুলই করবেন। জরুরী অবস্থার সময়ে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার অত্যাচার, উৎপীড়ন, গ্রেপ্তার ও হত্যার বিবরণ এখানে বিবৃত করা অনাব্যশ্যক। তারপরের ঘটনাই মনে করে দেখুন না — ধরুন, চিকমাগালুর লোকসভার আসনে শ্রীমতী গান্ধীর বিজয়ের পরবর্তী কয়েকটি দিনগুলির কথাই। প্রধানমন্ত্রীর গদী ফিরে পাওয়া নয়, শ্রীমতী গান্ধী এম পি হয়েছেন মাত্র। তাতেই বিজয়োল্লাসে শ্রীমতী গান্ধীর বাহিনী কি তান্ডব নৃত্যই না করেছিলেন রাজ্যে রাজ্যে। বিলোনীয়াতে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি অফিস ভাঙ্গচুর, ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে দোকানপাট লুন্ঠন, গৃহদাহ প্রভৃতি কোন কাজটাই না তারা বাদ দিয়েছিলেন সেদিন। এই সেদিনও নির্বাচনের বাদ্য শুনেই অশোকাবাবুদের গুণগ্রাহী একদল যুবক উদয়পুরের ত্রিপুরেশ্বরী বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে একা পেয়ে রাতের অন্ধকারে মারধোর করেছিলেন। এই অসামাজিক কাজ করে ঐ বীর পুঙ্গরেরা নাকি

ইন্দিরা গান্ধী জিন্দাবাদ" শ্লোগান দিতে দিতে প্রস্থান করেছিলেন। এই হলো অশোক বাবুদের জনগণের প্রতি নিরাপত্তা দানের নমুনা। অশোকবাবুদের নেত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ফিরে পেলে জনগণের নিরাপত্তা যে ফিরে আসবে না বরং আজকের নিরাপত্তা যে আরো বিপন্ন হবে সে সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ আছে কি? ত্রিপুরাবাসী নিশ্চয়ই এই দানবীয় শক্তিকে সঞ্জীবিত করে তুলবেন না।

অশোকবাবুর ঐ উক্তিটি চরম সাম্প্রদায়িক বিষে বিষাক্ত। উপজাতিদের নিম্নতম সাংবিধানিক রক্ষা কবচের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণাও কায়েমী স্বার্থান্ধ বাঙ্গালী অংশের সেবা করার প্রতিশ্রুতি, গোটা বাঙ্গালী জাতটাকে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে লোকসভার বৈতরণী পর হবার হীন কৌশল। গণতন্ত্র হত্যার ষড়যন্ত্র। অশোকবাবুদের ঐ অস্ত্র এইবারের নির্বাচনে ত্রিপুরায় তেমন বিকোবে না। ত্রিপুরায় জনগণ গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষা করে শোষকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ ও দৃঢ় সঙ্কল্প।

অশোকবাবুদের রাজনৈতিক অভিধানে এটা না থাকলেও ত্রিপুরার জনগণ জানেন এই নির্বাচনী লড়াইটা ত্রিপুরার উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ থাকবে কি থাকবে না এই প্রশ্নগুলির উপর নয়। এই লড়াইটা হচ্ছে আরও বড় প্রশ্নকে কেন্দ্র করে। এই লড়াইটা হচ্ছে কারা কেন্দ্রীয় সরকার দখল করবেন? স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তি, না বাম গণতান্ত্রিক শক্তির সহযোগিতায় অন্য কোন শক্তি যারা স্বৈরতান্ত্রিক ও সাম্প্রদায়িক শক্তিগুলির মোকাবেলা করে দেশে দেশে গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বজায় রাখতে সাহায্য করবেন? আরও সোজাভাবে বলতে গেলে এই লড়াইয়ে কি দেশবাসী শ্রীমতী গান্ধী বা জনতা দলকে গদীতে বসিয়ে গণতন্ত্রের কবর দেবেন, না তাদের পরাজিত করে গণতন্ত্র বিকাশের পথ প্রশস্ত করবেন? এই বৃহৎ ও গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তই দেশবাসীকে নিতে হবে। ত্রিপুরাবাসীর রাজনৈতিক চেতনাকে অশোকবাবুরা বড় ছোট ও খেলো করে দেখছেন। প্রাদেশিকতার গন্ডি টেনে এনে নির্বাচনী বৈতরণী পার হতে চাইছেন।

আমরা বাঙ্গালী দলের কথা বলে লাভ নেই। তারা প্রকাশ্যেই সাম্প্রদায়িক। ফ্যাসিজমের থেকেই ঐ দলটির জন্ম। আজ একথা খুবই স্পষ্ট যে কংগ্রেস, সি এফ ডি, ইন্দিরা কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী দল সকলেই এই লোকসভার নির্বাচনে ত্রিপুরার অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু উপজাতিদের বিরুদ্ধে গোটা বাঙ্গালী জাতির ধর্মযুদ্ধে পরিণত করতে চান। অপরপক্ষে উপজাতি যুব সমিতিও এই নির্বাচনী লড়াইটাকে গোটা বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে ট্রাইবেলদের ধর্মযুদ্ধ পরিণত করতে চান। এরাই আবার অবাম জোট গড়ার স্বপ্ন দেখেন। কে না জানে, এই অবাম জোট মানেই হল শোষকদের জোট। অ-বাম জোট

কারা চান? এই অবাম জোট চাল জমিদার পুঁজিপতি, রাজা মহারাজা, সুদখোর, মহাজন, মজুতদার ও মুনাফাফোররা। নিজেদের শোষণের রাজত্ব বজায় রাখতে, শোষিত মানুষকে পায়ের তলায় দাবিয়ে রাখতে তারা এই অবাম জোট চান। বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে এই অবাম জোট তাদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষার জন্য দেশের ট্রাইবেল ও নন ট্রাইবেল শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত অংশের জনগণকে একে অন্যের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এই নির্বাচনী রনাঙ্গনকে ট্রাইবেলদের বিরুদ্ধে নন ট্রাইবেলদের রণাঙ্গনে পরিণত করতে চান।

ত্রিপুরার মত রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন রাজ্যে তাদের এই জঘন্য সাম্প্রদায়িক রাজনীতি হালে পানি পাবে না। এই রাজ্যে স্বনামী বা বেনামী কংগ্রেস ইতিপূর্বে তাদের ঘরের মত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। উপজাতি যুব সমিতির যে যৎসামান্য প্রভাব ছিল উপজাতিদের মধ্যে তাতে ইতিমধ্যেই প্রচন্ড ধ্বস নামতে শুরু করেছে। তাদের প্রভাবিত উপজাতিরা দলে দলে উপজাতি যুব সমিতি ত্যাগ করে বামফ্রন্টে যোগদান করছেন। কাজেই প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক উস্কানীদাতাদের সকল ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়ে ত্রিপুরার জনগণ বাম গণতান্ত্রিক ঐক্য আরও সুদৃঢ় করে তুলবেন । বেনামী কংগ্রেস দুই বৎসর আগেই তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে। এই দুই বৎসরে উপজাতি যুব সমিতিতে প্রচন্ড ধ্বস নামতে শু রু করেছে।

ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণ এই নির্বাচনে কখনও সাম্প্রদায়িকতা ও জাতি বিদ্বেষের বিষ পানে আত্মহত্যা করবেন না। তারা বাম গণতান্ত্রিক সংগ্রামী ঐক্য জোরদার করে তুলবেন।

("সাপ্তাহিক দেশের কথা" ১৪ বর্ষ ৪ সংখ্যা ৯ নভেম্বর ১৯৭৯ ইং ২২ কার্তিক ১৩৮৬ বাংলা)

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও স্বৈরতন্ত্র

স্বৈরতন্ত্র বুর্জোয়া শাসন ব্যবস্থার অন্যতম নিকৃষ্ট রূপ। স্বৈরতান্ত্রিক শাসন মানেই হল ভয়, ভীতি ও জোর জুলুমের রাজত্ব। দেশে স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হলে দেশের সাধারণ মানুষের/ নাগরিকের জীবন ও জীবিকা, ব্যক্তি স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র কত বিপন্ন হয়ে পড়ে দেশবাসী তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ১৯ মাস ব্যাপী জরুরী অবস্থাকালীন দেশ শাসনের সময়ে। মিসা আইনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকদের গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে জেলে আটক রাখা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা হরণ, সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ, বাক স্বাধীনতা হরণ, বৃত্তিকরের জুলুম, শ্রমিক ধর্মঘটের প্রতিবাদী আন্দোলন বন্ধ করে দিয়ে মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির সুযোগদান, দেশ রক্ষার নামে দেশের সাধারণ নরনারীর উপর বল্গাহীনভাবে জুলুম ও নির্যাতন ইন্দিরা সঞ্জয়ের (মাতা পুত্রের) বহু বিঘোষিত সুখী পরিবার গঠনের তথাকথিত ধনন্তরী দাওয়াই জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে বন্ধ্যাত্বকরণে জোর জুলুম থেকে আরম্ভ করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের লোকদের গুপ্তহত্যা এইসব চলেছিল সেই জরুরী অবস্থার সময়ে। পুলিশের হাতে এত অধিক ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যে পুলিশ যাকে খুশী তাকেই নানাভাবে হয়রাণি করতে পারতেন। সেই সময়ে একমাত্র শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও তার পুত্র সঞ্জয় গান্ধী ছাড়া দেশের ব্যাপারে আর কারোর টুশব্দ করার উপায় ছিল না। ইন্দিরা-সঞ্জয় এই দুটি নাম জরুরী অবস্থার সময়ে একটা বিভীষিকা। ইউরোপ মহাদেশে নাৎসী বর্বরতার প্রসঙ্গ উঠলে যেমন সর্বাগ্রে হিটলার এবং 'গোয়েবলস' এই দুটি নাম এসে পড়ে তেমনি অধুনা ভারতের স্বৈরতন্ত্রের প্রসঙ্গ উঠলেই ইন্দিরা এবং সঞ্জয় এই মাতাপুত্রের নাম সর্বাগ্রে আসতে বাধ্য।

স্বৈরতন্ত্রী মানেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মানেই স্বৈরতন্ত্র ভারতের বেশীরভাগ লোক অন্তত তাই মনে করেন। ভারতের ইতিহাসে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্বৈরতন্ত্রের প্রতিভূরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছেন এবং থাকবেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এবং তার দলের লোকেরা যতই প্রতিবাদ করুন না কেন জনগণের মন থেকে এটা সহজে মুছে ফেলা যাবে না।

১৯ মাসব্যাপী জরুরী অবস্থার দিনগুলি অর্থাৎ ১৯৭৫ সালের লোকসভার নির্বাচনের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেশ শাসনের ইতিহাস জনগণের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস। অত্যাচার, উৎপীড়ন ও জোর জুলুমের ইতিহাস। জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে, মিসা আইন চালু করে দেশব্যাপী রাজনৈতিক ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের বিনাবিচারে জেলে আটক রেখে ভারতব্যাপী জনমনে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক

সৃষ্টির ইতিহাস। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা হয়েছে সর্বত্র। কাজেই এখানে আর সেই আলোচনা করছি না।

জনতা সরকারের বিশ্বাসঘাতকতা এবং অপদার্থতার দরুন এবং দেশে বাম ও গণতান্ত্রিক দলগুলির দুর্বলতার দরুন ১৯৮০ সালের নির্বাচনে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রচুর সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে আবার ক্ষমতায় ফিরে আসতে পেরেছেন। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা, ত্রিপুরা, তামিলনাড়ু এবং জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্যগুলি বাদে বাকী সব রাজ্যেই কংগ্রেস(ই) নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করেছেন। এক কথায় স্বৈরতন্ত্রের পুনরাবির্ভাব ঘটেছে। এবং ইতিমধ্যেই দেশের জনগণ এই পরিবর্তনের দুর্ভোগ ভুগতে শুরু করেছেন।

ভারতে এই স্বৈরতন্ত্রের আবির্ভাব একটি মাত্র গোষ্ঠী বা পরিবারের হাতে দেশ শাসনের একচ্ছত্র ক্ষমতা কুক্ষিগত করার প্রবণতার মধ্য দিয়ে। একক ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীর হাতে রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতা কুক্ষিগত করায় প্রচন্ড বদনেশাই ১৯৭৫ সালে ভারতে এই স্বৈরতন্ত্রের জন্ম দেয়। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীই এই স্বৈরতন্ত্রের মূল হোতা।

একটি মাত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠী তখনই স্বৈরতন্ত্রের পথ গ্রহণ করতে পারে যখন শাসকগোষ্ঠীর রাজনৈতিক দলের মধ্যে গণতন্ত্র আর থাকে না — যখন সেই দলের ক্ষমতা একটি মাত্র ব্যক্তির হাতে কেন্দ্রীভূত হয়। অর্থাৎ তার একার ইচ্ছার উপরই নির্ভর করে দলের কাজকর্মের গতিবিধি এবং ভূত ভবিষ্যৎ। অপর পক্ষে সেই সময় যখন দেশবাসী অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে দেশের ক্ষমতায় বসাবার বিকল্প শক্তি হিসাবে দেখতে পান না। প্রায় অসহায়ের মত পথ হাতড়াতে থাকেন। ১৯৭৫ সালের পূর্বে কংগ্রেস (ই) দলের অবস্থা তাই ছিল। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর ইচ্ছার অনিচ্ছার উপর জোরালো প্রতিবাদ করা বা তার ভয়ঙ্কর স্বৈরতান্ত্রিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে দলীয় লোকদের মতামত গঠন করে তাঁকে সেই মারাত্মক পথ থেকে বিরত করার মত ক্ষমতা বা সাহস কংগ্রেস (ই) দলের মধ্যে কারোরই ছিল না। তাই শ্রীমতী গান্ধী জরুরী অবস্থার সময় চরম স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পেরেছিলেন। বুর্জোয়াদের প্রদত্ত সংসদীয় গণতন্ত্রের টুঁটি টিপে ধরতে পেরেছিলেন। তাই ১৯৭৭ সালের লোকসভার নির্বাচনের সময় ইন্দিরা সঞ্জয় এই দুইটি নাম ভারতের সংসদীয় গণতন্ত্রের সংহারক রূপে বেশী সংখ্যক জনগণের মনে চিত্রিত হয়েছিল। তাই তাদের দলের শোচনীয় পরাজয় ঘটেছিল।

১৯৮০ সালে শ্রীমতী গান্ধীর দল শাসন ক্ষমতায় ফিরে আসার পর কি সেই অবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে? না, আদৌ ঘটে নাই। সেই একই কদর্য্য চেহারা রয়ে গেছে। একটি গ্রাম্য প্রবাদ আছে যে নদী পার হলেই বাঘের চামড়া বদলায় নাই। শ্রীমতী ইন্দিরা

গান্ধী সম্পর্কে সেই একই কথা বলা চলে।

১৯৮০ সাল শেষ হতে চলেছে। অর্থাৎ শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নতুন শাসন এক বৎসর হতে চলেছে। কি প্রশাসনিক ক্ষেত্রে, কি দেশের জনগণের দৈনন্দিন সমস্যার সমাধানে, কি তাঁর দলীয় সমস্যার সমাধানে কোথায়ও গণতান্ত্রিক রীতিনীতি অনুসরণের নাম গন্ধ নাই। সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব। গণতন্ত্র ও জনমতকে উপেক্ষা করার মনোভাব। শ্রীমতী গান্ধী দিল্লীর গদীতে বসেই ৯টি রাজ্যের অ-কংগ্রেস (ই) সরকারগুলি ভাঙ্গলেন। নিজের মত করে নির্বাচন করে দলের লোকদের জিতিয়ে আনলেন। নির্বাচনে জয়ের পর রাজ্যগুলিতে সরকার গঠন নিয়ে ঝামেলা দেখা দেয়। এই ঝামেলার মধ্যেও প্রধান বিবেচ্য বিষয় ছিল — যাকে মুখ্যমন্ত্রী করা হবে, যাদের নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে সরকার গঠন করা হবে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি তাঁদের আনুগত্য কতটা গভীর। কেবলমাত্র দলের প্রতি আনুগত্য থাকলেই চলবে না — শ্রীমতী গান্ধীর এবং তার পরিবারের ব্যক্তিবর্গের প্রতিও আনুগত্য থাকতে হবে। ঐ গুণাবলী থাকলে (অর্থাৎ দাস্য-মনোবৃত্তি থাকলে) তবেই দলের যোগ্য ব্যক্তি বিবেচিত হতেন। এযেন সামন্ত যুগের মোগল বাদশাহদের রাজনীতি। বাদশাহের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের বিভিন্ন প্রদেশ বা সুবা শাসনের প্রতিনিধি করে পাঠানো। এই পদ্ধতির সাথে গণতন্ত্রের কোন সম্পর্ক নাই। এতে জনগণের মতামতের উপর কোন মূল্য দেওয়া হয় না।

দেখা গেছে কংগ্রেস (ই) দলের বিধানসভায় নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে থেকে খুব কম রাজ্যেই মুখ্যমন্ত্রী বাছাই করা হয়েছে। লোকসভার নির্বাচিত ব্যক্তিদের মধ্য থেকেই শ্রীমতী গান্ধী রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী করে পাঠিয়েছেন। এই হল স্বৈরতন্ত্রের খেলা। কংগ্রেস (ই) দলে যারাই থাকবেন তাদের সকলকেই জনগণের প্রতি আনুগত্য ভুলতে হবে। অবশ্য কংগ্রেস (ই) দলের লোকদের কাছ থেকে জনগণের প্রতি আনুগত্য প্রত্যাশা করাটা একটা মোহ ছাড়া কিছু নয়। কংগ্রেস (ই) দলে থাকতে হলে —গণতন্ত্র ভুলতে হবে। দলের কাছে ব্যক্তিগত রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করার নিম্নতম গণতান্ত্রিক অধিকার বিসর্জন দিতে হবে। কেবল ইন্দিরা ভজন গাইতে হবে। এ যেন গল্পের সেই মায়ারাণী রাজকুমারী দেশ বিদেশ থেকে যত রাজকুমার তার পানিগ্রহণ করতে যেতেন সকলকেই মন্ত্র বলে পাঁঠা বানিয়ে ছাগ গৃহে আটকিয়ে রাখতেন। অর্থাৎ মায়াবিনী রাজকুমারীর কাছে গেলে সবাই পাঁঠা বণে যেতেন। কংগ্রেস (ই) দলের হালও অনেকটা তাই।

ইন্দিরা স্তাবকদের রাজীব গান্ধীকে সঞ্জয় গান্ধীর স্থলাভিষিক্ত করার নাচানাচি ও দাস মনোবৃত্তিরই নগ্ন প্রকাশ। মূল লক্ষ্য হল শ্রীমতী গান্ধীকে খুশী করা। এ যেন ছাগ

শিশুদের ঘাতককে খুশী করার প্রতিযোগিতা। যাকে কখনও রাজনীতিতে এপর্যন্ত দেখা যায় নাই, যার রাজনীতির বিচার ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব দেবার যোগ্যতা এপর্যন্ত যাচাই হয় নাই তাকে দলের হাল ধরার এই সাধাসাধি, তাকে ভাবী প্রধানমন্ত্রীর গদীতে বসানোর এই জল্পনা কল্পনা, তাকে রাজনীতিতে নামানোর জন্য প্রস্তাব গ্রহণ এবং সই সংগ্রহ কংগ্রেস (ই) দলের রাজনৈতিক সুস্থতার পরিচায়ক নয়। এটা হলো দলের দেউলিয়া রাজনীতির পরিচয়।

এর মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী প্রশংসা কুড়ানোর মত কি করেছেন? বড় বড় প্রতিশ্রুতি দিয়ে, জনগণকে ভুলিয়ে ভোট আদায় করে গদীতে বসেছেন। এখন পর্যন্ত জনগণের একটি সমস্যাও সমাধান করতে পারেন নাই। সব জিনিষের দাম আগুন। পত্রিকায় দেখা যায় বোম্বাই শহরে নাকি ১ কেজি চিনি ১৮ টাকা বিক্রয় হচ্ছে। এই ত্রিপুরাতেও চিনি কেজি প্রতি ১১/১২ টাকা পর্যন্ত উঠেছিল। চিনি কেন অন্যান্য সব নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির মূল্যও প্রায় একই হাল। শ্রীমতী গান্ধীর সরকার এই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ করতে পারেন নাই। করার মত কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে তার সরকারের কোন অভিপ্রায় আছে বলে মনে হয় না। তারই সরকারের আশীর্বাদে কংগ্রেস (ই) রাজ্যগুলিতে মিনি মিসা আইন চালু হয়েছে। আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স জারী করে শ্রীমতী গান্ধীর সরকার প্রকারান্তরে দেশকে জরুরী অবস্থার কাছাকাছি নিয়ে যাচ্ছে। বিনা বিচারে যেকোন ব্যক্তিকে এক বৎসর আটক রাখার ক্ষমতা হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্য সরকারগুলির মতামত ছাড়াই দিল্লী থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে যেকোন রাজ্যের যেকোন নাগরিককে এই অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেপ্তার করে বিনা বিচারে আটক রাখার হুকুম রাজ্যের পুলিশকে দেবার ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে রাখা হয়েছে। তার অর্থ রাজ্যগুলির সায়ত্বশাসনের অধিকারের উপর নগ্ন হস্তক্ষেপ করার ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করে রাখা হয়েছে।

স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা দেশে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার নামে পুলিশ ও সমাজ বিরোধীদের হাতে দেশের জনগণের ভাগ্য ছেড়ে দেয়। সমাজ বিরোধী এবং পুলিশের যোগসাজস ছাড়া স্বৈরতন্ত্রের টিকে থাকা সম্ভব নয়। স্বৈরতন্ত্র মানেই হল ভয়ভীতির রাজত্ব। জনগণের মনে নির্যাতনের আতঙ্ক সৃষ্টি করতে না পারলে স্বৈরতান্ত্রিক শক্তি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে না। তাই এই বিনা বিচারে আটক অর্ডিন্যান্স দিয়ে স্বৈরতন্ত্রের পথে শ্রীমতী গান্ধীর নতুনভাবে যাত্রা শুরু । যে সমাজ বিরোধীরা এতদিন অনেকটা আত্মগোপন করে রয়েছিল শ্রীমতী গান্ধী এবং তার দলের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ফিরে আসার পর তারা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। শ্রীমতী গান্ধীর দলের পরিচয় দিয়ে জনগণকে চোখ রাঙাতে শুরু করেছে। তারা এই সব অপকর্মে শ্রীমতী গান্ধীর দলের

নেতাদের সমর্থন ও সহযোগিতা পাচ্ছে। উত্তরপ্রদেশের জনৈক জনতা এম এল এ অভিযোগ করেছেন যে উত্তরপ্রদেশের বিধানসভায় নাকি কংগ্রেস (ই) দলের প্রায় ৭৫ জন সদস্য আছেন যাদের বিরুদ্ধে সমাজবিরোধী মূলক কার্যকলাপের অভিযোগ পুলিশের খাতায় লিপিবদ্ধ আছে। এটা কি প্রমাণ করে না যে, স্বৈরতন্ত্রের পথে পা বাড়াতে হলে কিছু সমাজবিরোধীদের রাজনৈতিক মুখোশ পরিয়ে কংগ্রেস (ই)তে ভিড়তে হবে যাদের মাধ্যমে জনগণের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা যায়।

রাজ্যে রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী মনোনয়ন এবং কংগ্রেস (ই) দলের কর্মকর্তা নির্বাচনের মধ্যও দেখা গেছে যে ১৯৭৭ সালের লোকসভার নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী এবং তার দলের পরাজয়ের পর শ্রীমতী গান্ধীর দলের দুর্দিনের সময় তার দলে রয়ে যাওয়াটাই তার প্রতি বিশ্বস্ততার একমাত্র মাপকাঠি নয়, জরুরী অবস্থার সময়ে তার স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের লাগাম ধরে রাখতে কে কতটুকু বিশ্বস্ততার সাথে কাজ করেছিল তাও এই মাপকাঠির অন্যতম বিচার্য বিষয়। তা না হলে ইন্দিরার দুর্দিনে ধারে কাছেও ছিল না অথচ জরুরী অবস্থার সময় যারা বিশ্বস্ততার সাথে শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক হাত শক্ত করেছিল তাদের অনেকেই শ্রীমতী গান্ধীর দলে হোমরা চোমরা হয়েছেন কি করে? এই ত্রিপুরাতেও দেখা যায় - যে সুখময় সেনগুপ্ত গোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধীর দুর্দিনে ধারে কাছেও ছিলেন না — অথচ জরুরী অবস্থার সময় শ্রীমতী গান্ধীর স্বৈরতান্ত্রিক হাত শক্ত করার জন্য দমন-পীড়ন চালিয়েছিল সেই সুখময় সেনগুপ্ত গোষ্ঠীর হাতেই ইন্দিরা গান্ধী ত্রিপুরা রাজ্য কংগ্রেস (ই)-র কর্তৃত্ব ছেড়ে দিলেন। এটা দলীয় গণতন্ত্রের উপর বিশ্বাস করে নয় — স্বৈরতন্ত্রের সেবা করতে অর্থাৎ স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সহায়ক কারা বেশী হবেন সেই বিচার করেই এই বাছাই হয়েছে এটা ধরে নেওয়া যায়।

ইদানীং শ্রীমতী গান্ধী বলতে শুরু করেছেন — পার্লামেন্ট বড় না দেশ বড়। তার অর্থ দাঁড়ায় দেশের স্বার্থের প্রয়োজনে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র বিসর্জন দেওয়া যায়। নীতির দিক থেকে পার্লামেন্ট নিশ্চয়ই দেশের চেয়ে বড় নয়। পার্লামেন্টে এমন আইন পাশ হওয়া উচিত নয় যা দেশের জনগণের স্বার্থ বিপন্ন করে। কিন্তু একজন স্বৈরতান্ত্রিক শাসক শ্রীমতী গান্ধীর পক্ষ থেকে যখন পার্লামেন্টকে ছোট করে দেখার এই যুক্তি আসে তখনই প্রশ্ন জাগে শ্রীমতী গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রকে আবার কোথায় টেনে নামাতে চান। সংবিধানে ৪২তম সংশোধনের মধ্য দিয়ে শ্রীমতী গান্ধী সংসদীয় গণতন্ত্রের অঙ্গচ্ছেদ করেছিলেন। আর এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায় এড়ানোর জন্য প্রধানমন্ত্রীর নির্বাচন সংক্রান্ত মামলার বিচার করার আদালতের ক্ষমতাও কেড়ে নিলেন। এটা দেশের কোন স্বার্থে করা হয়েছিল? সংসদ সদস্যদের সংসদের অধিবেশনের বক্তৃতা সংবাদপত্রে ছাপানো যাবে কি যাবে না তা

চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা গোয়েন্দা পুলিশ অফিসারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। এটা দেশের কোন স্বার্থ রক্ষা করেছিল? তাই স্বৈরতান্ত্রিক শাসকরা যখন দেশের স্বার্থ রক্ষা করার নামে কথা বলেন তখন বুঝতে হবে শোষকশ্রেণীর কোন একটা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য ঐসব মন ভুলানো কথা বলছেন।

পশ্চিমবঙ্গ সফরের সময় শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য রেখেছেন। একটি মন্তব্য লক্ষ্যণীয়। তাহল পশ্চিমবঙ্গ বা অন্যান্য রাজ্যের অ-কংগ্রেস (ই) সরকারগুলি ভাঙ্গার তাঁর কোন ইচ্ছা নাই। এই উক্তি হল স্বৈরতান্ত্রিক মানুষের উক্তি। ঐ সরকারগুলি কি শ্রীমতী গান্ধীর ইচ্ছায় গড়ে উঠেছিল? এই সরকারগুলি গড়ে উঠেছে জনগণের ইচ্ছায়, জনগণের ভোটে। যতদিন পর্যন্ত সাংবিধানিক সঙ্কট এই রাজ্যগুলিতে দেখা না দিচ্ছে ততদিন পর্যন্ত এই সরকারগুলি ভাঙ্গার প্রশ্ন উঠে কি করে? সংসদীয় গণতন্ত্রের রীতিনীতি অনুসরণ করে চললে এই প্রশ্ন আদৌ উঠতে পারে না। সংবিধানে রাজ্যগুলির উপর রাষ্ট্রপতির হস্তক্ষেপ করার যে অতিরিক্ত ক্ষমতা (একস্ট্রা-অর্ডিনারী পাওয়ার) দেওয়া হয়েছে তা যখন খুশী প্রয়োগ করার জন্য নয়। অতীতে শ্রীমতী গান্ধী এই ক্ষমতার অপপ্রয়োগ করেছেন বহু ক্ষেত্রে তাই, এই স্বৈরতান্ত্রিক শাসক সম্পর্কে দেশের গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির সর্বদা সচেতন থাকতে হবে। কংগ্রেস (ই)-র বিকল্প হচ্ছে দেশের বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যই। এই মুহূর্তে শুধু বাম ও গণতান্ত্রিক ঐক্যই নয় - স্বৈরতান্ত্রিক বিরোধী সমস্ত গণতান্ত্রিক শক্তিকেই ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। স্বৈরতন্ত্রকে রুখতে হবে।

জীবন দেববর্মা, ('সাপ্তাহিক দেশের কথা' ১৫বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ৭ নভেম্বর, ১৯৮০, ২১শে কার্তিক, ১৩৮৭ বাংলা)

কমরেড কালিদাস দেববর্মার স্মৃতিতে

শহীদ কমরেড কালিদাস দেববর্মা এখন আর শুধু একটি নাম নয়। আন্দোলনের একটি যুগের নিদর্শন। কালিদাস দেববর্মার জন্ম ত্রিপুরা রাজ্যের সদর বিভাগের রামচন্দ্র চন্তাই পাড়ায়। রাজমালা বিখ্যাত চতুর্দশ দেবতার পূজারী রামচন্দ্র চন্তাই ছিলেন কমরেড কালিদাস দেববর্মার পিতামহ। কালিদাস দেববর্মার পিতা ছিলেন খুশাচন্দ্র দেববর্মা। দেব দ্বিজের প্রতি অগাধ ভক্তি ও বিশ্বাসী পরিবারে কমরেড কালিদাস দেববর্মা শৈশবে লালিত পালিন হন। ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্ট আদর্শে পরিচালিত উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকারের চক্রান্তনীতির প্রতিবাদে প্রতিরোধ সংগ্রামের সময় কমরেড কালিদাস দেববর্মার জ্যোষ্ঠভ্রাতা কমরেড শ্যামাচরণ দেববর্মা আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন। কমরেড শ্যামাচরণ দেববর্মার মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে সদর উত্তর এলাকায় পার্টি ও গণমুক্তি পরিষদের সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে কাজ করেন।

কমরেড শ্যামাচরণ দেববর্মার মৃত্যুর পর কমরেড কালিদাস দেববর্মা সক্রিয় রাজনীতিতে নামেন। তাঁর কর্মদক্ষতা এবং জনগণের প্রতি দায়িত্ববোধের পরিচয় দিতে থাকেন। খুব শীঘ্রই তিনি জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

কমরেড কালিদাস যখন রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আসেন তখন কমিউনিস্ট পার্টির উপর নানাদিক থেকে তীব্র আক্রমণ চলছিল। পার্টি এবং ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন রক্ষার সঙ্কল্প নিয়েই তখন তিনি এগিয়ে আসেন। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তিনি সেই সঙ্কল্পে অটুট থেকে শহীদ হয়েছেন।

১৯৬২ সাল চীন ভারত সীমান্ত সংঘর্ষ। ভারতের জাতীয়তাবাদীর কমিউনিস্টদের উপর আক্রমণে মুখর। ভারত রক্ষা আইনে ভারতের সর্বত্র শত শত কমিউনিস্টকর্মীরা বিনা বিচারে জেলবন্দী। এই ত্রিপুরা থেকেও সম্মুখ সারির কমিউনিস্ট নেতা ও কর্মীদের ৬৩ জন ভারতরক্ষা আইনে গ্রেপ্তার হয়ে বিনা বিচারে সুদূর বিহার জেলে বন্দী। কংগ্রেস সরকার এবং কংগ্রেস কর্মীদের এক বড় অংশ গ্রামে গঞ্জে ভীতি প্রদর্শন করছিলেন এই বলে "এইবার লাল ছাড়, কমিউনিস্ট পার্টি ছাড়। নতুবা জেলে গিয়ে পচতে হবে। উপজাতি এলাকাগুলিতে চলছে নতুনভাবে দমন পীড়ন। এই চীন ও ভারতের সীমান্ত বিরোধকে কেন্দ্র করে যে সংঘর্ষ হয়েছিল ১৯৬২ সালের নভেম্বর মাসে সেই ঘটনাকে কংগ্রেস পুরাপুরি ব্যবহার করছিল ত্রিপুরায় কমিউনিস্ট নির্মূল করার মওকা হিসাবে। যদিও কমিউনিস্ট নির্মূল হয়নি। উপজাতি জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে

চেষ্টা করেছিল। সরকারীভাবে সাহায্যে উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলির অনেক জমি, যেমন খোয়াই বিভাগের শান্তিনগর, আখড়া ও রামদুলাল মোজা, অমরপুর বিভাগের পঙ্কু প্রভৃতি এলাকাগুলির জমি উপজাতিদের হাত থেকে কেড়ে নিয়ে উপজাতি অখন্ডতার উপর প্রচন্ড আঘাত হেনেছিল। বিনা বিচারে আটক এবং অনির্দিষ্টকালের জন্য জেলবন্দী হবার ভয়ে অনেকেই তখন মুখ খুলতে সাহস পান নাই। উপজাতি গ্রামগুলিতে চলছিল, পুলিশের সন্ত্রাস। তখন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যেও দারুণ মতানৈক্য দেখা দেয়। কমরেড এস এ ডাঙ্গের নেতৃত্বে একদল শোধনবাদের পথ গ্রহণ করেন। পার্টি দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। শোধনবাদীরা চীনের বিরোধিতার নামে উগ্রজাতীয়তাবাদের পঙ্কে ডুবে যান কংগ্রেস সরকারের লেজুড় পরিণত হন। শোধনবাদীদের দল ত্রিপুরা রাজ্যেও বৈপ্লবিক আদর্শকে বিকৃত করার প্রয়াস পায়। অবিভক্ত কমিউনিস্ট পার্টির প্রভাবিত উপজাতি জনগণকে শোধনবাদীদের প্রভাবে টেনে নিতে চেষ্টা করেন।

১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সালের প্রতিরোধ সংগ্রামে পোড় খাওয়া উক্ত এলাকার প্রতিষ্ঠিত নেতা চিত্ত দেববর্মা এবং বিশ্বরায় দেববর্মা। (খেনতীবীব) দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলে যোগদান করেন। আরেক জন অন্যতম প্রতিষ্ঠিত নেতা বগলা প্রসাদ দেববর্মা কংগ্রেসে যোগদান করেন। তারা যৌথভাবেই চেষ্টা চালান যাতে উক্ত এলাকায় মার্ক্সবাদী কমিউনিস্টদের প্রভাব আর না থাকে। ঐসব পুরানো ও বহু পরিচিত নেতাদের তুলনায় তখন পর্যন্ত কম খ্যাত ব্যক্তি কমরেড কালিদাস দেববর্মা সেদিন অল্প অভিজ্ঞতা নিয়ে মার্কসবাদের আদর্শের প্রতি অটুট বিশ্বাস রেখে এগিয়ে আসেন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলন ঝাপিয়ে পড়েন। সি পি আই এবং কংগ্রেস এই দুই দলের সাথে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিকভাবে মোকাবেলা করে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সংগঠন রক্ষা করেন। গণআন্দোলনের মধ্য দিয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই কমরেড কালিদাস দেববর্মা সদর উত্তর এলাকায় একজন প্রতিষ্ঠিত নেতারূপে পরিচিতি লাভ করেন। তিনি সদর উত্তর উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের বিভাগীয় কমিটির সম্পাদক ছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত এই আসনে অলঙ্কৃত ছিলেন।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি জন্ম লাভ করে। এই উপজাতি যুব সমিতি জন্ম লগ্ন থেকেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধিতা করতে থাকে। এমন এক সময় গেছে যে, যখন এই সদর উত্তর এলাকায়, বিশেষতঃ কমরেড কালিদাস দেববর্মার প্রথম কর্মক্ষেত্র উতলা অঞ্চল থেকে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে উচ্ছেদ করার জন্য উপজাতি যুব সমিতি, সি পি আই এবং কংগ্রেস (ই) এই তিনটি রাজনৈতিক দলকে এক জোট হয়ে কাজ করতে দেখা গিয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক সমাজ

ব্যবস্থা গঠনের সোপান রূপে সকল জাতি ও উপজাতি শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গঠনের তিনি এসব অশুভ শক্তিগুলির প্ররোচনা এবং আক্রমণের মোকাবেলা করে গেছেন। তারই নির্ভীক পদক্ষেপ ও যোগ্য নেতৃত্ব পার্টিকে ঐ ত্রিমুখী আক্রমণের মোকাবেলা করে উতলা অঞ্চলে লাল ঝান্ডা উড্ডীন রেখেছে।

তাই সাম্রাজ্যবাদীদের সাহায্যপুষ্ট বিচ্ছিন্নতাবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির তল্পীবাহক উপজাতি যুব সমিতি ঘাতকদল একজন জনদরদী, সর্বহারা শ্রেণীর নির্ভরযোগ্য যোদ্ধা এবং সংগ্রামী মানুষের সংগঠনকে গুপ্ত হত্যা করে সংগ্রামের কর্মক্ষেত্র থেকে সরিয়ে দিলেন। একটি বাজার থেকে মীমাংসা বৈঠক করে বাড়ী যাবার পথে রাতের অন্ধকারে অতর্কিতে দলবদ্ধভাবে আক্রমণ করে উপজাতি যুব সমিতি তাঁকে হত্যা করে ১৯৭৯ সালের ৩০ শে ডিসেম্বর। লোকসভা নির্বাচনের আগে কমরেড কালিদাসকে হত্যার মধ্য দিয়ে উপজাতি যুব সমিতি যে "ব্যক্তি হত্যা" ও সন্ত্রাসের জঘন্য রাজনীতিতে পা বাড়ালেন আজ তাদের সেই রাজনীতি আরও কদর্য ও বীভৎস রূপ নিয়েছে। এই রাজনীতির শিকার হয়েছেন ত্রিপুরার আরও সুসন্তান। এই রাজনীতি সাহায্য করেছে ত্রিপুরার বুকে জুন মাসের ভয়াবহ দাঙ্গা লাগাতে।

ব্যক্তি হত্যা, সন্ত্রাস ও সাম্প্রদায়িকতার মধ্য দিয়ে দেশের জনগণের কল্যাণ হয় না, কোন মহৎ কাজ সাধন হয় না, এটা যেমন সত্য আবার ব্যক্তি হত্যা এবং সন্ত্রাসের পথে গণতান্ত্রিক অগ্রগতিকে রোখাও যায় না— এটাও সত্য।

কমরেড কালিদাস দেববর্মা ত্রিপুরার সংগ্রামের ইতিহাসে অমর থাকবেন। যে আদর্শের জন্য সংগ্রাম করে তিনি গণতন্ত্রের শত্রুদের হাতে নিহত হয়েছেন, সেই আদর্শকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার দৃঢ় সঙ্কল্প গ্রহণ করে দ্রুতপদে এগিয়ে যাবেন, দেশের শত সহস্র মানুষ। কমরেড কালিদাস অমর রহে।

(২বর্ষ , ১২ তম সংখ্যা, ৩০ শে ডিসেম্বর, ১৯৮০ ইং)

আসন সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন

গুজরাটে হরিজনদের জন্য মেডিকেল কলেজে আসন সংরক্ষণ তুলে দেবার দাবীতে বর্ণ হিন্দু মেডিকেল ছাত্রদের আন্দোলন চলছে। সেই আন্দোলন শুধু মেডিকেল ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। এই আন্দোলন বিরাট অংশের বর্ণ হিন্দুদের মধ্যে বিস্তৃতি লাভ করেছে। তা হরিজনদের বিরুদ্ধে বর্ণ হিন্দুদের যুদ্ধে পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার ৩৪ বৎসর পরও একটা অনগ্রসর ও বিভিন্ন দিক থেকে বঞ্চিত হরিজনদের উপর এই ধরণের অত্যাচার হতে দেখে দেশের শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষেরা নিশ্চয়ই আতঙ্কে শিহরিয়া উঠবেন। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা যে দেশের যুব শক্তিকে কোন রাস্তায় নিয়ে যাচ্ছে তাও নতুন করে ভাববেন।

গত ১৪ মার্চের সংখ্যায় 'টাইমস অব ইন্ডিয়া' পত্রিকায় শ্রী রমেশ মেনন যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা যে কত নির্মম ও ভয়াবহ এবং তথাকথিত নিম্নবর্ণের লোকদের প্রতি বর্ণ হিন্দুদের জাতক্রোধ কত জঘন্যভাবে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে এটা তারই জলন্ত নির্দশন।

শ্রী মেনন লিখেছেন যে মেহসীনা জেলায় বিজাপুর তালুকের ডেন্টুজ নামক হরিজন বস্তিতে প্রায় দুই হাজার বর্ণ হিন্দুরা রাত্রে সহসা আক্রমণ করেন। অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করেন। কেরোসিন ও পেট্রল ঢেলে হরিজনদের ঘরবাড়ী ভস্মীভূত করতে আশপাশ থেকে খড় সংগ্রহ করে আগুন ছিটিয়ে দেওয়া হয়। সেই গ্রাম থেকে প্রায় ৫০০ হরিজন পালিয়ে যেতে বাধ্য হন। সেই গ্রাম এখন শ্মশান পুরীতে পরিণত হয়েছে। পাখীগুলির কুঞ্জন ছাড়া আর মানুষের অস্তিত্ব নাই।

পালিয়ে যাবার সময় কুকওয়ের গ্রামের রাজপুতরা তাদের আশ্রয় দেন। রাজপুত সরপঞ্চ দলপতি সিং এবং সাম্মান সিং ঐ হরিজনদের আশ্রয় দেন। প্রথমে দাঙ্গা কবলিত হরিজনরা রাজপুতদের কথায় আশ্বস্ত হতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত অবশ্য তারা সেই গ্রামেই আশ্রয় নেন।

গুজারিয়া গ্রামে হরিজনদের সেই একই হাল। সেখান থেকে প্রায় এক হাজার পরিবারকে আক্রান্ত হয়ে গ্রাম ছেড়ে পালাতে হয়েছে। এভাবে একের পর এক হরিজন গ্রামগুলো পরিত্যক্ত গ্রামে পরিণত হয়েছে।

সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শঙ্কর ভাট হরিজন বলেন, কেন যে বর্ণ হিন্দুরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছেন, আমাদের ঘর ছাড়া করেছেন তা আমরা এখনো বুঝতে

পারি না। আমরা সকলেই বর্ণ হিন্দু জমিদারদের ফার্মে কাজ করে খাই দৈনিক (চার) ৪ টাকা মজুরীতে। আমাদের গ্রামের কোন হরিজন ছেলে কখনো মেডিকেল কলেজে যায় নাই। কোনদিন যাবে কিনা বলতে পারি না। দিনমজুরের ঘরের ছেলে-মেয়েরা ডাক্তার হতে পারবে? কেন এই গরীর লোকদের উপর বাবুদের এত আক্রোশ?

তিনি আরও বলেন, আমাদের এখন সমূহ বিপদ। একদিকে ঘরবাড়ী পুড়ে ছাঁই হয়ে গেছে। অপরদিকে যা কিছু ছিল সব নষ্ট করে দিয়ে গেছে, নয়ত লুটে নিয়ে গেছে। আমরা এখন বাঁচব কি করে?

তিনি বলেন, এখন সংরক্ষণ বিরোধীরা আমাদের ভাতে মারার ব্যবস্থা নিয়েছেন। আমাদের বয়কট করেছেন। আমাদের কাছে কেউ জিনিষপত্র বেঁচতে পারবে না। আমাদের কেউ কাজ দেবে না। ফার্মে মালিকরা আমাদের কাজ না দিলেও চলতে পারেন। নিসকান্ত খরা পীড়িত এলাকা থেকে তারা মজুর পাচ্ছেন।

তিনি আরও বলেন, সরকার আমাদের দৈনিক মাথাপিছু এক টাকা পঞ্চাশ পয়সা দিচ্ছেন। ঐ টাকা দিয়ে আমরাা কি করব? কেউ আমাদের জিনিষ বেঁচছে না।

কেউ জিনিষ না বেঁচলে দৈনিক পঞ্চাশ টাকা দিলেও কি ফায়দা হবে? রাজপুতরা আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। খাইয়েছেন। কিন্তু তাদের ভান্ডারও অফুরন্ত নয়। তারা কতদিন চালাবেন? আশপাশের যে হরিজন বস্তিগুলো রয়েছে যারা আক্রান্ত হননি, তারাও খাবার পাঠিয়েছেন। কিন্তু এরাওত আমাদের মতনই গরীব। বেশীর ভাগই দিনমজুর। ওদেরওত কেউ কাজ দিচ্ছেন না। ওদের যা আছে সবই শেষ হয়ে যাবে। তারাই বা আমাদের বাঁচাবেন কি করে? জনৈক হরিজন যুবক ক্ষোভের সাথে বলেছেন এখানের কোন রাজনৈতিক দলের উপর আমাদের আর আস্থা নাই। বুর্জোয়া রাজনৈতিক দলগুলির চেহারা হরিজনদের কাছে ফুটে উঠেছে। রিপোর্টে বলা হয়েছে শুধু মেডিকেল ছাত্রই নয়, ডাক্তার, গেজেটেড, নন গেজেটেড কর্মচারী, ছাত্র ও অন্যান্য পেশায় বর্ণ হিন্দুদের এক বড় অংশ এই আন্দোলনে সক্রিয়। কর্মচারীরাত একদিন কলম ধর্মঘট করেই ফেলেছেন।

এই সংরক্ষণ বিরোধী ভাবধারা আজকে হঠাৎ করে জন্ম নেয়নি। সংরক্ষণ বিরোধী প্রবক্তাদের ইতিপূর্বেও দশ বৎসর মেয়াদ অন্তে অন্তে যখনই সংসদে আলোচনা হয়েছিল তখনই জাতের ভিত্তিতে নয়, আর্থিক অবস্থার মাপকাঠিতে সংরক্ষণ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ওকালতি করতে দেখা গেছে। তাদের সুর মিলিয়ে অনেক তাবড় তাবড় সংবাদপত্র এবং পন্ডিত ব্যক্তিদের এই বক্তব্যের সমর্থনে বক্তব্য রাখতে দেখা গেছে।

এই সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলনের সমর্থক যে ত্রিপুরা রাজ্যে নাই এমন কথা বলব কি করে? আগরতলার কয়েকটি সংবাদপত্র ইতিমধ্যেই দরিদ্র জনের প্রতি অশ্রু বিসর্জনের ভান করে আর্থিক অবস্থার মানদন্ডের ভিত্তিতে সুযোগ সুবিধা দেবার সংরক্ষণ ব্যবস্থার পক্ষে ওকালতি করেছেন। কেবল মাত্র বর্ণ হিন্দুর ঘরে জন্ম নিয়েছেন বলেই গরীব বর্ণ হিন্দুর ছেলে-মেয়েরা সেই সুযোগ সুবিধা থেকে বঞ্চিত হবেন কেন এই প্রশ্ন তুলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার চেষ্টা করছেন। এই ধরনের যুক্তি দাঁড় করিয়ে তপশীল জাতি ও উপজাতির জন্য সংরক্ষণ ব্যবস্থা বাতিল করার স্বপক্ষে রায় দিচ্ছেন বা এই সংরক্ষণ বিরোধী প্রবণতা চাঙ্গা করার চেষ্টা করছেন। এরা গরিবের নামে ঐ সব কথা বলেন বটে, কিন্তু জীবনভর সেবা করে করে আসছেন কায়েমী স্বার্থের। এটা আমাদের অজানা নয়। তপশীল জাতি ও উপজাতি ভিন্ন অন্য অংশের গরিবদের জন্য সুযোগ বাড়ানো হউক এতে আপত্তি করার কিছু নেই। কিন্তু এই অনগ্রসর অংশের জনসমষ্টির স্বার্থ জলাঞ্জলি দিয়ে তা করতে গেলে তপশিলী জাতি এবং তপশিলী উপজাতিদের সমস্যার সাথে অন্যান্য অগ্রসর বংশোদ্ভব গরিব অংশের সমস্যাকে এক পর্যায়ে ফেলা অত্যন্ত ভুল পদক্ষেপ হবে। কেউ কেউ শ্রীজগজীবন রাম এবং ত্রিপুরার কিরীট বিক্রমের কথা উল্লেখ করেছেন। তাঁদের মত সম্পদ কত শতাংশ হরিজন এবং উপজাতিদের এই ভূভারতে আছে? অনগ্রসর প্রাথমিক গ্রুপ ভিত্তিক না হয়ে যদি আর্থিক মানদন্ডের ভিত্তিতে সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয় অথবা মেধা ভিত্তিক মেডিকেল অন্যান্য বিষয়ে উচ্চ শিক্ষার জন্য আসন পাবার ব্যবস্থা হয় তা হলে এই অনগ্রসর সমাজের লোকদের নিম্নতম বিকাশের সুযোগ আর অবশিষ্ট থাকবে না।

ত্রিপুরার কথাই ভাবুন না। এ রাজ্যে উপজাতিদের শতকরা ২৯ জন চাকুরী পাওয়ার কথা। ৩০ বৎসর কংগ্রেসী শাসনে শতকরা ৫ জনেরও চাকুরী হয় নাই? ৪র্থ শ্রেণীর চাকুরী পাবার মত উপজাতি যোগ্য প্রার্থীর কি অভাব ছিল গত ৩০ বৎসর? ছিল না। তবু পায় নাই কেন? বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর প্রায় পাঁচ হাজারের মত উপজাতি চাকুরী পেয়েছেন। মাধ্যমিক, স্কুল ফাইন্যাল, উচ্চ মাধ্যমিক পাশের সংখ্যাই হবে এক হাজারের মত। এরা কংগ্রেস রাজত্বের সময়ই পাশ করে বেকার ছিলেন। তাঁরা এতদিন চাকুরী পান নাই কেন? আসন সংরক্ষণ থাকা সত্ত্বেও পান নাই। শাসকগোষ্ঠীর এদের প্রতি তাচ্ছিল্য মনোভাব এর মূল কারণ। আসন সংরক্ষণ তুলে দিলে তাদের দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই ব্যবধান ও বৈষম্যকে যদি আমরা আর বাড়াতে না চাই এবং তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীর জনগণকে যদি অন্ধকারের গহ্বরে ঠেলে দিতে না চাই তা হলে, সংরক্ষণ ব্যবস্থা রাখতেই হবে। গরীবদের সাথে তাদের সমস্যাকে এক করে দিয়ে বিষয়টিকে ঘোলাটে করার এই প্রচেষ্টা আসলে তপশিলীভুক্ত জাতি এবং উপজাতির প্রতি

মান্ধাতার আমল থেকে চলে আসা সেই বৈষম্য বজায় রাখারই আর একটি ষড়যন্ত্র। কায়েমী স্বার্থবাদীরাই গুজরাটের এই আন্দোলনে বর্ণ হিন্দুর মেডিকেল ছাত্রদের ক্ষেপিয়ে তুলেছেন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। এটাই কায়েমী স্বার্থবাদীদের পথ। এই পথেই পুঁজিবাদীরা শ্রমজীবী মানুষের জাত ও সম্প্রদায় এবং ধর্মের ভিত্তিতে পৃথক করে রেখে নিজেদের কায়েমী স্বার্থ রক্ষা করতে চান। এই রাজ্যে আদিম অধিবাসীদের সকল স্বার্থ কবর দিতে অগ্রসর অংশের নবাগতদের একাংশ উন্মত্ত হয়ে উঠেছেন। গণতান্ত্রিক মানুষের এ সম্পর্কে আরও সতর্ক থাকতে হবে।

[জীবন দেববর্মা, দেশের কথা (সাপ্তাহিক) ২৫ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা, ২৭ মার্চ - ১৯৮১]

রাষ্ট্রযন্ত্র নিরপেক্ষ নয়

কমরেড ভি ই লেনিন বলেছেন, মার্কসবাদীদের পত্রিকা মার্কসবাদকে জনগণের কাছে নিয়ে যাওয়ার বাহন এবং পার্টি সংগঠক এই উভয় ভূমিকাই পালন করে। কমরেড লেনিনের জন্ম দিবসে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটির মুখপত্র 'ডেইলি দেশের কথা'র নবকলেবরে প্রথম প্রকাশের দিনে কমরেড লেনিনের মতবাদ অর্থাৎ মার্কসবাদ সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ের প্রতি দিকপাত করার প্রয়োজন মনে করেই এই লেখা লিখছি।

১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর রাশিয়ায় কমরেড লেনিনই প্রথম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন — 'আজ থেকে এক নতুন দুনিয়ার সূচনা হল।' তার অর্থ জনগণের উপর ধনিক গোষ্ঠীর উৎপীড়নের যন্ত্র রাষ্ট্রীয়-যন্ত্র শ্রমিকশ্রেণীর দখলে এল। এই রাষ্ট্রীয়-যন্ত্রকে শোষণহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার যন্ত্ররূপে ব্যবহার করার ক্ষমতা রাশিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর করায়ত্ত হল। আজ বিশ্বের এক তৃতীয়াংশেরও বেশী দেশগুলিতে সমাজতন্ত্র কায়েমের মধ্য দিয়ে সেই সবদেশগুলিতে মানুষের প্রতি মানুষের শোষণের শাসনের মধ্য দিয়ে বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীগুলির সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে কমবেড লেনিনেব সেই বাণীই সত্য প্রমাণিত হলো। সোভিয়েত রাশিয়াই কমরেড লেনিন এবং সোভিয়েত রাশিয়ার বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সর্বহারা শ্রেণীর মুক্তির প্রথম পথপ্রদর্শক। মার্কস, এঙ্গেলস্, লেনিন আজ আর শুধু ব্যক্তি বিশেষের নামই নয়, একটা নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, একটা নতুন আদর্শের প্রতীক ও প্রতিষ্ঠান, যা দুনিয়ার শোষিত ও বঞ্চিত মানুষের কাছে নব দিগন্তের দিশারী।

বুর্জোয়া দার্শনিক ও ধর্মযাজকরা একটা মতবাদ দাঁড় করিয়ে রাষ্ট্র সম্পর্কে নানা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে গেছেন এবং করছেন। তাদের মতবাদ হল , 'রাষ্ট্র একটা স্বর্গীয় ব্যাপার অলৌকিক ব্যাপার, রাষ্ট্র এমন একটা শক্তি যা মানুষের হাতের বাইরে অলৌকিক একটা কিছু এনে দেয় বা দিতে পারে, রাষ্ট্র হল একটা দিব্য শক্তি, রাষ্ট্র সম্পত্তিতে ব্যক্তিগত মালিকানা রক্ষা করে। যেদিন থেকে সমাজে শ্রেণী জন্ম নিয়েছে সেদিন থেকেই রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। আর সেই রাষ্ট্র ধন কুবেরদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে কাজ করেছে এবং দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর আঘাত হেনেছে। সেই প্রক্রিয়া আজও চলছে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে। আমাদের ভারতবর্ষেও সেই একই প্রক্রিয়া কাজ করছে। সামন্তযুগে রাজপুরুষদের সম্পর্কে মতবাদ দাঁড় করানো হল -- দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনের জন্য রাষ্ট্রের প্রয়োজন। আর সেই রাষ্ট্রের কর্ণধার রূপে স্বয়ং ভগবানের প্রেরিত

প্রতিনিধি হলেন রাজপুরুষগণ।

মার্কসবাদের উপর ভিত্তি করে লেনিনই সর্বপ্রথম তাঁর 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে উপরোক্ত মতবাদসমূহ খন্ডন করে রাষ্ট্র সম্পর্কে নতুন বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী ধারণা দেন। 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' গ্রন্থে এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। বলা হল, রাষ্ট্র হল একটি শ্রেণীর উপর অন্য একটি শ্রেণীর আধিপত্য বজায় রাখার যন্ত্র। যতদিন সমাজে শ্রেণী ছিলনা ততদিন রাষ্ট্রও ছিল না। যখন পুঁজির উদ্ভব হল তখনই শ্রেণীর উদ্ভব হলো। সেই শ্রেণী বিভাগ যতই কায়েম হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্র শাসক একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান দেখা দিল। এই রাষ্ট্রই সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের উপর বল প্রয়োগের স্থায়ী যন্ত্ররূপে দেখা দিল। রাষ্ট্র হল স্থায়ীভাবে বলপ্রয়োগের বিশেষ যন্ত্র, অত্যাচারের যন্ত্র। রাষ্ট্রের হাতে রইল সশস্ত্র সৈন্য বাহিনী। এগুলি হলো বলপূর্বক অন্যদের আয়ত্তে আনা রাষ্ট্রীয় যন্ত্র। এসবই হলো রাষ্ট্রের আসল সত্ত্বা। তাই রাষ্ট্র শ্রেণী নিরপেক্ষ নয়, সমগ্র জনগণের কল্যাণও সাধন করতে পারে না। একটা শ্রেণীর হয়ে কাজ করে মাত্র 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' এর তত্ত্বের নির্ভুল ব্যাখা করে গেছেন কমরেড লেনিন। কমরেড লেনিন হলেন, স্বাধীন এবং প্রগতির মূর্ত প্রতীক, শোষণ ও ঔপনিবেশিক করাল থেকে মুক্তির প্রতীক।

'রাষ্ট্ ও বিপ্লব' গ্রন্থে যা বলা হয়েছে তার সাথে ভারতের অবস্থা মিলিয়ে দেখুন। দেখবেন হুবহু মিলে গেছে। এখন কি চলছে ভারতবর্ষে? পুঁজিপতি শ্রেণী ভারতের রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে রেখেছেন। পুঁজিবাদী অর্থনীতি গড়ে তুলছেন। শ্রমিক, কৃষক ও মধ্যবিত্ত অংশের জীবনযাত্রা শোচনীয় করে তুলেছেন। যেহেতু রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তাদের দখলে, তারা বল প্রয়োগ করেছেন বা করছেন শ্রমিক, কৃষক মেহনতী মানুষের উপর। জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই বল প্রয়োগ করে বুর্জোয়ারা পুঁজিবাদ গড়ে তুলেছেন এবং তুলছেন। সংসদীয় গণতন্ত্রের মাধ্যমেই হউক কিংবা অন্য যেকোন মাধ্যমেই বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রীয় যন্ত্র দখল করুক না কেন, জনগণের উপর জুলুম চালাবার যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহৃত হবে তদের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র। ভারতে তাই হচ্ছে। যেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হাতে ফিরে পেলেন আমরা দেখলাম যে তিনি বলপূর্বক জনতা দলের নির্বাচিত সরকারগুলি ভেঙ্গে দিলেন। রাষ্ট্রীয় শক্তির অপব্যবহার করলেন। এখন কেবল, পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারগুলি ভাঙবার লক্ষ্য সামনে রেখে তিনি দিল্লী কলকাঠি নাড়ছেন।

ভারতে বহু ভাষাভাষী জাতিগোষ্ঠী আছে। এর মধ্যে উপজাতিরাই সবচেয়ে অনগ্রসর। তাদের নিজস্ব জাতীয় বৈশিষ্ট্য ভাষা ও সংস্কৃতি রয়েছে। একটা পৃথক জাতিসত্তা রয়েছে। ভারতের বুর্জোয়া শাসকশ্রেণী উপজাতিদের ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের, তাদের

অগ্রসর করে নেবার কোন কাজই করে নাই। বরং তাদের উপর বলপূর্বক প্রভুত্ব কায়েম করার জন্য তাদের ভাষা, কৃষ্টি, আঞ্চলিক অখন্ডতাও বিলীন করে দেবার চেষ্টা করছেন। তাই ত্রিপুরার উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের সামান্য দাবীটুকু মেনে নিতে বুর্জোয়াদের পক্ষে কষ্ট হচ্ছে। তার বিরোধিতায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠছেন।

ভারতের রাষ্ট্রীয় যন্ত্র ব্যবহৃত হচ্ছে দেশের পুঁজিপতি, কালোবাজারী, মুনাফাখোর ও বড় বড় জোতদারদের স্বার্থে। রাষ্ট্রযন্ত্র যে নিরপেক্ষ নয় এইগুলো হল তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই এই রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করে শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থে পরিচালনা করা অর্থাৎ পুঁজিবাদী সমজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধন করে সমাজতন্ত্র কায়েম করার সংগ্রামই সকল দেশের মেহনতী মানুষের মূল কাজ।এছাড়া তাঁরা শোষণের হাত থেকে মুক্তি পাবেন না।

একথা পরিষ্কার যে রাষ্ট্র যে শ্রেণীর দখলে থাকবে সেই শ্রেণীর রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। দেশের সাধারণ মানুষকে বিশেষ করে শ্রমজীবী মানুষকে এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে।

লেনিন বলেছেন, যখন শ্রমিকদের উপর বুর্জোয়াদের প্রভাব দুর্বল হয়ে পড়ে সেই সময় তারা (বুর্জোয়ারা) সর্বত্র এবং সর্বদা নানা ধরনের মিথ্যা কুৎসার আশ্রয় নেয়। পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা এবং ত্রিপুরা সম্পর্কে বুর্জোয়াদের আচরণই তার প্রমাণ। এই তিনটি রজ্যের সরকারগুলি সীমিত ক্ষমতা এবং সীমিত সম্বল নিয়ে এবং নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও যেভাবে সাধারণ মানুষের স্বার্থে কাজ করে চলেছে তাতেই বুর্জোয়ারা শঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। এই তিনটি সরকারের জনহিতকর কাজকর্মের প্রভাব ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলিতে পড়তে বাধ্য। ফলে বুর্জোয়াদের পক্ষে আর দেশের শ্রমজীবী জনগণকে বেশীদিন ধরে রাখা সম্ভব হবে না। তাই চীৎকার শুরু করেছেন - এই তিন রাজ্যে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে। আইন ও শৃঙ্খলা, জাতীয় ঐতিহ্য সবশেষ করে দিচ্ছে মার্কসবাদীরা। স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীই এই কুৎসা প্রচারে অংশ নিয়েছেন। তাঁর দলের সংসদ সদস্য, আইনজীবীদের বৈঠকে তাঁর উক্তিই তাঁর প্রমাণ। এই ত্রিপুরায় বুর্জোয়াদের দল কংগ্রেস (ই) বামফ্রন্ট সরকার এবং মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে নানা মিথ্যা ও কুৎসা প্রচার করেছেন। তাদের এই কুৎসা ও মিথ্যা প্রচার তুঙ্গে উঠেছিল গত জুনের দাঙ্গার সময়ে। দাঙ্গার সময় সত্য মিথ্যা সব মিলিয়ে এমন কত আজগুবি গল্প তৈরী করে কত মিথ্যা কাহিনী ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তাদের কাগজগুলিতে প্রকাশ করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে জনগণকে বিভ্রান্ত করার জঘন্য কৌশল নিয়েছিলেন তারা তা বলা বাহুল্য। লেনিনের এই উক্তি যে

কত সার্বিক তা হাতে হাতে প্রমাণিত।

তাই বুর্জোয়াদের অপপ্রচারগুলি খন্ডন করে সার্বিক তথ্য জনগণের নিকট তুলে ধরা এবং বুর্জোয়া মতবাদের প্রভাব থেকে মুক্ত করে দেশের শ্রমজীবী জনগণকে শোষণহীন সমাজব্যবস্থা গঠনের সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধ করতে হবে মার্কসবাদীদের। এটাই লেনিনের শিক্ষা।

"যুদ্ধমান দেশগুলির উচ্চ শ্রেণীগুলি যেমন বড় যুদ্ধবাজ তেমনি আবার সেই সব দেশের মেহনতী শ্রেণীগুলি সৎ এবং শান্তিপ্রিয়।" কমরেড লেনিনের ঐ উক্তি কত সত্য তা সাম্রাজ্যবাদীদের আচরণ থেকেই বুঝা যায়। কিন্তু শ্রমিকশ্রেণী অন্যের রাজ্য দখলে আগ্রহী হতে পারেন না, প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের ফাঁদে পা দিতে পারেন না। দিলে নিজেদেরই ক্ষতি হবে। শোষণের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রাম দুর্বল হয়ে পড়বে। কমরেড লেনিন শ্রমিকশ্রেণীর আন্তর্জাকিতাবাদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে গেছেন। কাজেই মার্কসবাদ লেনিনবাদ জানা সকলেরই প্রয়োজন।

(ডেইলী দেশের কথা, ২য় বর্ষ, ২০৫ সংখ্যা, ২২ এপ্রিল ১৯৮১ইং)

স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হলে জাতি-উপজাতি ঐক্য আরো সুদৃঢ় হবে

(ত্রিপুরা স্বশাসিত উপজাতি জেলা পরিষদ গঠন সম্পর্কে ডেইলি দেশের কথার সংবাদ দাতার সঙ্গে উপজাতি কল্যাণমন্ত্রী দশরথ দেবের সাক্ষাৎকারের বিবরণ ।)

প্রশ্ন ঃ উপজাতি যুব সমিতি পক্ষে থেকে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাথে সহযোগিতার প্রস্তাব পাঠনো হয়েছে, সে সম্পর্কে আপনার মতামত কি ?

জবাব ঃ কাগজে অনেক কথাই প্রকাশিত হয়। উপজাতি যুব সমিতি এই ধরনের কোন প্রস্তাব পাঠিয়েছে বলে আমার জানা নাই। উপজাতি যুব সমিতি কি ধরনের সহযোগিতা চান তা না জেনে এই প্রশ্নের জবাব দেয়া ঠিক হবে না। তারা যদি স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের অনুকূলে বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চান, আরও সহজভাবে বলতে গেলে তারা যদি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের জন্য রাজ্যের সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে বামফ্রন্টের সহযোগিতা চান, তাহলে আমরা সেই প্রস্তাবকে অবশ্যই স্বাগত জানাবো। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে আমরা সকল দলের সহযোগিতা চাই। উপজাতি যুব সমিতির সহযোগিতাও চাই। তবে যারা আজ তাদের কথায় আত্মগোপন করে বাংলাদেশে গিয়ে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে ত্রিপুরায় এসে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালাচ্ছেন, বাংলদেশ সীমান্তে বসবাসকারী ত্রিপুরার উপজাতিদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে টাকা পয়সা আদায় করছেন, টাকা না দিলে 'জামাই উঠতে হবে' অর্থাৎ শশ্মানে যেতে হবে বলে ভীতি প্রদর্শন করছেন। তাদের এই ধরনের কাজকর্ম থেকে বিরত করে শান্তিপূর্ণ বাতাবরণ সৃষ্টি করাই হবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে উপজাতি যুব সমিতির অন্যতম প্রধান কাজ, আর এ কাজ না করে যদি কেবল সহযোগিতার কথা তারা বলেন, তবে তা হবে শুধু কথার কথা। যদি তারা নির্বাচনে বামফ্রন্টের সাথে সমঝোতা চান তাহলে বলবো এখন পর্যন্ত তার বাস্তব সম্ভাবনা দেখি না। বামফ্রন্ট ত্রিপুরায় জাতি ও উপজাতি শোষিত মানুষের ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের মাধ্যমে ভারতের জাতীয় সংহতি সুদৃঢ় করতে চান — ত্রিপুরায় উপজাতি ও বাঙ্গালী জনগণের ঐক্য গড়তে চান। আর উপজাতি যুব সমিতির নেতারা জন্মলগ্ন থেকেই চরম সাম্প্রদায়িকতাকে পুঁজি করে রাজনীতির আসরে নেমেছেন। উপজাতি তরুণ-তুরুণীদের মধ্যে চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার করে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদের

পঙ্কে ডুবিয়ে রাখতে মরিয়া হয়ে কাজ করছেন। তারা উপজাতি ও অ-উপজাতি মানুষের ঐক্য চান না — চান তাদের মধ্যে অনৈক্য ও হানাহানি। এই দূষিত নীতির ধারক ও বাহক যারা তারা যদি তাদের সেই নীতি না পাল্টায় তা হলে তাদের সাথে বামফ্রন্টের নির্বাচনী সমঝোতার সুযোগ কোথায়?

প্রশ্ন ঃ উপজাতি যুব সমিতির নেতারা বলে থাকেন যে তাদের আন্দোলনের চাপেই বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন পাশ করতে বাধ্য হয়েছেন এবং বামফ্রন্ট সরকার চান না যে, এখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হোক এ সম্পর্কে আপনি কি বলবেন?

জবাব ঃ প্রথমত ঃ উপজাতি যুব সমিতির চাপে বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ আইন পাশ করেছেন এই বক্তব্য যেমন ঠিক নয়, তেমনি বামফ্রন্ট এই নির্বাচন চান না এই বক্তব্যও ঠিক নয়। একথা ত্রিপুরার কে না জানে যে, বামফ্রন্টের শরিক মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিই ত্রিপুরার অনগ্রসর উপজাতিদের বিভিন্ন দাবী নিয়ে সংগ্রাম শুরু করেন — উপজাতি জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন, ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি শ্রমজীবি জনগণের সংগ্রামী ঐক্যের শক্ত বুনিয়াদ গড়ে তুলেন। এই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ত্রিপুরায় উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন অর্থাৎ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদের দাবীতে প্রথম আন্দোলন শুরু করেন ১৯৫৪ সাল থেকে। ১৯৬০ সালে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এই দাবী করে উপজাতিদের সমস্যাবলী অনুসন্ধান করা এবং তার প্রতিকারের সুপারিশ করার জন্য ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত ধেবর কমিশনের কাছে স্মারক লিপি দাখিল করে। ১৯৬০ সাল থেকে এই দাবীতে ত্রিপুরায় অসংখ্য জনসমাবেশ ও মিছিল করা হয়। মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি ও উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের ডাকে — বামফ্রন্টের কর্মসূচীর মধ্যে অর্থাৎ নির্বাচনী ইস্তাহারেও এই দাবী বিশেষ গুরুত্ব পায়। কাজেই বামফ্রন্ট সরকারে আসার পর নিজ কর্মসূচী রূপায়ণের জন্যই অত্যন্ত সুচিন্তিত ও পরিকল্পিতভাবেই এই স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ আইন পাশ করেছেন। উপজাতি যুব সমিতির আন্দোলনের সাথে বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক এই আইন পাশের কোন সম্পর্ক নাই। উপজাতি যুব সমিতি যদি আদৌ জন্ম লাভ না করতো তা হলেও বামফ্রন্ট সরকার এই আইন পাশ করতেন। কারণ এই আইন পাশ করা এবং নির্বাচনের মাধ্যমে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা বামফ্রন্ট সরকার অন্যতম জরুরী ও অবশ্য করণীয় কর্তব্য বলে মনে করেন। মাতা-পিতা কারো ভয়ে বা হুমকিতে আপন সন্তানদের লালন পালন করেন না। আপন দায়িত্ব

বোধেই তা করে থাকেন। কাজেই উপজাতি যুব সমিতির ঐ দাবী উপজাতি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার তাদের একটি স্থূল রাজনৈতিক কৌশল মাত্র। তাতে উপজাতি জনগণ আর বিভ্রান্ত হবেন না।

উপজাতি যুব সমিতির নেতারা যে ইন্দিরা কংগ্রেসের সাথে আরও কাছাকাছি হবার জন্য দৌড় ঝাপ করছেন, দিল্লীর দরজায় ধর্ণা দিচ্ছেন — সেই কংগ্রেস (ই) নেতারাই মানুষকে মিষ্টি কথা বলে ভাওতা দিয়ে থাকেন। উপজাতি যুব সমিতির নেতারা তাদের সাথে লোকোচুরি খেলা খেলতে পারেন, তারা ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের ভবিষ্যৎ নিয়ে বিপজ্জনক খেলা খেলতে পারেন, কিন্তু বামফ্রন্ট তা করেন না, করতে পারেন না। বামফ্রন্ট যে কথা বলে তা গুরুত্বসহকারেই বলে এবং তার রূপায়ণে আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার সাথে অগ্রসর হয়। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচন বামফ্রন্ট অবশ্যই করতে চান এবং তার জন্য উপজাতি যুব সমিতিসহ সকল রাজনৈতিক দল ও সকল অংশের সহযোগিতা কামনা করেন।

প্রশ্ন ঃ একথা কি ঠিক যে, দাঙ্গার পরবর্তী সময়ে অনেক সি পি আই (এম) ও বামফ্রন্ট সমর্থক উপজাতি যুব সমিতিতে যোগদান করেছেন এবং তার জন্যই বামফ্রন্ট সরকার পরিষদ নির্বাচন চান না?

জবাব ঃ একথা আদৌ ঠিক নয়, মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির গণসংগঠন উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ পূর্বাপেক্ষা আরও বেশী শক্তিশালী হয়েছে। উপজাতি জনগণ, আরও বেশী সংখ্যায় এই সংগঠনে যোগদান করেছেন এবং করছেন। দাঙ্গার পূর্বে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের সভ্য সংখ্যা ছিল কুড়ি হাজার পরিবার। দাঙ্গার পর সভ্যপদ নবীকরণ করা হয়। ১৯৮১ সালের ১৪ জুন পর্যন্ত সেই সভ্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ন্যূনধিক ৩২ হাজার পরিবার। কাজেই অনেক সি পি আই (এম) কর্মী ও সমর্থক দল ছেড়ে উপজাতি যুব সমিতিতে যোগদান করেছেন এই দাবী আদৌ ঠিক নয়। বরং উপজাতি যুব সমিতির অনেক কর্মী ও সমর্থক তাদের দল ছেড়ে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদে যোগদান করেছেন। বামফ্রন্টের সমর্থক হিসাবে কাজ করতে এগিয়ে এসেছেন এবং আসছেন। চরম সাম্প্রদায়িক সংগঠন উপজাতি যুব সমিতি এবং আমরা বাঙ্গালী দল দাঙ্গার পর তাদের সমর্থকদের এক বড় অংশকেই ধরে রাখতে পারছেন না — এই চিত্র ত্রিপুরার যেকোন চোখ কান ওয়ালা মানুষের দৃষ্টি এড়াতে পারবে না।

প্রশ্ন ঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হলে উপজাতি স্বার্থ কিভাবে রক্ষিত হবে।

জবাব ঃ কেবল মাত্র স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠনের দ্বারাই উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণ সধিত হবে না বা উপজাতি স্বার্থ পুরোপুরি রক্ষিত হবে না। ত্রিপুরা তথা ভারতের শোষিত বঞ্চিত অংশের মানুষ/ জনগণের সার্বিক উন্নতির মধ্যেই নিহিত আছে উপজাতিদের সার্বিক উন্নতি ও স্বার্থ রক্ষা। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে গঠিত সরকার ছাড়া অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা ছাড়া শোষিত নিপীড়িত অংশের জনগণের সার্বিক কল্যাণ সাধন করা যায় না। আবার উপজাতিদের এটাও মনে রাখতে হবে যে কেবল উপজাতি এলাকার সম্পদ দিয়েই উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। ভারত এবং ত্রিপুরার অন্যান্য এলাকার সম্পদের সাহায্যই এই উপজাতি এলাকার সার্বিক উন্নতি সাধন করা সম্ভব। এর জন্যই চাই জাতীয় ঐক্য, জাতীয় সংহতি ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এই প্রক্রিয়াকে উন্নত করেই উপজাতি স্বার্থ রক্ষা করতে হবে।

তবে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি এলাকার উন্নতি সাধনের অন্যতম ফলদায়ক এজেন্সী হিসাবে কাজ করবে। ত্রিপুরা সরকারকে এই পরিষদ সেই কাজেই সাহায্য করতে পারবে। জমির উন্নয়ন করতে পারবে, উপজাতিদের শিক্ষা, ভাষা, ও সংস্কৃতি বিকাশের দিকে নজর দিতে পারবে। এক কথায় ভারতের অগ্রগতির সাথে তাল রেখে ত্রিপুরার উপজাতিদের উন্নতি বিধানের নানাবিধ কাজে হাত দিতে পারবে। উপজাতি এলাকার উন্নতির অর্থ - ত্রিপুরার উন্নতি। বর্তমানে উপজাতি এলাকার উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা রচনা ও রূপায়ণের ক্ষেত্রে উপজাতিদের অংশগ্রহণের সুযোগ নাই বা সীমিত। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ সেই অভাব অনেকটা পূরণ করবে।

প্রশ্ন ঃ স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সেখানকার সংখ্যালঘু অ-উপজাতি জনগণের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না একথা আপনি বলতে পারেন কি?

জবাব ঃ আমরা যদি ভারতের সংবিধান মানি তা হলে নিশ্চয়ই বলতে পারি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সংখ্যালঘু অ-উপজাতির স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে না। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ পৃথক রাজ্য নয়। রাজ্য সরকারই আইন কানুন প্রণয়নের মালিক। রাজ্য সরকার যে আইন করবেন শুধু সেগুলিই কার্যকরী করবে স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ। স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ যদি উপজাতি স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন আইন করতে চান তার জন্যও পরিষদকে রাজ্য সরকারের কাছেই আসতে হবে। এই রাজ্যের বিধানসভায় তথা সরকারের মধ্যে অ-উপজাতিদের সংখ্যালঘু হবার

কোন আশঙ্কা আছে কি? যদি না থাকে তা হলে এই প্রশ্ন উঠবে কেন? অ-উপজাতিরাই সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবেন আর সেই সংখ্যাগরিষ্ঠ উপজাতিদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করবেন সেই সরকার এধরনের উদ্ভট চিন্তা আসে কোথা থেকে? রাজ্য সরকারের আইন কানুন ও নীতিকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখিয়ে চলার মত ক্ষমতা কি স্ব-শাসিত জেলা পরিষদে দেয়া হয়েছে? — না, আইনে সেই ক্ষমতা দেওয়া হয় নাই।

একথা ভুললে চলবে না যে —স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সংখ্যালঘুদের স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব যেমন স্বশাসিত জেলা পরিষদের, তেমনি রাজ্য সরকারেরও। তাই বলতে পারি, রাজ্য সরকার নপুংসক না হলে বা রাজ্য সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদের এলাকার সংখ্যালঘু অ-উপজাতির প্রতি বিরূপ বা উদাসীন না হলে তথায় তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবার কোন আশঙ্কা নাই। তবে এটা অবশ্য অ-উপজাতি সাধারণ মানুষের কথা বলছি। কিন্তু সংখ্যালঘু এই অজুহাত অউপজাতির বিত্তবান শ্রেণীর লোকদের উপজাতিদের জমি গ্রাস করা, তাদের উপর নির্মম শোষণ চালানোর অধিকার দেওয়া হবে না। এটাকে অ-উপজাতি সংখ্যালঘুর স্বার্থরূপে না দেখে এই বিষয়কে দেখতে হবে শোষক শ্রেণীর কায়েমী স্বার্থ হিসাবে। এই শ্রেণীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধভাবে লড়াই হবে উপজাতি ও অ-উপজাতি এই উভয় শ্রেণীর শোষিত মানুষদেরই।

প্রশ্ন : স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠিত হলে উপজাতি বাঙ্গালী সম্প্রীতি ও ঐক্য সুদৃঢ় হবে একথা মনে করার যুক্তি আছে কি?

জবাব : হ্যাঁ, আছে। একে অপরের গণতান্ত্রিক অধিকার স্বীকৃতির মধ্য দিয়েই, একে অন্যকে মানবিক মর্যাদা দেবার মধ্য দিয়ে এই উভয়ের মধ্যে এই সম্প্রীতি ও ঐক্য গড়ে উঠে। একে অন্যকে সহযোগিতার হাত বাড়ায়। উপজাতি এলাকা অবহেলিত। উন্নতির যতটা পদক্ষেপ নেওয়া দরকার তার কনামাত্রও করা হয়নি স্বাধীনত্তোর যুগে। তার ভাষা, সংস্কৃতি ও আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও দারুণভাবে উপেক্ষিত হয়ে আছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ সেই কাজেও হাত দিতে পারবে। বর্তমানে বিচ্ছিন্নতাবাদী দায়িত্বহীনভাবে গোটা বাঙ্গালী জাতির বিরুদ্ধে যেসব বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে উপজাতিদের একাংশকে বিভ্রান্ত করতে পারছেন স্বশাসিত জেলা পরিষদের কাজকর্ম শুরু হলে তাদের সেই দাঁত অনেক পরিমাণে ভোঁতা হয়ে পড়বে। অভিজ্ঞতার আলোকে উপজাতিদের এক বিরাট অংশ

উপলব্ধি করতে পারবেন যে, সবদিকে অগ্রসর বাঙ্গালীদের সহযোগিতা ছাড়া ত্রিপুরার উপজাতি এলাকার উন্নয়ন সাধন করে উপজাতি স্বার্থ রক্ষা করা সম্ভব নয়। তখন তারা বাঙ্গালীদের সহযোগিতা ও বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তা স্বভাবতই অনুভব করতে পারবেন। আর স্বশাসিত জেলা পরিষদকে যেভাবে বাঙ্গলী স্বার্থ বিরোধী বলে চিত্রিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে, বাঙ্গালীদের সর্বনাশ হয়ে যাবে বলে বলা হচ্ছে তা আদৌ ঠিক নয়। পাশের বন্ধুর মজবুত ঘর বিপদ নয় এবং একসময় আমার আশ্রয়স্থল হতে পারে এই মানসিকতাই গড়ে উঠবে। তাই বলি স্বশাসিত জেলা পরিষদ উপজাতি বাঙ্গালীদের আরও নিকটতম বন্ধুরূপে কাছাকাছি টানতে সাহায্য করবে। বরং স্বশাসিত জেলা পরিষদ না হলেই এই দুই অংশের জনগোষ্ঠীর দূরত্ব বাড়াতে সাহায্য করবে।

(ডেইলী দেশের কথা, দ্বিতীয় বর্ষ ২৯৮ সংখ্যা ১১ই আগস্ট, ১৯৮১ ইং)

উপজাতি যুব সমিতি কোন পথে?

উপজাতি যুব সমিতির আসল রাজনীতি কমিউনিস্ট বিরোধিতা, প্রগতিশীলতার বিরোধিতা। যুব সমিতির জন্মলগ্ন থেকে আজ পর্যন্ত তাদের কর্মকান্ড তাই প্রমাণ করে।

১৯৬৭ সালে উপজাতি যুব সমিতি জন্মক্ষণে একটি অরাজনৈতিক উপজাতি সমাজ সংস্কারক এর মুখোশ পরিধান করে। প্রচার করে এই সমিতি কোনও ইজমের মধ্যে নেই। কংগ্রেস ও নয়, কমিউনিস্ট নয়। ত্রিপুরার উপজাতিদের কল্যাণ সাধনই এই সমিতির একমাত্র লক্ষ্য। কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট মতাবলম্বী উপজাতিদের ঐক্যবদ্ধ করে উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণে যুব সমিতি এগিয়ে যাবে।

যুব সমিতি ভূমিষ্ঠ হবার কয়েক মাসের মধ্যেই কি দেখা গেল? দেখা গেল কংগ্রেসের সাথে সহযোগিতা করতে এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে যুব সমিতিব নেতাদের কোমর বেঁধে লাগতে। যারা এক সময় দুর্নীতির দায়ে, জনবিরোধী অপকর্মের অপরাধে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হয়ে কংগ্রেসের খাতায় নাম লিখিয়েছেন সেই উপজাতি ব্যক্তিদের সাথেই উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের সখ্যতা গড়ে উঠে। তাদের সাথে ঐক্যবদ্ধ হয়ে উপজাতি গণমুক্তি পবিষদের সংগঠনের উপর আঘাত হানতে প্রয়াস পায়। এতেই প্রমাণ কবে যে, উপজাতি যুব সমিতি কোন গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল দলগুলির সাথে সম্পর্কে বাখতে চায় না।

যখন উপজাতি যুব সমিতির নেতাদের সাথে কংগ্রেস নেতাদের আঁতাত গড়ে উঠেছিল তখন ত্রিপুরা রাজ্যের উপজাতিদের উপর কংগ্রেস নেতাদের এবং কংগ্রেস সরকারের কি আচরণ ছিল? সেই সময়েই উপজাতিদের জমি অউপজাতি ভূমি আগ্রাসীদের হাতে বেআইনীবাবে বেশী করে হস্তান্তরিত হচ্ছিল। উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত ভূমি কার্যত নষ্ট করে দেওয়া হচ্ছিল। এই প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ এবং মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টি সোচ্চার ছিলেন। উপজাতি যুব সমিতি এই প্রতিবাদ আন্দোলনে সামিল না হয়ে বরং এই প্রতিবাদ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছিল যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ, যুব সমিতি কংগ্রেসের সহযোগিতায় সেই মুক্তি পরিষদের উপরই আক্রমণ হানছিলেন। কাজেই এ বিষয়ে আর কোন দ্বিধা নেই যে উপজাতি যুব সমিতি আসলে ত্রিপুরার উপজাতির কল্যাণ চায় না।

১৯৭৪ সালে আর একটি মুহূর্ত যখন উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার প্রশ্ন সবচেয়ে জরুরীরূপে দেখা দেয়। এবং এই অধিকার রক্ষার জন্য ত্রিপুরার জাতি

উপজাতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বাধিক প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তখন উপজাতি যুব সমিতির ভূমিকা ছিল বিভেদ সৃষ্টি করে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর আঘাত করা।

ঘটানাটি কি? ১৯৭৪ সালে ইন্দিরা গান্ধী কংগ্রেসের সেনগুপ্ত মন্ত্রিসভা ভূমি ব্যবস্থায় উপজাতিদের সংরক্ষিত অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ করে। বিকল্প ব্যবস্থা না রেখেই উপজাতি রিজার্ভ ভেঙ্গে দেয়। এবং ১৯৬০ সালের ভূমি সংস্কার আইন সংশোধন করে উপজাতিদের বেআইনী হস্তান্তরিত জমি ফেরত পাবার পথ সঙ্কুচিত করে দেয়। ভূমি ব্যবস্থায় উপজাতিদের নিরাপত্তা দান এবং উপজাতি অধ্যুষিত এলাকা সংরক্ষণসহ চার দফা দাবীতে গণমুক্তি পরিষদ আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই আক্রমণের প্রতিবাদে ঐক্যবদ্ধ বলিষ্ঠ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য উপজাতি যুব সমিতিসহ সকল অংশকে সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানায় উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ। প্রথমে যুব সমিতি ও যুব সমিতির সহযোগী গণসংগঠন গুলি এই আহ্বান সাড়া দেন। যুক্ত সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয়। কিন্তু একধাপ আন্দোলন করার পরই উপজাতি যুব সমিতি এবং যুব সমিতির সহযোগী গণসংগঠনগুলি এই যুক্ত সংগ্রাম কমিটি থেকে সরে যায়। তাঁদের এই সরে যাবা যুক্তি ছিল সাম্প্রদায়িক ও বিদ্বেষমূলক। তাদের দাবী ছিল উপজাতিদের এই চার দফা দাবীর সমর্থনে বাঙ্গালীরা মিছিলে যোগদান করতে পারবেন না। এই আন্দোলন হবে বিশুদ্ধ ট্রাইবেলদের আন্দোলন। তার অর্থ এই আন্দোলনে কেবলমাত্র ট্রাইবেলরাই যোগদান করতে পারবেন। গণমুক্তি পরিষদ তাদের এই সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গীর সাথে একমত না হওয়াতে উপজাতি যুব সমিতি সদল বলে যুক্ত সংগ্রাম কমিটি ত্যাগ করে।

এই চার দফা দাবীতে ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি জনগণের এক ঐতিহাসিক বিধানসভা অভিযান হয়েছিল ১৯৭৪ সালে। একথা ভুলেলে চলবে না যে এই বিধানসভা অভিযান বানচাল করার জন্য কংগ্রেসীদের সাহায্যে উপজাতি যুব সমিতি স্থানে স্থানে গণমুক্তি পরিষদের প্রস্তুতির জনসভা মিছিলের উপর আক্রমণ সংগঠিত করেছিল।

জরুরী অবস্থার সময় (১৯৭৫ থেকে১৯৭৭) উপজাতি যুব সমিতির ভূমিকা খুবই জঘন্য। তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের প্রতিটি জনস্বার্থ বিরোধী কাজকর্মের সমর্থন করেছিলেন। অচাই সম্মেলন করে যুব সমিতির নেতারা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন একমাত্র তাঁরাই উপজাতিদের প্রাচীন ঐতিহ্যের রক্ষক। মন্ত্র ও উজাইগিরি প্রাচীন ঐতিহ্যের অঙ্গ সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু কোনটিকে বাঁচিয়ে রাখতে হবে , আর কোনটিকে বর্জন করতে হবে সেই দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে প্রচার করা দরকার। আমরা কি রোগ

নিরাময়ের জন্য আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের সুযোগ গ্রহণ করতে জনগণকে উৎসাহিত করবো না রোগ নিরাময়ের জন্য মন্ত্র, জলপড়া ও দেবদেবীর উদ্দেশ্যে হাঁস, মোরগ ও পাঁঠা বলি দিতে জনগণকে উৎসাহিত করবো ? সুষ্ঠু সংস্কৃতি গড়ে তোলার পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। দেখা যায় যে — অচাই সম্মেলনের মধ্য দিয়ে যুব সমিতি শেষেরটিকে উৎসাহিত করছে। সংস্কারকে আঁকড়ে থাকতে উৎসাহিত করার অর্থই হল — বিজ্ঞান সম্মত দৃষ্টিকোণ তেকে জনগণকে দূরে রাখা, রক্ষণশীল ভাবধারাকে চাঙ্গা করে প্রগতিকে বাঁধা দেয়।

যুব সমিতি অচাই সম্মেলন করে অচাইদের একত্রিত করে তাদের মাধ্যমে উপজাতি জনগণকে বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেস নেতা তড়িৎমোহন দাশগুপ্ত পৌরহিত্য করেছিলেন মহারাণী তুলসীবতী বালিকা বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত এই অচাই সম্মেলনে। সমাজের একটি অংশের মানুষের মধ্যে সাধু, সন্ত, মোল্লা ও অচাইদের একটা প্রভাব আছে। সেই প্রভাবটাকে দলীয় রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার জন্য কংগ্রেস (ই) নেতারা বিশেষ করে শ্রীমতী গান্ধী যে কায়দা গ্রহণ করেন ঠিক সেই কায়দাই উপজাতি যুব সমিতির নেতারা অনুসরণ করেছিলেন। জনগণকে ধোঁকা দেবার কৌশল হিসাবে প্রতিক্রিয়াশীল রাজনৈতিক ধুরন্ধররা এই ধরনের পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করেন না। এই পদক্ষেপ নিশ্চিতভাবে রক্ষণশীল, প্রতিক্রিয়াশীল এবং উপজাতি সমাজকে পেছনে টেনে রাখার অপপ্রয়াস।

১৯৮০ সালের জুন মাসে যুব সমিতি কি করল? ১৯৮০ সালের জুন মাসে যখন ত্রিপুরার উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিল, ত্রিপুরায় উপজাতি ও অউপজাতি গণতান্ত্রিক মানুষ এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনের সমর্থনে এ গিয়ে আসছিলেন তখন দেখা গেল "বিদেশী বিতাড়ণের" আওয়াজ তুলে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ত্রিপুরার রাজনীতিকে ঘোলাটে করে তুললেন। এক মারাত্মক আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন। এভাবে উপজাতি ও অ-উপজাতির প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্প্রদায়িক অংশের হাতে এক মারাত্মক অস্ত্র তুলে দিলেন। এরই পরিণতিতে জুনের ভয়াবহ দাঙ্গা। যার ফলে উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচন বাতিল হয়ে গেল। তাদের এই কার্য কলাপ আসলে যে উপজাতিদের স্বার্থের বিরুদ্ধেই গেছে তাতে আজ আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

বামফ্রন্ট সরকার স্বশাসিত জেলা পরিষদ সহ উপজাতিদের চার দফা দাবী সমূহ রূপায়ণে ব্রতী রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদই এই ৪ দফা দাবীর

প্রণেতা। আর ঐ দাবীগুলি আদায়ের আন্দোলনে সবচাইতে সক্রিয় ও সোচ্চার।

দাঙ্গার পর দেখা গেল যে — কংগ্রেস (ই) নেতাদের সাথে এক সুরে উপজাতি যুব সমিতি আওয়াজ তুললো বামফ্রন্ট সরকারের পতন চাই — রাষ্ট্রপতি শাসন চাই। বামফ্রন্ট সরকারের পতম ঘটলে ত্রিপুরায় শাসন চালু হলে উপজাতি যুব সমিতির অগণতান্ত্রিক কাজকর্মের সুবিধা হতে পারে কিন্তু ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের, সাধারণ উপজাতিদের বিপদ বাড়বে। তাদের শোষণ ও নির্যাতন বাড়বে। তাদের উপর আক্রমণ বাড়বে। বামফ্রন্ট সরকার গঠিত হবার পর ত্রিপুরার উপজাতিদের বিভিন্ন সমস্যা যেভাবে মোকাবেলা করা হচ্ছে, বিভিন্ন দিক থেকে সাধ্যানুযায়ী যেভাবে উপজাতিদের সুযোগ সুবিধা দেওয়া হচ্ছে , তা আবার বন্ধ হয়ে যাবে। উপজাতি যুব সমিতির রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী বামফ্রন্ট সরকার বাতিলের দাবি কার্যত তাই করতে চায়।

বিধানসভার উপনির্বাচনের সামনে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা আওয়াজ তুলেছেন যারাই বামফ্রন্টের বিরুদ্ধে নির্বাচনে লড়বেন তাদের সাথেই যুব সমিতি নির্বাচনী সংগ্রামে হাত মেলাবেন। অদ্ভুত রাজনীতি। নির্বাচনী লড়াইটা তাদের কাছে উপজাতি জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, গণতন্ত্র রক্ষা ও সম্প্রসারণের জন্য নয় ত্রিপুরায় উপজাতি ও অ-উপজাতি সাধারণ মানুষের বাঁচার সংগ্রাম জোরদার করার জন্য নয় তাদের কাছে এই লড়াইটা হচ্ছে মার্ক্সবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে, বামফ্রন্টের সরকারের বিরুদ্ধে, সাধারণ মানুষের বিরুদ্ধে।

কংগ্রেসের সাথে গোপনে বা প্রকাশ্যে যে ভাবে হোক হাত মেলানোর অর্থ হলো যারা এক নাগাড়ে দীর্ঘকাল পর্যন্ত সরকারী ক্ষমতা কুক্ষিগত করে জনগণের উপর শোষণ ও নির্যাতন চালিয়েছিল ত্রিপুরায় তাদেরই ডেকে আনা।

কংগ্রেস (ই) বরাবর স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরোধিতা করে এসেছে এবং এখনো করছে। ত্রিপুরা বিধানসভায় এখন কং(ই)র একজন প্রতিনিধি নাই। স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরুদ্ধে কথা বলার মত লোক কংগ্রেস (ই) র একজন ও বিধানসভায় নাই। যুব সমিতির কংগ্রেস (ই) সাথীর দরকার। যুব সমিতির নেতারা কংগ্রেস (ই) র কাউকে বিধানসভায় এনে গণতন্ত্রবিরোধীও উপজাতি স্বার্থ বিরোধী বিশেষতঃ স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিরোধী কণ্ঠস্বর বিধানসভায় ধ্বনিত করাতে চান। এটি উপজাতি যুব সমিতির বর্তমান রাজনীতি। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপই ত্রিপুরার সাধারণ মানুষের স্বার্থের পরিপন্থী গণতন্ত্র বিরোধী, সাম্প্রদায়িকতাও বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রসূত এবং চরম প্রতিক্রিয়াশীল। যে বাংলাদেশের সেনাবাহিনী বাংলাদেশের উপজাতি অ-উপজাতি প্রতিক্রিয়াশীলদের সামনে

রেখে বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে সংখ্যালঘু উপজাতিদেব উপর অকথ্য অত্যাচাব করে, গৃহদাহ, লুণ্ঠন ও নরহত্যা সংগঠিত করে তাদের বাংলাদেশ থেকে বিতাড়িত করে ত্রিপুবায় আশ্রয় নিতে বাধ্য করছে সেই সেনাবাহিনীকেও উপজাতি যুব সমিতির নেতারা মিত্ররূপে দেখেন। তাদের কাছে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়ে সন্ত্রাসমূলক কাজকর্ম চালান। তাই ত্রিপুবার সকল অংশের প্রতিটি গণতান্ত্রিকও শান্তিকামী মানুষকে এই অশুভশক্তি সম্পর্কে সর্বদা সচেতন থাকতে হবে।

জীবন দেববর্মা।। 'সাপ্তাহিক দেশের কথা' ১৬বর্ষ, ১মসংখ্যা, ১৬অক্টোবর ১৯৮১ইং, ২৮আশ্বিন ১৩৮৮ বাংলা।।

বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি সম্পর্কে হুঁশিয়ার

ত্রিপুরা উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে স্বশাসিত জেলা পরিষদ বাস্তবায়িত হতে চলেছে আগামী ৩রা জানুয়ারী নির্বাচনের মধ্য দিয়ে। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের বহু প্রতীক্ষিত এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ। ভারতের সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল কেবলমাত্র আসাম রাজ্যে অবস্থিত উপজাতি অঞ্চলগুলিতে চালু করা যায়, অন্য কোন রাজ্যেই তা চালু করার নির্দেশ বা অধিকার সংবিধানে দেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সেই সংবিধান সংশোধন করে ত্রিপুরা সহ ভারতের অন্যান্য রাজ্যের উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করতে রাজী হন নাই। আসাম রাজ্যের যে সকল অঞ্চলে এই ৬ষ্ঠ তফসিল চালু ছিল সেই অঞ্চল গুলি আসাম রাজ্য থেকে আলগা হয়ে পৃথক রাজ্য হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। এই রাজ্যগুলি হল অরুণাচল প্রদেশ, মেঘালয়, মিজোরাম এবং নাগাল্যান্ড। এই রাজ্যগুলিতে স্বশাসিত জেলা পরিষদের কদর কমে গেছে।

পৃথক রাজ্যের মর্যাদা লাভের পরও নাগাল্যান্ড এবং মিজোরামে ভারত থেকে সকল সম্পর্ক ছিন্ন করে স্বাধীন রাজ্য রূপে আত্মপ্রকাশের প্রবণতা বেশ প্রবল রয়েছে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নাশকতামূলক কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। এই প্রবণতা এবং কার্যকলাপ রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টির পথে বড় অন্তরায় হয়ে আছে। তাই সেখানে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ভিত্তি অনেক দুর্বল। সেখানে এখনো যে রাজনীতি চলছে তা ভারতের শ্রমজীবী জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের স্রোতধারা থেকে বহুলাংশে বিচ্ছিন্ন। সেই মারাত্মক রাজনীতিই উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরায় আমদানী করছেন। এই প্রবণতা ভারতের জাতীয় সংহতির পক্ষে বিপজ্জনক। উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার পক্ষেও বিপদজনক।

লক্ষ্যণীয় বিষয় হল — ত্রিপুরায় উপজাতি জনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন রাজনীতিক পরিবেশ রচনার মধ্যে দিয়ে নিজেদের আত্মবিকাশের সুযোগ করে নেওয়ার সংগ্রাম করে চলেছে। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের আদর্শকে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাসত্বের হাত থেকে মুক্তির দিশারীরূপে গ্রহণ করে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরার উপজাতি জনগণকে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে সংগঠিত করেছেন ও করছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছে। এই স্বচ্ছ শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারা পরিচালিত গণমুক্তি পরিষদের সংগ্রাম ত্রিপুরার জাতি উপজাতি শ্রমজীবী জনগণের সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তোলার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। গণমুক্তি পরিষদের এই সংগ্রাম ত্রিপুরার মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বলিষ্ঠ নেতৃত্বে

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করেছে। জাতি উপজাতির গণতান্ত্রিক জনগণের ঐ ঐক্যের ভিত্তিতে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার গঠন করার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছে।

এটাও ঐতিহাসিক সত্য যে ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদই প্রথম উপজাতি জনগণের সামনে তুলে ধরেন যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই উপজাতি জনগণের মূল শত্রু তাদের অগ্রগতির পথের কাঁটা। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা দেশের কায়েমী স্বার্থকে রক্ষা করে। শোষণ ব্যবস্থা জীইয়ে রাখে। অনগ্রসর ও সংখ্যালঘু অংশের জনগণের অগ্রগতির সকল পথ রুদ্ধ করে রাখে। তাদের আত্ম বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করে। উপজাতি গণমুক্তি পরিষদই প্রথম ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের কাছে তুলে ধরেন যে, কোন এ কটা নির্দিষ্ট জাতি বা সম্প্রদায়ের সমগ্র জনগণ উপজাতিদের শত্রু নয়। বরং সকল জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেই উপজাতির সাধারণ মানুষের মিত্র আছেন। সেই মিত্রশক্তি খুঁজে বের করতে পারে একমাত্র গণতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীষ সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা সেই মিত্র খোঁজার দৃষ্টিকে নিষ্প্রভ করে দেয়। মিত্র শক্তিকে অ বজ্ঞা করে দূরে ঠেলে দেয়। উপজাতি যুব সমিতি সেই অপকর্মই করে চলেছে। ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থে দারুণভাবে আঘাত হানছে।

উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামকে বরাবরই ত্রিপুরা তথা ভারতের শ্রমজীবী মানুষের বাঁচার গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাথে এক সূত্রে গাঁথার চেষ্টা করেছেন। গণমুক্তি পরিষদ দেশের সকল জাতি ও উপজাতি শ্রমজীবী বাঁচার আন্দোলন থেকে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের বাঁচার আন্দোলনকে পৃথক করে দেখেনি। সেই আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিছক উপজাতিদের আন্দোলনে সীমিত রাখতে চেষ্টা করেনি। চাকুরীর ক্ষেত্রে উপজাতি প্রার্থীদের জন্য সংরক্ষণ, শিক্ষা ব্যবস্থার উপজাতিদের বিশেষ সুযোগ দান। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে উপজাতি তফসিল চিহ্নিত করে কথায় ভারতের সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিলে বর্ণিত সাংবিধানিক সুযোগ সুবিধা প্রদান, উপজাতির জমি অউপজাতির নিকট অবাধ হস্তান্তর নিষিদ্ধকরণ, তাহাদের বেআইনী হস্তান্তর জমি ফেরত দান প্রভৃতি দাবীতে উপজাতি গণমুক্তি পরিষদ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করেছেন এবং করছেন। গণমুক্তি পরিষদ এই দাবীর আন্দোলনকে ত্রিপুরা তথা ভারতের সকল অংশের জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের রূপে উপজাতি জনগণের কাছে উপস্থিত করেছেন। ত্রিপুরার উপজাতি ও অউপজাতি গণতান্ত্রিক জনগণের কাছে গ্রহণীয় করে তুলেছেন। অউপজাতির বিপুল অংশের জনগণের সমর্থন লাভ করেছেন। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের আইন ত্রিপুরায় জাতি ও উপজাতি জনগণের ঐক্যবদ্ধ নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামের ফলশ্রুতি।

ত্রিপুরার রাজনৈতিক মঞ্চ প্রধানতঃ দুইটি শিবিরে বিভক্ত। একটি হল প্রগতি বিরোধী গণতন্ত্র বিরোধী ও উপজাতি স্বার্থবিরোধী কায়েমী স্বার্থবাদীদের শিবির। এই শিবিরে রয়েছে কংগ্রেস (ই), আমরা বাঙ্গালী, উপজাতি যুব সমিতি প্রভৃতি। অপরটি হল প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও উপজাতি স্বার্থরক্ষায় আগ্রহীশীল এই শিবিরে রয়েছেন চার বাম দল। আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনী লড়াই মূলতঃ এই দুই বিপরীতমুখী শিবিরের লড়াই। লড়াইয়ের ময়দানে সরাসরি দেখা যাবে উপজাতি যুব সমিতিকে। কিন্তু নানাভাবে তাদের মদত যোগাবে কংগ্রেস (ই) এবং আমরা বাঙ্গালী। কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ কংগ্রেস দল বরাবরই উপজাতিদের স্বার্থ অস্বীকার করেছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরোধিতা করেছেন। ত্রিপুরায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রদানের জন্য ধেবর কমিশনের সুপারিশ অস্বীকার করেছেন। এখনো জেলা পরিষদের নির্বাচন বয়কট করে স্বশাসিত জেলা পরিষদের বিরোধিতা করছেন। জেলা পরিষদের বিরোধিতায় মধ্য দিয়ে উপজাতিদের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারিত করে তাদের স্বার্থরক্ষার সুযোগ সম্প্রসারিত করার কাজকেই বাঁধা দেওয়া হল। উপজাতি জনগণের সংগ্রামী ঐক্য নষ্ট করতে এবং উপজাতিদের বাঙ্গালী বিরোধী শিবিরে ঠেলে দিতে কংগ্রেস অতীতেও নানাভাবে ক্রিয়াশীল ছিল। তাদের পক্ষপুটে জন্ম নিয়েছিল চরম বাঙ্গালী বিদ্বেষী স্নেহকুমার চাকমার ট্রাইবেল ইউনিয়ন। যে ইউনিয়নের আওয়াজ ছিল ত্রিপুরার সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির বন্ধন দৃঢ় করতে পারে না। সেই বন্ধনকে ছিন্ন ভিন্ন করবে। লক্ষ্য করার বিষয় যে আমরা বাঙ্গালী দল আওয়াজ তুলেছেন "বাঙ্গালী যদি বাঁচতে চাও স্বশাসিত জেলা পরিষদ 'আটকান্ড' আর উপজাতি যুব সমিতি আওয়াজ তোলছেন "উপজাতি যদি বাঁচতে চাও ত্রিপুরা থেকে বিদেশী তাড়াও" অর্থাৎ বাঙ্গালী তাড়াও।

এই দুটি আওয়াজ ত্রিপুরার উপজাতি এবং বাঙ্গালী শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষের স্বার্থের বিরোধী। উপজাতি এবং বাঙ্গালীর মধ্যে কলহ সৃষ্টি করার আওয়াজ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পথে তাদের ঠেলে দেবার আওয়াজ। আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে নেতারা এই আওয়াজ দিচ্ছেন তাদের মধ্যে কিন্তু কোন বিরোধ নাই। বামফ্রন্ট সরকারকে ভাঙ্গাবার জন্য ত্রিপুরায় কমিউনিস্টদের অগ্রগতি রুখবার জন্য চরম উপজাতি স্বার্থ বিরোধী কংগ্রেস এবং আমরা বাঙ্গালী দলের স্বার্থে হাত মিলাতে উপজাতি যুব সমিতি প্রস্তুত।

বিধানসভায় উপনির্বাচনের প্রাক্কালে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা ঘোষণা দিয়েছিলেন যারাই বামফ্রন্টকে পরাজিত করতে এগিয়ে আসবে তাদের সাথেই উপজাতি যুব সমিতি নির্বাচনী সমঝোতা করবে। এই ঘোষণা থেকে এটা আরও পরিষ্কার যে, উপজাতি যুব সমিতি বামফ্রন্ট সরকার ভাঙ্গা এবং গণমুক্তি পরিষদ ও মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টিকে

রোখাটাই ক্রুসেট (ধর্মযুদ্ধ) হিসাবে বেছে নিয়েছিল। তার জন্য উপজাতি স্বার্থবিরোধী কংগ্রেস (ই) এবং আনন্দমার্গীদের সাহায্যপুষ্ট আমরা বাঙ্গালী দলের সাথে হাত মিলাতেও তারা তৈরী। তাদের কাছে উপজাতি স্বার্থরক্ষাটা তেমন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয়। স্বশাসিত জেলা পরিষদ বিরোধী কংগ্রেস (ই) এবং আমরা বাঙ্গালী দলের উপজাতি স্বার্থবিরোধী শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই না করে তারা লড়াই করছেন উপজাতি স্বার্থরক্ষা জন্য যারা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রাম করে চলেছেন সেই মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি এবং বামপন্থী দলগুলির বিরুদ্ধে। তাদের এই ভূমিকা থেকে এটা খুবই পরিষ্কার যে স্বশাসিত জেলা পরিষদসহ উপজাতিদের অন্যান্য রক্ষাকবচমূলক দাবী দাওয়া আদায় করা এবং রক্ষা করা তাদের রাজনৈতিক লক্ষ্য নয়। সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির খেলার পুতুল হিসাবে তার রাজনীতির মঞ্চে ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই তারা উগ্রবিচ্ছিন্নতাবাদের কর্মযজ্ঞ পথে পা বাড়িয়েছেন। ত্রিপুরার জাতি ও উপজাতি জনগণের সম্প্রীতি নষ্ট করে, ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক পরিবেশ নষ্ট করে ত্রিপুরার উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষার সংগ্রামী শক্তিকে বিভক্ত করতে চাচ্ছে। আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে এই উপজাতি স্বার্থবিরোধী গণতন্ত্র বিরোধী বিচ্ছিন্নতাবাদী ও দাঙ্গাবাজ শক্তির বিরুদ্ধে নিশ্চিত অভিমত প্রকাশ করবেন ত্রিপুরার সংগ্রামী জনগণ। এই অশুভ শক্তিকে পরাজিত না করে ত্রিপুবায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ মজবুত করা এবং উপজাতিদের স্বার্থরক্ষা করা সম্ভব হবে না।

এই অশুভ শক্তিগুলিকে পরাজিত করেই ত্রিপুরায় জাতি উপজাতির ঐক্য ও সম্প্রীতি রক্ষা করে ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে। আসন্ন স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনে ত্রিপুরার ভোটদাতাগণ সেই গুরুদায়িত্বই পালন করবেন।

(জীবন দেববর্মা, **দেশের কথা (সাপ্তাহিক) ১৬ বর্ষ, ৯ ম সংখ্যা, ১১ ডিসেম্বর,১৯৮১, ২৫ অগ্রহায়ণ ১৩৮৮ বাংলা**)

স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনোত্তর ত্রিপুরার রাজনৈতিক পরিস্থিতি

স্বশাসিত জেলা পরিষদ বামফ্রন্টের দখলে আসায় ত্রিপুরা উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের দায়িত্ব আরো বেড়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ যাতে উপজাতি এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করতে পারে তার পরিবেশ সৃষ্টি করতে উপজাতি জনগণকে সংগঠিত করার গুরু দায়িত্ব উপজাতি গণমুক্তি পরিষদকে গ্রহণ করতে হবে।

উপজাতি যুব সমিতি স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে আরও বেশী কোনঠাসা হয়েছে। আর একবার প্রমাণিত হয়েছে যে তাদের উপর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের সমর্থন নাই।

স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনে ত্রিপুরার উপজাতি ও অউপজাতি ঐক্য বিরোধী শক্তি আরেকবার পরাজিত হয়েছে। জাতি ও উপজাতি জনগণের ঐক্যপন্থীরা জয়ী হয়েছেন। সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বিচ্ছিন্নতাবাদীরা আবারও জনগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত হয়েছেন।

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ শোষিত জনগণের মূল শত্রু। এই শত্রুদের চিহ্নিত করে ত্রিপুরার জনগণ দৃঢ়তার সাথে সংগ্রাম করে চলেছেন। ঐক্যের শক্তির বিরুদ্ধে যে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা কাজ করছেন — তাদের বিরুদ্ধে ত্রিপুরার জনগণ সংগ্রাম করে চলেছেন। জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ফলে - আমরা বাঙ্গালী এবং উপজাতি যুব সমিতি ক্রমশঃ আরও বেশী জনবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। আর নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা কাটানোর ব্যর্থ প্রয়াসরূপে কংগ্রেস (ই) এদের সাথে তলে তলে আঁতাত করে চলেছে। কংগ্রেস (ই) এখন সবদলগুলির সাথে তলে তলে জোট বাঁধছে এবং এমন সব দলগুলিকে মদত দিচ্ছে, যারা দেশের ঐক্য বিরোধী, জাতীয় সংহতি বিরোধী, যারা দেশের অভ্যন্তরে নানা রকম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে দেশের গণতন্ত্র ও জাতীয় সংহতি নষ্ট করতে তৎপর, যারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতার বিষ বাষ্পে দেশকে অস্থিরতার মধ্যে ডুবিয়ে রাখতে ব্যস্ত।

সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলি অত্যন্ত সক্রিয়। সাম্রাজ্যবাদী এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যবহার করার সুযোগ পাচ্ছে। কংগ্রেস (ই) সরকার তথা বুর্জোয়া জমিদারদের সরকার এই বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে রাজনৈতিকভাবে মোকাবেলা করছেন

না। করতেও চান না। বরং এই দলগুলির কাঁধে ভর করে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে নিজ দলীয় শাসন ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। এই সঙ্কীর্ণ দলীয় স্বার্থ চরিতার্থ করতে কংগ্রেস (ই) জাতীয় সংহতি ও গণতন্ত্রের মূলে কুঠারাঘাত হানছে। দেশকে টুকরো টুকরো করার পথে নিয়ে যাচ্ছে।

বর্তমানে আসাম, নাগারাজ্য, মিজোরাম এবং মণিপুর রাজ্যে এক কথায় সমগ্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে বিচ্ছিন্নতাবাদী শ্লোগান তুলে যেভাবে সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কর্মকান্ড চলছে এবং সেগুলি মোকবেলা করার জন্য কংগ্রেস (ই) সরকার সীমাবদ্ধ যেসব পদক্ষেপ নিচ্ছেন তা সমস্যা সমাধানের পক্ষে সহায়ক নয় বরং সমস্যাকে আরও জটিলতর করে তুলছে। এই সমস্যার মোকাবেলা করতে কেবলমাত্র প্রশাসনিক পদক্ষেপই যথেষ্ট নয় — এর মোকাবিলা করতে হবে নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক এবং আদর্শগত সংগ্রাম পরিচালনা করে। কিন্তু ইন্দিরা কংগ্রেস নেতৃত্ব সেই পথে যাচ্ছেন না। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রকারান্তরে পুষ্ট করে তুলতে প্রয়াস পাচ্ছেন, শ্রীমতী গান্ধীর অনুসৃত নীতির থেকে বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ফায়দা উঠানোর সুযোগ পাচ্ছে।

কংগ্রেস (ই) ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে জন্মলগ্ন থেকেই উৎখাত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। এখনও সেই ষড়যন্ত্রের শেষ হয়েছে এমন মনে করার কোন কারণ নেই। বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করার মতলবে কংগ্রেস (ই) নেতৃত্ব আনন্দমার্গীর রাজনৈতিক প্ল্যাটফরম আমরা বাঙ্গালী দল এবং উপজাতি যুব সমিতিকে তলে তলে মদত দিচ্ছেন। অথচ ঐ দলগুলি যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মদতপুষ্ঠ এটা আজ অনুমানের বস্তু নয়।

সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত সমগ্র উত্তরপূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের পেছনে কলকাঠি নাড়ছে। পৃথক বাঙ্গালীস্থান গঠন এবং বিশুদ্ধ উপজাতি জনগোষ্ঠীর দ্বারা উপজাতিরাজ্য গঠনের আওয়াজ — সাম্রাজ্যবদীদের প্ররোচনা প্রসূত। এই আওয়াজ দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। তাই আমরা বাঙ্গালী দল এবং উপজাতি যুব সমিতির কাজকর্ম এবং গতিবিধি বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তেরই অঙ্গ হিসাবে দেখতে হবে। উপজাতি যুব সমিতির ঘন ঘন শিলং যাত্রা, উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উপজাতি নেতদের সাথে ঘন ঘন শলাপরামর্শ বিশেষ লক্ষণীয়। এই দলগুলি সম্পর্কে কংগ্রেস (ই) দৃষ্টিভঙ্গী এবং ভূমিকা নিঃসন্দেহে দেশের ঐক্যে ফাটল ধরাচ্ছে। গণতন্ত্রের টুটি টিপে মারছে। কংগ্রেস (ই), আনন্দমার্গীদের দ্বারা পুষ্ট আমরা বাঙ্গালী দল এবং উপজাতি যুব সমিতির অনুসৃত পথ কি বাঙ্গালী, কি উপজাতি কোন জনগোষ্ঠীর মৌলিক

সমস্যার সমাধান হবে না। উপজাতি সাধারণ মানুষের জীবনে চরম বিপর্যয় ডেকে আনবে।

এটা ভারতের জনগণের পক্ষে আত্মঘাতী পথ। এই পথে ভারতের সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না।

ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক আন্দোলন আর একটি অগ্নিপরীক্ষার সম্মুখীন। গণমুক্তি পরিষদকে এই বিষয়ের প্রতি নজর রেখেই অগ্রসর হতে হবে। জেলা পরিষদ বিরোধী শিবির নতুনভাবে চক্রান্তের জাল বিস্তার করছে। এই কাজে এরা খুবই সক্রিয় রয়েছে। এই অশুভ শক্তিসমূহের কাজকর্ম সম্পর্কে নিম্নরূপভাবে বলা যায় যেমন ঃ-

১। আমরা বাঙ্গালী দল এবং কংগ্রেস (ই) দলের বাঙ্গালী জনগণের মনে এই স্বশাসিত জেলা পরিষদ সম্পর্কে সন্দেহ ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের পথ তারা রুখতে পারে নাই। কিন্তু এই স্বশাসিত জেলা পরিষদকে অচল ও অকেজো করে রাখার অপপ্রয়াস তারা এখনও চালিয়ে যাচ্ছে।

২। উপজাতি যুব সমিতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় খুন সন্ত্রাস ও লুটতরাজ প্রভৃতি অপকর্ম চ্যালিয়ে যাচ্ছে। এইভাবে স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকায় সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টি করতে চাচ্ছে। উদ্দেশ হল এই এলাকায় সরকারী কর্মচারীদের গতিবিধি সঙ্কুচিত করে উন্নয়নমূলক কর্মসূচী রূপায়ণে বাধা আরোপ করা, উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের কর্মীদের গতিবিধি সঙ্কুচিত করা, এলাকায় উপজাতিদের বন্দুকের ভয় দেখিয়ে নিজেদের দলভুক্ত করা। অর্থাৎ আন্দোলনের কর্মীদের রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা সীমিত করে রেখে বিচ্ছিন্নতাবাদী ভাবধারা একতরফাভাবে প্রচার করে যাওয়া।

৩। অমরপুর বিভাগের কুর্মা এলাকায় একজন অউপজাতি ঠিকেদার এবং কমলপুর বিভগের পাহাড় অঞ্চলে কর্মরত অবস্থায় দুইজন বাঙ্গালী শ্রমিক উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থীদের হাতে নিহত হয়েছেন। এই কাজ অত্যন্ত উস্কানীমূলক। তাদের এই কাজ একদিকে যেমন বাঙ্গালীদের একাংশের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করবে, অন্যদিকে তেমনি আমরা বাঙ্গালী দল এবং কংগ্রেস (ই)কে সাহায্য করবে বাঙ্গালীদের কোন কোন অংশকে উপজাতি বিদ্বেষী করে তুলতে। উপজাতি যুব সমিতি ত্রিপুরাকে এমন জায়গায় নিয়ে যেতে চায় যাতে স্থানে স্থানে উপজাতি এবং বাঙ্গালীদের একাংশকে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে ঠেলে দেয়া যায়। এই ধরনের প্ররোচনা চলছে। এই প্ররোচনা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যমূলক — নিছক ডাকাতি নয়।

৪। কোন কোন বুর্জোয়া সংবাদপত্র উগ্রপন্থীদের সম্পর্কে এমনভাবে সংবাদ

পরিবেশন করছে যাতে জনগণের মনে স্থায়ী আতঙ্ক সৃষ্টি করে রাখা যায়। এমন ধারণা বদ্ধমূল করা যায় যে, উপজাতি এলাকায় সরকার অচল হয়ে গেছে, উপজাতি যুব সমিতিই যেন সব কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) করছে। বাস্তব চিত্র কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত। স্বশাসিত জেলা পরিষদের নির্বাচনের ফলাফলও বুর্জোয়া পত্রিকার হিসাব নিকাশ ভুল প্রমাণ করে দিয়েছে। এই প্রচারের উদ্দেশ্য একটাই। ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে আইন শৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছে তা প্রমাণ করা। সমগ্র স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকা উপদ্রুত বলে ঘোষণা করার পথ সুগম করে দেওয়া।

৫। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকাকে উপদ্রুত এলাকা ঘোষণা করার অর্থ ত্রিপুরার এক উল্লেখযোগ্য অংশকে সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া। তা করতে পারলে বর্তমান বিধানসভার নির্বাচন স্থগিত রেখে কিছু দিনের জন্য রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন চালু করার অজুহাত পাওয়া যাবে। বলা যাবে ত্রিপুরার এক উল্লেখযোগ্য অংশকে উপদ্রুত এলাকা চিহ্নিত করে রেখে বিধানসভার নির্বাচন করা ঠিক হবে না। বর্তমান ত্রিপুরা বিধান সভার আয়ু শেষ হবার পর জনপ্রতিনিধিত্বমূলক সরকার গঠনের পথে না গিয়ে শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের হাতে ত্রিপুরায় রাষ্ট্রপতি শাসন চাপিয়ে দেবার অজুহাত তুলে দেয়া যাবে। বামফ্রন্ট সরকারের তত্ত্বাবধানে যাতে ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচন না হয়। রাষ্ট্রপতি শাসনে ত্রিপুরাকে কিছুদিন রেখে রাষ্ট্রপতি শাসনের মাধ্যমে অর্থাৎ দিল্লীর শ্রীমতী গান্ধীর সরকারের তত্ত্বাবধানে যাতে ত্রিপুরায় বিধানসভার নির্বাচন করা যায় তারই একটি মানানসই যুক্তি দাঁড় করাবার প্রচেষ্টা চলছে।

স্বশাসিত জেলা পরিষদ নির্বাচনোত্তর সময়ে ত্রিপুরার কায়েমী স্বার্থবাদী দলগুলি এবং তাদের পদলেহী সংবাদপত্রগুলি এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই অগ্রসর হচ্ছে। এদের এই গণতন্ত্র বিরোধী এবং জনস্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপগুলির বিরুদ্ধেএখন থেকেই ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে সজাগ থাকতে হবে। ত্রিপুরা রাজ্য উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের বিগত ৭ই জুনের বৈঠকে এই সতর্কবাণীই উচ্চারিত হয়েছে।

জীবন দেববর্মা, (ডেইলী দেশের কথা, তৃতীয় বর্ষ, ২৪৮ সংখ্যা ১১ই জুন ১৯৮২ইং)

বিচ্ছিন্নতাবাদ উপজাতিদের বাঁচার পথ নয়

আজ ভারতের সকল অংশের উপজাতিদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। এই অসন্তোষ কোথাও সংগঠিত বিক্ষোভের রূপ নিয়েছে। আবার কোথাও তুষানলের মত তলে তলে জ্বলছে। তাঁরা অনুভব করতে পারছেন যে তাঁরা শোষিত, তাদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চরম দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত। প্রতিবেশী অগ্রসর জাতির লোকদের কাছে তাঁরা মানবোচিত বব্যহার পান না। তাঁদের কাছে তারা সর্বদাই অপাঙতেয় জীব হিসাবে পরিগণিত হয়ে রয়েছে। এই বঞ্চনা ও অবমাননার প্রতিক্রিয়া রূপে রাজ্যে রাজ্যে দেখা দিয়েছে উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে ধুমায়িত অসন্তোষ এবং বিক্ষোভ।

এতদিন উপজাতিরা এই শোচনীয় দুরবস্থার জন্য দায়ী করতেন অদৃষ্টকে। এতদিন তাদের দৃষ্টি এর বাইরে যাবার সুযোগ পায় নাই। এখন উপজাতিরাও এর বাইরে চিন্তা শুরু করেছেন। অন্য জাতি গোষ্ঠীর লোকদের সাথে নিজেদের অবস্থার তুলনা করে দেখতে শিখেছেন। পূর্বের মত তারা ও আর এত 'হবু'ও নন। তারা সচেতন হয়ে উঠেছেন আত্ম মর্যাদা বোধ সম্পর্কে সমাজে সকলের জন্য সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা এই বোধ জাগ্রত হয়েছে উপজাতি জনগণের মধ্যেও। সেই অধিকার প্রতিষ্ঠার পথে তারা প্রচন্ড বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছেন পদে পদে। তারই প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পাচ্ছে বিভিন্ন অঞ্চলের উপজাতি জনসমষ্টির মধ্যে। এরই বহিপ্রকাশ ঘটছে মিজোরাম, নাগাল্যান্ড। সেখানকার উপজাতিদের এক অংশ বিচ্ছিন্নতার পথে পা বাড়িয়ে দাবী তুলছেন স্বাধীন নাগাল্যান্ড, স্বাধীন মিজোরামের। মণিপুর রাজ্যেও দাবী উঠেছে স্বাধীন মণিপুর রাজ্য গঠনের। ত্রিপুরায় দাবী উঠেছে স্বাধীন ত্রিপুরা না হোক অন্ততঃ অ-উপজাতি জনসংখ্যা বিহীন পৃথক ত্রিপুরা ভূখন্ডের। আসাম, মেঘালয়, অরুণাচলপ্রদেশ, মণিপুর, নাগাল্যান্ড, মিজোরাম এবং ত্রিপুরা সর্বত্রই এই বিচ্ছিন্নতাবাদের ঢেউ লেগেছে। তাই ভারতের ছোট ও বড় অগ্রসর, অনগ্রসর সকল জাতি ও গোষ্ঠীর লোকের সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা এই গণতান্ত্রিক চেতনা নিয়ে উপজাতি জনগণের সমস্যাকে দেখতে হবে। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তাধারা উপজাতি জনগণের কোন কোন অংশের মনে এমন ভাবে গেথে গেছে যে এই ধ্যান ধারণা থেকে তাদের সরিয়ে আনা হবে কঠিন কাজ। মার্ক্সবাদীরা সব সময়েই উপজাতিদের সমস্যাকে সহানুভূতি ও দরদ দিয়ে দেখতে চেষ্টা করছেন। বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে মুক্ত করার সংগ্রামে উপজাতিদের সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। কিন্তু স্মরণাতীত কাল থকে অপেক্ষাকৃত অগ্রসর জাতির কায়েমী স্বার্থের দ্বারা শোষিত নিপীড়িত নির্যাতিত ও প্রতারিত হতে হতে উপজাতি জনগণের পক্ষে উপজাতি ভিন্ন

অন্যদের উপর বিশ্বাস করার মানসিকতায় দারুণভাবে চিড় ধরে গেছে। কিন্তু তার জন্য উপজাতিদের দায়ী করা চলে না। যারাই তাদের সংস্পর্শে গেছেন - কেবল দুহাত ভরে লুটে নিয়েছেন তাদের কাছ থেকে। প্রতিদানে খুব কমই দিয়েছেন বরং তাদের সরলতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে কেবল প্রতারণাই করেছেন। তাই কমিউনিস্টরা দরদ দিয়ে তাদের সমস্যা বুঝতে এবং এই সমস্যা সমাধানে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেও উপজাতি অনেকেই কমিউনিস্টদেরও পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারছেন না। অনেকেই এখনো কমিউনিস্টদের সন্দেহের চোখে দেখেন। তাদের ও শত্রুর পর্যায়ে ফেলে বিচার করেন। তাদের এই ভ্রান্তি দ্রুত নিরসনের দরকার।

এখানে বলা দরকার যে উপজাতিদের মধ্যে আত্মবিকাশের চেতনাবোধকে সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদীরা বিচ্ছিন্নতাবাদের দিকে নিয়ে যাচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে। তাদের সামনে ভুল পথ তুলে ধরছে। তাদের এই আত্মচেতনাবোধ তখনই জাতি গঠনের সহায়ক হবে, উপজাতিদের উন্নতির সহায়ক হবে, শোষণ ও বঞ্চনার হাত থেকে উপজাতি সাধারণ মানুষকে মুক্তি দেয়া সম্ভব হবে যখন এই বিক্ষুব্ধ উপজাতি জনগণ উপজাতিদের স্বার্থরক্ষার সংগ্রামের সঠিক পথ বাছাই করে নিতে পারবেন।

কারা উপজাতিদের এই অবস্থার জন্য দায়ী ? কারা তাদের শত্রু ? কোন শত্রুর বিরুদ্ধে উপজাতিদের লড়তে হবে ? এই লড়াই -এ কারা তাদের নির্ভরযোগ্য মিত্র এবং সহযোদ্ধা রূপে পাশে থাকবেন ? এই বিষয়গুলির উপর সঠিক দৃষ্টিভঙ্গী এবং সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে না পারলে উপজাতিরা যত সাহসের সহিত ত্যাগ স্বীকার করে লড়াই -এ নামুন না কেন তাদের সংগ্রাম ব্যর্থতা ডেকে আনবেই। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাজ্য গঠনের আওয়াজ তুলে দীর্ঘ দিন ধরে বন্দুক নিয়ে লড়াই চালিয়ে এসেছে নাগা, মিজো এবং মণিপুরীদের এক একটি বিদ্রোহী সশস্ত্র বাহিনী। তাতে উভয় পক্ষেরই কিছু লোকক্ষয় হয়েছে। কিন্তু এই সংগ্রামের ফলে স্বাধীন মিজোরাম, স্বাধীন নাগাল্যান্ড ও স্বাধীন মণিপুর রাজ্য ভূমিষ্ঠ হয় নাই । বিদ্রোহী লড়াকুদের এই লড়াই সফল হয় নাই। ভবিষ্যতে হবে তারও কোন সম্ভাবনা নাই।

প্রথমতঃ বোঝা দরকার (১) তাঁদের বর্তমান দুরাবস্থার জন্য দায়ী পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থাই দেশের উপজাতি জনগোষ্ঠীদের উপর শোষণ ও নির্যাতন তীব্রতর করে তুলেছে। কেবল উপজাতি জনগণের উপরই নয়, সকল জাতি গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের উপরও শোষণ ও পীড়ন অনুরূপভাবে চলছে। এখন ভারতের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রয়েছে ভারতের বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর দখলে। অর্থাৎ তাদের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেসের হাতে। আর এই বুর্জোয়া জমিদার সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সরকারই

উপজাতি জনগণের মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে। তাদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ করছে। তাদের মাথা তুলে দাঁড়াতে দিচ্ছে না। তাদের প্রতি অন্যায় অবিচার করছে। বুঝতে হবে দেশের পুঁজিবাদী সমাজ ব্যবস্থা এবং এই ব্যবস্থার ধারক ও বাহক বুর্জোয়া শ্রেণীই উপজাতিদের মূল শত্রু। আরও বুঝতে হবে— এই বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক সংগঠন কংগ্রেস (ই) দলই ত্রিপুরা তথা ভারতের সকল উপজাতি গোষ্ঠীর সাধারণ মানুষের মূলশত্রু। এ সম্পর্কে সন্দেহ রেখে শত্রু চিহ্নিত করতে সামান্যতম ইতস্ততা উপজাতিদের বাঁচার সংগ্রামকে দুর্বল করবে। (২) অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে বুর্জোয়া নেতারা, ধরুন পন্ডিত জহরলাল নেহেরু থেকে সুরু করে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সকলেই উপজাতিদের জন্য দরদ পূর্ণ কথা বলে বাম কুম্ভীরাশ্রু বিসর্জন করেন নাই, কিন্তু যাতে উপজাতিদের উন্নতি সাধিত হয়, যাতে তারা সমাজে অন্যদের মত সমান অধিকার এবং সমান মর্যাদা পান তেমন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ তাদের সরকার গ্রহণ করেন নাই, এই বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীর প্রতিনিধি কংগ্রেস (ই)র হাতে যতদিন সরকারী ক্ষমতা থাকবে ততদিন কোন কার্যকরী পদক্ষেপ গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনা নাই। উপজাতি সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে সামান্যতম মোহও থাকা উচিত নয়। কংগ্রেস সরকারের কাছে ইহা আশা করাও হবে উপজাতিদের পক্ষে আত্মপ্রতারণা। (৩) দেশের বিপুল সংখ্যক গণতান্ত্রিক জনগণই উপজাতি সাধারণ মানুষের অকৃত্রিম মিত্র এবং নির্ভরযোগ্য সহযোদ্ধা। গণতান্ত্রিক শক্তিই উপজাতিদের পাশে শক্তভাবে দাঁড়াবে। আর কোন শক্তিই দাঁড়াবে না। অন্যরা তাদের সাগরের জলে নামিয়ে দিয়েই সরে পড়বে। কেবল সকল জাতির, সকল ধর্মের ও সকল সম্প্রদায়ের জনগণের ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলন বাদ দিয়ে উপজাতিদের পক্ষে একলাচলার নীতি অবলম্বন করা আত্মহত্যার সামিল হবে। তার পরিণতি হবে উপজাতি সাধারণ মানুষের পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণও নির্যাতন দীর্ঘস্থায়ী করা। (৪) উপজাতি ব্যক্তি ভিন্ন এই ভারতে উপজাতিদের বন্ধু আর কেহ নাই- বিচ্ছিন্নতাবাদীরা ইহাই অহোরাত্র প্রচার করে যাচ্ছেন। তাহাদের মতে - উপজাতি ছাড়া অন্যরা সকলেই উপজাতিদের ঘোর শত্রু। উপজাতিদের লড়াই তাদের বিরুদ্ধে । বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই মতবাদ অত্যন্ত ভ্রান্ত। এই মতবাদের উপর ভর করে চললে উপজাতি জনগণের বিপদ বাড়বে। সাম্রাজ্যবাদী এবং দেশের উপজাতি স্বার্থ বিরোধী প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি চায় উপজাতিদের বাঁচার সংগ্রামে কেউ যাতে সাহায্য না করে। উপজাতিরা প্রতিবেশী অগ্রসর অংশের জনগণের শ্রমিক -কৃষক সহ গোটা জাতটার বিরুদ্ধে শত্রুতা করে চললে উপজাতিদের উপর কায়েমী স্বার্থের আক্রমণ প্রতিহত করতে তারা এগিয়ে আসবেন না। ফলে উপজাতিদের বাঁচার সংগ্রাম দুর্বল হবে। সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থ রক্ষার মন্ত্রে দীক্ষিত উপজাতি যুব সমিতির নেতৃত্ব এবং খ্রীষ্টান মিশনের প্রতিক্রিয়াশীল অংশ সেই মারাত্মক

উপজাতি নিধনের পথই অনুসরণ করছেন। (৫) ত্রিপুরার গণআন্দোলনের ইতিহাস প্রমাণ করেছে যে — এতদিন কংগ্রেস নেতৃত্ব ত্রিপুরার বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালী জনগণকে উপজাতিদের দাবী দাওয়া সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে রাখতে পেরেছেন। এতদিন বাঙ্গালীদের সকল অংশকে উপজাতিদের দাবীদাওয়া প্রতিহত করে সক্রিয় বিরোধিতায় নামাতে না পারলেও কংগ্রেস তাদের এক বিরাট অংশকে পক্ষে রাখতে পেরেছিল। ত্রিপুরার বিরাট সংখ্যক বাঙ্গালী জনগণ কংগ্রেসের মোহভঙ্গ করে বামপন্থীদের আন্দোলনে যোগ দেবার পরই বামফ্রন্ট বামফ্রন্ট সরকার গঠন করা সম্ভব নয়। এই বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই স্বশাসিত জেলা পরিষদ সহ উপজাতিদের চার দফা দাবী স্বীকৃত এবং বাস্তবায়িত হতে থাকে।

এই প্রক্রিয়া সাধনে বাঙ্গালী গণতান্ত্রিক জনগণের একটি বিরাট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই বাস্তবতা অস্বীকার করে এখনো যারা বাঙ্গালী বিদ্বেষ ছড়াচ্ছেন তারা উপজাতিদের স্বার্থ রক্ষা করার নামে উপজাতিদের সর্বনাশই করে চলেছেন। স্বশাসিত জেলা পরিষদ এলাকার উন্নয়নমূলক কাজকর্মের গতি সঞ্চালন করাও ত্রিপুরার বিপুল সংখ্যক বাঙ্গালী জনগণের অকুণ্ঠ সমর্থন এবং সক্রিয় সহযোগিতার প্রয়োজন। তাছাড়া সম্ভব হবে না। (৬) আরও উপলব্ধি করা করা প্রয়োজন যে, উপজাতি জনগণের স্বার্থ জড়িত আছে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোর সাথে। দেশে গড়ে উঠেছে পুঁজিবাদী অর্থনীতি। সেই অর্থনীতি নির্ভরশীল হয়ে উঠেছে বিদেশী পুঁজিবাদের উপর। আর এই বিদেশী পুঁজিবাদী গড়ে তুলেছে বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদ। তাই বলতে হয় উপজাতি জনগণের স্বার্থরক্ষা ও সার্বিক বিকাশের পথ একটিই। তা হল পুঁজিবাদকে ধ্বংস করে দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা।শোষনহীণ সমাজ গঠন করা। সেই পথের বিরোধিতা করছেন যারা প্রকৃত অর্থে, তারাই উপজাতি স্বার্থবিরোধী এবং গণতন্ত্র বিরোধী। (৭) এই সাম্রাজ্যবাদী ও পুঁজিবাদী আদর্শই বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্মদাতা। ত্রিপুরার উপজাতি যুব সমিতি সহ সমগ্র উত্তর পূর্বাঞ্চলের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রেরণার উৎস এরাই। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে, দেশে গণতন্ত্র সম্প্রসারণ করতে সর্বোপরি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে যে সংগ্রাম চলছে, সেই সংগ্রাম থেকে উপজাতি জনগোষ্ঠীকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতেই এই ষড়যন্ত্র। (৮) বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এবং খ্রীষ্টান মিশনারী প্রতিক্রিয়াশীল অংশের ব্যক্তিরা উপজাতিদের সামনে তাদের দুরবস্থার বাস্তব চিত্র তুলে ধরেন, তাদের প্রতি দরদ দেখান। এভাবে উপজাতিদের সমীহ আদায় করেন। উপজাতিদের কাছে ঘেষবার সুযোগ করে নিয়েই তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের বিঁষ ঢেলে উপজাতিদের মন কলুষিত করেন। এভাবে তাদের ভুল পথে টেনে নেন। (৯) উপজাতি যুব সমিতির

সমর্থকরা আওয়াজ তুলেছেন অম্পি, তৈদু মূলতঃ হালাম উপজাতিদের আদি বাসস্থান। তাই সেখানে মূলতঃ হালাম উপজাতিরাই থাকবেন। অর্থাৎ জমাতিয়া, কলই, কাইপেং ও মলছয়রাই থাকবেন। দেববর্মা শিরোনামধারী উপজাতিদের এই হালাম এলাকা ছাড়তে হবে। লক্ষণীয় হল উপজাতি যুব সমিতি কেবল উপজাতি এবং বাঙ্গালীদের মধ্যে সংঘর্ষ চান না, তারা চান এক দফার উপজাতিদের সাথে অপর দফার উপজাতিদের সংঘাত। (১০) উপজাতিদের মনে রাখতে হবে যারা উপজাতিদের স্বার্থে আঘাত করছে সেই সব বুর্জোয়া জমিদার শ্রেণীরা সংগঠিত। সারা ভারত ব্যাপী তাদের একটা কেন্দ্রীয় সংগঠন আছে। তারাই সরকারী ক্ষমতায় রয়েছেন। কাজেই উপজাতিরা তাদের আক্রমণের মোকাবেলা এককভাবে করতে পারবেন না। গত দুই দশক ধরে নাগা এবং মিজোরা অনেক রক্তক্ষয়ী লড়াই করেছেন। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছেন এই আক্রমণ মোকাবেলা করতে। প্রথমতঃ তাদের শ্লোগান বিচ্ছিন্নতার শ্লোগান। এই গণতন্ত্র বিরোধী এবং জাতীয় স্বার্থ বিরোধী আওয়াজের প্রতি ভারতের অন্যান্য অংশের গণতান্ত্রিক মানুষের সমর্থন নাই। থাকতে পারে না। তাই তারা গণতান্ত্রিক জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে তারা যেমন বীর অভিমন্যুকে চক্রব্যুহের মধ্যে একা পেয়ে সপ্তরথীরা নিহত করতে সক্ষম হয়েছিলেন, তেমনি দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলে উপজাতিদের বাঁচার সংগ্রামকে পুঁজিবাদীরা ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হবে। কাজেই বিচ্ছিন্নতার পথ উপজাতিদের বাঁচার পথ নয়। (১১) ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস(ই)র সাথে হাত মিলাচ্ছে আরও পাকাপাকি ভাবে। অর্থাৎ যে কুমীর ত্রিপুরার উপজাতিদের সর্বনাশ করে গেছেন গত ত্রিশ বৎসর সরকারী গদীতে বসে উপজাতি যুব সমিতি সেই কুমীরকে খাল কেটে ঘরে ডেকে আনছে। ১০ জুন ধর্মনগরে কংগ্রেস (ই) আদিবাসী সংগঠনের এক রাজ্য ভিত্তিক সম্মেলন হয়ে গেছে। সেই সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের প্রায় সকলেই উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক ও কর্মী। কুলাই এলাকার উপজাতি যুব সমিতির কর্মী আশাধন কলই ও নাকি এই আদিবাসী কংগ্রেস (ই) সম্মেলনে যোগদানকারীদের অন্যতম প্রতিনিধি। এর থেকে বুঝতে হবে উপজাতি যুব সমিতির নেতারা উপজাতি জনগণকে আবার কোন খাঁচায় ভরতে চাচ্ছেন। মা কুমীর যেমন খাদ্য আহ্বানের জন্য কুমীর শিশুদের নদীর তীরে পাঠিয়ে দিয়ে নিজে গভীর জলে লুকিয়ে থাকে, তেমনি উপজাতি যুব সমিতির নেতারাও নিজ দলের কর্মীদের আদিবাসী কংগ্রেস (ই) তে, অর্থাৎ কংগ্রেসের কোলে তুলে দিয়ে নিজেরা দূরে রইলেন - তারাই যে আসলে কংগ্রেস (ই)র সাকরেদ এই বিষয়টি আপতত গোপন রাখলেন।

(জীবন দেববর্মা, ডেইলী দেশের কথা, তৃতীয় বর্ষ, ২৫৩ সংখ্যা, ১৭ জুন, ১৯৮২ ইং)

জনগণের প্রতি বামফ্রন্ট বিরোধী দলগুলোর কি কোন দায়িত্ববোধ আছে?

ত্রিপুরার এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী দল সৃষ্টি হয়েছে। তারা একটির পর একটি ঘর পোড়াচ্ছে। এই ব্যাপারে যে বামফ্রন্ট বিরোধী কিছু রাজনৈতিক দলের হাত আছে একথা অনুমান করতে আর কষ্ট হয় না। এদের স বাইকে হাতে নাতে ধরা যাচ্ছে না ঠিকই কিন্তু যারা ত্রিপুরায় দাঙ্গা সংঘটিত করেছিল এই অপকর্ম তাদেরই। গত দুই বছরে ত্রিপুরায় দুশতের বেশী স্কুল ঘর পুড়েছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় গত জুনের দাঙ্গার সময় একটি স্কুল ঘরও পোড়া যায়নি। স্কুল ঘব পোড়া শুরু হলো দাঙ্গা থেমে যাওয়ার অনেক পর (ত্রিপুরায় শান্তি ফিরে আসার পব। দাঙ্গা বিধ্বস্ত পবিবারগুলি আপন আপন এলাকায় ফিবে যাওয়ার পব। বুঝতে কষ্ট হয়না দাঙ্গার পবে ত্রিপুরা বামফ্রন্ট সরকাবকে জনবিচ্ছিন্ন করতে না পেবে তাবা এই স্কুল ঘর পোড়ার জঘন্য খেলায মেতে উঠেছে।

গত দুই মাসে আর ও বেশ কিছু স্কুল ঘব পোডেছে। চম্পকনগ র হাইস্কুল, ইটাবাডী স্কুল, পাড়া কলক সিনিযর বেসিক স্কুল, ঘিলাতলী হাইস্কুল, জামিব ছড়া জে বি স্কুল, লক্ষ্মীছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল প্রভৃতি। ইহা লক্ষ্য করার বিষয় যে স্কুল ঘব পোডাব এই জঘন্য রাজনীতিব খেলা শুরু হয়েছে জুনেব দাঙ্গার পর থেকে। সব চেয়ে বেশী সংখ্যক স্কুল ঘর পুড়েছে সদর এবং উদয়পুব বিভাগে। দাঙ্গার তীব্রতাও এই দুই বিভাগে বেশী হযেছিল। গত দুই বছরে এই দুই বিভাগে অনেকগুলি হাই স্কুল ঘবও পুড়েছে। খোয়াই এবং অমরপুব বিভাগেও কিছু স্কুলঘর পুড়েছে। সম্প্রতী এই স্কুল ঘর পোড়ার বোগ সংক্রামিত হয়েছে বিলোনীয়া এবং কৈলাসহর বিভাগেও।

গত ২০ জুন বিলোনীয়া বিভাগের লক্ষ্মীছড়া সিনিয়র বেসিক স্কুল আগুনে পুডে ছারখার হয়। এর দুদিন আগে পার্শ্ববর্তী চরকবাই স্কুলের ম্যানেজিং কমিটিব নির্বাচনে বামফ্রন্ট সমর্থক প্রার্থীদের কাছে কং(ই) হেরে যান। ২৭ শে জুন লক্ষ্মীছড়া স্কুলে ম্যানেজিং কমিটির নির্বাচন হওয়ার কথা। তার আগেই এই স্কুল ধর পুড়ে যায়। এর থেকে অনুমান করতে কষ্ট হয় না যে, এই স্কুল ঘর কারা পোড়াচ্ছে।

শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণে বামফ্রন্ট সরকার বিশেষ নজর দিয়েছে। গ্রামাঞ্চলে হাই স্কুল, সিনিয়র বেসিক স্কুল এবং প্রাইমারী স্কুলের সংখ্যা অনেক বৃদ্ধি করেছে। কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি করছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্কুলের সংখ্যা দ্বিগুণ করেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধির হার

বিভিন্ন স্তরে শতকরা ৩০% থেকে ৬০% ভাগ স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে গিয়ে স্কুলের চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষক দেওয়া, আসবাব পত্র দেওয়া হয়নি। শিক্ষার সুযোগ যেখানে ছিল না সেখানেও এই সুযোগ সম্প্রসারণ করতে গেলে একই সময়ে প্রত্যেক স্কুলে প্রয়োজন মত, চাহিদা পূরণ করা যায় না। ত্রিপুরা সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতায় তা করা সম্ভব নয়। তা করতে গেলে বিরাট সংখ্যক ছেলে মেয়েদের প্রাথমিক শিক্ষার সুযোগ থেকেও বঞ্চিত রাখতে হয়। তা অভিপ্রেত হতে পারে না। তবে রাজ্যের সামগ্রিক জনগণের খাতিরে ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের এই অসুবিধাটুকু ভাগ করে নিতে হচ্ছে। ইংরেজীতে যার নাম "সেয়াবিং অফ ইনফনভি নিয়েন্সেস"।

স্কুলের উন্নতির দিকে যে এই সরকার একদম নজর দেয়নি তাও নয়। গত কয়বছরে ত্রিপুরায় এক হাজারের বেশী পুরাতন প্রাইমারী স্কুল ঘর, মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। বহু সিনিয়র বেসিক হাইস্কুলঘর মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করা হয়েছে। তাছাড়া এসটির মত হাইস্কুলের পাকাবাড়ী এবং কয়েকটি হোস্টেলের পাকাবাড়ী করা হয়েছে। অনেকগুলি খেলার মাঠ সংস্কার করা হয়েছে। প্রতিবছর দশ থেকে পনের লক্ষ টাকার আসবাবপত্র স্কুলগুলিতে দেওয়া হয়েছে। স্কুলের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যয়ের বছর ও বাড়ে। তাছাড়া প্রায় দুই শতের মত স্কুলঘর সমাজদ্রোহীরা পুড়িয়ে দেওয়ার ফলে সেই স্কুল ঘরগুলির পুনর্নির্মাণ এবং অল্প পরিমাণ আসবাবপত্র সরবরাহ করতেও শিক্ষা দপ্তরের খরচ অনেক বেড়েছে। তাই এখনও অনেকগুলি স্কুলের দৈন্যদশার অবসান করা সম্ভব হয় নাই।

যারা স্কুলঘর পোড়ার রাজনীতিতে হাত পাকাচ্ছেন তাদের উদ্দেশ্য একটিই তা হলো শিক্ষার সুযোগ সঙ্কুচিত করে বামফ্রন্ট সরকারের বিরুদ্ধে ছাত্রসমাজকে ক্ষেপিয়ে তোলা- স্থানে স্থানে ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বামফ্রন্ট সরকারকে বিব্রত করা। তবে আশার কথা ত্রিপুরার বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্রছাত্রীরা এই সমাজ বিরোধীদের দ্বারা বিভ্রান্ত হচ্ছে না। অনেক কষ্ট স্বীকার করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে শান্তি বজায় রেখে লেখাপড়া করছে। ত্রিপুরা সরকারের সীমিত আর্থিক ক্ষমতা উপলব্ধি করে, শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তারা এই কষ্ট স্বীকার করছে। তাদের এই প্রজ্ঞা, রাজনৈতিক চেতনা এবং দেশের এ দশের প্রতি দায়িত্ববোধই প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি এই চক্রান্তের হাত থেকে ত্রিপুরার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি বাঁচাবে। ত্রিপুরার গণতান্ত্রিক পরিবেশ বজায় রাখতে সহায়ক হবে।

জীবন দেববর্মা (ডেইলী দেশের কথা, তৃতীয় বর্ষ, ২৩১ সংখ্যা, ২৬ জুন, ১৯৮২ ইংরেজী)

এ কেমন সেনাপতি

২৬ জুলাই সুখময় সেনগুপ্ত মহাশয় জনসভা ডাকলেন আগরতলার আস্তাবল মাঠে। তাঁর জনসভার অনুমতি ছিল, কিন্তু মিছিলের অনুমতি ছিল না।

২৬ জুলাই এর ঘটনাবলী থেকে এটাই স্পষ্ট হলো যে,সেদিন সেনগুপ্তের উদ্দেশ্য ছিল জনসভা নয়, মূল লক্ষ্য ছিল গায়ে পড়ে আগরতলা শহরে একটা গোলমাল বাঁধানো। কিন্তু মিছিলের অনুমতি না পাওয়াতে সেনগুপ্ত মশাই একটু ফাঁপড়ে পড়লেন বৈকি। গোলমালটা শহরের প্রাণ কেন্দ্রে করতে পারলেন না। কিন্তু তিনি ঘুঘু রাজনীতিজ্ঞ। অন্যের মাথায় কাঁঠাল ভেঙ্গে খেতে ওস্তাদ। তাই ঠিক করলেন তিনি মিছিল করবেনই আগরতলা শহরে। বিকাল, বেলা ৪ টা পার হয়ে যায় সেনগুপ্তের দেখা নেই। সেনগুপ্ত বড় চালাক লোক। তিনি গোলমাল পাকাবেন, আইন ভেঙ্গে করবেন। তিনি তা করবেন তার অনুগামীদের দ্বারা। নিজে থাকবেন দূরে — গভীর জলে। তাই সেনগুপ্তের পূর্ব পরিকল্পনা বিকাল ৪ টায় সেনগুপ্ত ছাড়া মিছিল বের হল । বে-আইনী মিছিল। মিছিল করার অনুমতি নাই। সেনগুপ্তের চেলারা রাস্তায় বের হলেন। পুলিশ আপত্তি জানালো। মিছিলকারীরা ইট-পাটকেল ছুঁড়লেন। পুলিশ শেষ পর্যন্ত শক্ত হলেন। কাঁদুনি গ্যাসের সেল ফাটালেন। লাঠি চার্জ হল। সেনগুপ্তের অনুগামীরা যে যার পথে পালালেন। কিছু লোক আবার মাঠে গিয়ে জড় হলেন। এই হল রনাঙ্গণের প্রথম পর্ব ।

রনাঙ্গণের দ্বিতীয় পর্বে সেনাপতি স্বয়ং উপস্থিত। মঞ্চে দাঁড়িয়ে সুখময় সেনগুপ্ত ঘোষণা করলেন — এ রাজ্যে আইন নাই। আমরা কোন আইন মানব না। চলুন, আইন ভাঙ্গুন। মিছিল করতেই হবে। আমি মিছিলের সামনে থাকব। আবার মিছিল শুরু। সেনগুপ্ত মহাশয় মিছিলের সামনে।

পুলিশ ঘোষণা করলেন— "এই মিছিল বেআইনী। তাড়াতাড়ি সরে যান। নতুবা পুলিশ পুলিশের কর্তব্য করতে বাধ্য হবেন।"

চক্ষুর নিমিষে সুখময় সেনগুপ্ত জীপে উঠলেন এবং কিছু সাঙ্গো পাঙ্গো নিয়ে রনাঙ্গণ থেকে কেটে পড়লেন। তার অনুগামীরা কাঁদুনে গ্যাসের ধুয়া খেয়ে যে যার পথে ছুটলেন। এখন প্রশ্ন সুখময় বাবু কি পুলিশের আইন মেনে মিছিল ত্যাগ করলেন, নাকি ভীড়ের মধ্যে লাঠি পেটানির ভয়ে আগে ভাগে কেটে পড়লেন। প্রথম পর্বে নিজের অনুপস্থিতিতে কাজ সারতে চাইলেন। তাতে সফলা না হওয়াতে দ্বিতীয় পর্বে নিজে রনাঙ্গণে দেখা দিলেন। ধনুভংগ পণ মিছিল হবেই। কিন্তু কাঁদুনী গ্যাস ছাড়ার আগেই

নিরাপদ স্থানে কেটে পড়লেন। সত্যই বীর পুরুষ। অনুগামীদের টোপের মুখে ঠেলে দিয়ে সেনাপতি মহাশয় কেটে পড়লেন।

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার সময় উপজাতি যুব সমিতির নেতারাও কি ঐ একই পথ গ্রহণ করেন নাই ? যুব সমিতির অনুগামীদের দাঙ্গা করার দিনক্ষণ সব ঠিক করে দিয়ে তাদের দাঙ্গার তালিম দিয়ে নেতারা নিরাপদ স্থানে কেটে পড়লেন। দ্রাউকুমার রিয়াং, শ্যামাচরণ ত্রিপুরা, নৃপেন্দ্র জমাতিয়া প্রভৃতি সকলেই জুনের দাঙ্গার ২/৩ দিন আগে থেকেই সস্ত্রীক আগরতলায় এম এল এ হোস্টেলে। তারা জানতেন পাহাড়ের দাঙ্গার খবর আগরতলা শহরে পৌঁছলেই এম এল এ হোস্টেলে সশস্ত্র পুলিশের পাহাড়া বসে যাবে। সরকারই তাদের রক্ষার দায়িত্ব নেবেন। গুরু ও শিষ্যরা একই পথের পথিক। অনুগামীরা যখন বুঝবেন তাদের সেনাপতিরা সিংহ নয়, ধূর্ত খেঁকশিয়াল মাত্র তখন এই পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারী সেনাপতিদের কি হাল হবে?

(জীবন দেববর্মা, ডেইলী দেশের কথা, তৃতীয় বর্ষ, ১৯২ সংখ্যা, ১ আগস্ট, ১৯৮২ ইং)



উপজাতি সমস্যা সমাধানে নভেম্বর বিপ্লবের শিক্ষা

নভেম্বর বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। এক নব দিগন্তের উন্মোচন। ১৯১৭ সালের ৭ই নভেম্বর বিপ্লব ঘটে। এই সর্বপ্রথম দুনিয়ার মানুষ দেখতে পায় প্রচলিত পুঁজিবাদী ব্যবস্থা চিরন্তন নয়। সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষের উপর বড়লোকদের শাসন এবং শোষণও অমোঘ বিধান নয়। এ সম্পর্ক মানুষের সৃষ্টি। এই ব্যবস্থাকে পাল্টানো যায়। মানুষের উপর মানুষের শোষণের অবসান করা যায়। রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লব বিশ্ববাসীর কাছে সেই নতুন বার্তাই পৌঁছে দিল।

নভেম্বর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রুশ দেশে জারতন্ত্রের খতম হয়। রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় সর্বহারা শ্রেণীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ভেঙ্গে দিয়ে তথায় সমাজতান্ত্রিক আর্থিক বুনিয়াদ গড়ে উঠল। রুশ দেশের সেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব আজ পুঁজিবাদী দেশগুলি অস্বীকার করতে পারছে না।

একথা সকলেই জ্ঞাত যে রুশ বিপ্লবের পর আরও অনেকগুলি দেশে সফল বিপ্লব হয়েছে। এই বিপ্লবগুলির পেছনে মূল প্রেরণা রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লব, পথপ্রদর্শক মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। মার্কসবাদ ও লেনিনবাদের উপর দৃঢ় আস্থাশীল কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্ব ছাড়া সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সাফল্য লাভ করতে পারে না।

রুশ দেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। চীন, ভিয়েতনাম, কোরিয়া, কিউবা প্রভৃতি আরও অনেক দেশে অর্থাৎ যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল হয়েছে সেই দেশগুলিতেই সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে এবং উত্তরোত্তর শক্তিশালী হচ্ছে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা মানেই শোষণ ব্যবস্থার অবসান। পুঁজিবাদী দেশগুলির মত সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে আর বেকার নেই, জঠর যন্ত্রনায় মানুষকে ভুগতে হয় না, বিনা চিকিৎসায় কাউকে মরতে হয় না। সেখানে কেউ কাউকে শোষণ করে না। শোষণ করার সব পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। সকলের জন্য কাজ এবং সকলের নিম্নতম সুখ শান্তি নিশ্চিত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যা মানুষের সার্বিক কল্যাণে ব্যবহৃত হচ্ছে। এটাই নভেম্বর বিপ্লবের বড় তাৎপর্য।

নভেম্বর বিপ্লব যে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে রুশ দেশে, তারই আলোকে অনেকগুলি দেশে আজ সমাজতন্ত্র গড়ে উঠেছে। ইউরোপের ১২টি দেশে, চীন,

উত্তর কোরিয়া, ভিয়েতনাম, কিউবা প্রভৃতি দেশে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি প্রমাণ করে দিয়েছে যে, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী আদর্শ, এক কথায় সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা দেশের এক গোষ্ঠীর লোকদের অপর একটি গোষ্ঠীর লোকদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি বৃদ্ধি করে, তাদের মধ্যে ঐক্য সুদৃঢ় করে। এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মানসিকতার জন্ম দেয়। সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা থাকার গ্যারন্টি সৃষ্টি করে। কিন্তু পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা তার বিপরীতমুখী কাজ করে।

নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে রুশ দেশের অবস্থা কি ছিল? রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা হোয়াইট রাশিয়ান বুর্জোয়াদের দখলে। রুশ দেশে ছিল বড়লোকদের রাজত্ব অর্থাৎ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। হোয়াইট রাশিয়ানদের উপরতলার লোকেরাই সর্বাধিক সুযোগ সুবিধা ভোগ করতেন। অন্যান্য ছোট ছোট অনগ্রসর ও দুর্বল গোষ্ঠীগুলি ছিল অজ্ঞাত। জারের শাসনে ঐসব ছোট ছোট দুর্বল ভাষাগোষ্ঠীর লোকদের কাছে রুশদেশ ছিল কয়েদখানার নামান্তর। তাদের মাথা তুলবার সুযোগ ছিল না। বরং তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি জোর করে চাপিয়ে দেবার প্রচেষ্টা চলেছিল।

নভেম্বর বিপ্লব এনে ছিল রুশ দেশে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের সমাজ ব্যবস্থা যা ছিল দুনিয়ার মানুষের কাছে অভূতপূর্ব। মহান লেনিনের নেতৃত্বে রচিত হল রুশদেশের নতুন সংবিধান। সেই সংবিধানকে কেন্দ্র করে রুশদেশে ১৬টি রিপাবলিক নিয়ে গড়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধানে কোন জাতিগোষ্ঠীকে জোর করে সোভিয়েত ইউনিয়নে ধরে রাখার সংবিধানগত বাধ্য বাধকতা নাই। সংবিধানে ঘোষিত হল ছোট বড় সকল ভাষাগোষ্ঠীর সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা। ঘোষিত হল — রুশদেশের ঐ সকল জাতিগোষ্ঠীগুলি ইচ্ছা করলে নিজেদের পৃথক ও স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে পারেন। অর্থাৎ তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়। সংবিধানে এটাও বলা হল — তবে ঐ সকল ছোট ছোট ও অনগ্রসর অংশের জনগণের পক্ষে তাদের সার্বিক কল্যাণ সাধনের স্বার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নের অঙ্গীভূত থাকাটাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তবে কাউকেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ধরে রাখা হবে না।

যে রাষ্ট্র ব্যবস্থায় সকলের জন্য কাজ এবং সকল অংশের জনগোষ্ঠীর জন্য সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা স্বীকৃত, যেখানে সকল অংশের জনগণের সমবিকাশের জন্য দেশের সম্পদ ব্যবহৃত হয়, সেখানে কারও পৃথক রাষ্ট্র গঠনের প্রবণতা থাকতে পারে না। রুশদেশে তাই ঘটেছে। ১৬টি রিপাবলিক - বা সাধারণতন্ত্র নিয়ে সোভিয়েত রাষ্ট্র গঠিত

হয়েছে।

পুঁজিবাদী সমাজে এই ব্যবস্থা নাই। বরং তার উল্টোটা আছে। "যোগ্যতমই টিকে থাকে" এই শ্লোগানের আড়ালে দুর্বল অংশের জনগোষ্ঠীর উপর জুলুম চলে। তাদের সকল প্রকার অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। তাদের বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও তাচ্ছিল্যভাবের সৃষ্টি করা হয়। তাদের দাবিয়ে রাখা হয়। জার আমলে রুশ দেশেও তাই ছিল। ভারতের ছোট ছোট ভাষাগোষ্ঠীর বিশেষ করে বিভিন্ন ভাষাভাষী উপজাতি জনগোষ্ঠীর জনগণের ভাগ্যে তাই জুটছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার শোষণ বঞ্চনার ও নিপীড়ন থেকেই বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা জন্ম নেয়। আবহমান কাল থেকে চলে আসা শোষণ ও বঞ্চনাই এই অশুভ প্রবণতা জন্মলাভের মূল উৎস। ভারতের ঘটনাবলী থেকেই তার উপলব্ধি করা যায়। স্বাধীনতা লাভের প্রথম দিকে এই সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা তেমন তীব্র ছিল না। বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জনগণের মনে একটা ক্ষীণ আশা জেগেছিল যে হয়ত এই বৈষম্যের অবসান ঘটবে। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে এই বৈষম্য ও অবিচার বাড়ছে দেখে বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর এক উল্লেখযোগ্য অংশের মধ্যে হতাশা ও বঞ্চনা বোধ বাড়ছে। এর ফলে বিক্ষোভ বাড়ছে। তারই ফলশ্রুতিতে দেশে সাম্প্রদায়িকতা, প্রাদেশিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা তীব্রতর হচ্ছে। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, ভিয়েতনামসহ যেসকল দেশে এই অশুভ প্রবণতা জন্মলাভের মূল ভিত্তি নির্মূল করে দেওয়া হয়েছে। সকলের জন্য সমান অধিকার ও সমান মর্যাদা, সমান বিকাশের অধিকার নিশ্চিত হলে ঐ জিনিষ জন্ম নিতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিতে তাই ঘটছে।

এখানে লক্ষ্যণীয় যে, রুশ দেশের নভেম্বর বিপ্লবের পূর্বে পৃথিবীর কোথাও এই সুন্দর ও সুষ্ঠু পরিবেশ ছিল না। এই ব্যবস্থা মানুষের অগোচর ছিল। এই ব্যবস্থার কথা বললে লোকের কাছে অলীক মনে হত। নভেম্বর বিপ্লব সর্বপ্রথম বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরে — না, এটা করা সম্ভব। মার্কসীয় সমাজ বিজ্ঞানের তত্ত্ব এই কথা বলে। আজ তা বাস্তবায়িত অনেকগুলি সমাজতান্ত্রিক দেশে।

ভারতবর্ষে সমস্ত দেশের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিশেষত সংখ্যালঘু ও উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির বর্তমান বৈষম্যের অবসান ঘটানোর পথ কি? বুর্জোয়াদের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রেখে, দেশে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বাঁচিয়ে রেখে, কি তা করা সম্ভব? উপজাতিদের আজ এই কথা ভাবতে হবে। এর জবাবে নিঃসন্দেহে বলা যায় তা করা আদৌ সম্ভব নয়। বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলির ছোট ছোট জাতি উপজাতি জনগোষ্ঠীগুলির শোচনীয় দুরাবস্থাই তার প্রমাণ।

এই ক্ষুদ্র ত্রিপুরার কথাই ধরুন। এখানে কি দেখতে পাই? ১৮৪ দেশীয় রাজার শাসন কালে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের শিক্ষা, চিকিৎসার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। শিল্পত দূরের কথা, কৃষি অর্থনীতিতে তাদের প্রতিষ্ঠিত করার কোন ব্যবস্থা ছিল না। অথচ তাদের উপর সামন্ত রাজাদের শাসন ও শোষণ বজায় ছিল। জনসংখ্যার স্বল্পতা এবং তুলনামূলকভাবে অফুরন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ সারা রাজ্যে ছড়ানো ছিটানো ছিল বলে তখন ত্রিপুরায় উপজাতিদের খাওয়া পরার কোন অভাব ছিল না। কিন্তু সমাজ একই অবস্থানে দাঁড়িয়ে থাকে না। উৎপাদন ব্যবস্থায় নূতন টেকনিক অনুপ্রবেশের সাথে সাথেই এই সামন্ত যুগীয় অত্যন্ত প্রাচীন ও অনুন্নত পদ্ধতিতে উৎপাদন ব্যবস্থার উপর একান্ত নির্ভরশীল ত্রিপুরার উপজাতি চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। সেই প্রক্রিয়া ক্রমশঃ তীব্রতর রূপ নিচ্ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থাই এর জন্য দায়ী। যারা এই পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন, এই ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার কাজে লিপ্ত আছেন তারাই এর জন্য দায়ী। ৩০ বছর এক নাগাড়ে কংগ্রেসের ত্রিপুরা শাসন ত্রিপুরার উপজাতিদের কি উপহার দিয়েছে। ত্রিপুরায় উপজাতিদের বাসভূমির আবশ্যকতা দারুনভাবে সঙ্কুচিত করা হয়েছে। উপজাতিদের জমি কেড়ে নিয়েছে। তাদের ভূমিহীন অসহায় দিনমজুরে পরিণত করেছে। উপজাতিদের সংস্কৃতি ও ভাষা উন্নতি সাধন ও বিকাশের প্রচেষ্টা না করে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তার বিলুপ্তি সাধনের নিম্ন প্রচেষ্টা চালিয়েছিল কংগ্রেসী শাসকরা। তাদের নেতাদের বক্তব্য হল — ত্রিপুরার উপজাতিদের ভাষার বিকাশ সাধন করা নয়, বরং যতশীঘ্র সম্ভব তাদের ভাষাগুলি ভুলিয়ে দাও। তাদের গ্রাস করে ফেল। সর্বশ্রী সুখময় সেনগুপ্ত, শচীন্দ্রলাল সিংহ ও অশোক ভট্টাচার্য প্রভৃতি কংগ্রেস নেতাদের বিভিন্ন সময়ের ভাষণগুলিতে এর প্রমাণ মিলবে। কাজেই পুঁজিবাদী ব্যবস্থার ধারক ও বাহক কংগ্রেসের কাছ থেকে উপজাতিদের সার্বিক কল্যাণ সাধন করার কথা কল্পনা করা যায় না। যারা কল্পনা করেন তারা মরুভূমিতে মরীচিকার পেছনে দৌড়াচ্ছেন।

ভারতের বিভিন্ন স্থানে, বিশেষতঃ সমগ্র পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে খৃষ্টান মিশনারীরা খুবই সক্রিয়। তারা উপজাতিদের খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাদের ইহকাল ও পরকালের কথা বলেন। ধর্মভীরু করে তুলেন। আসল শত্রুকে আড়াল করে রাখেন। তারা আবার ধর্ম প্রচারের তলে তলে উপজাতি জনগণের জন্য পৃথক স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাজ্য গঠনের কথা উপজাতি জনগণের সামনে তুলে ধরেন। দীর্ঘদিন ধরে শোষণ ও বঞ্চনার জ্বালায় উপজাতিদের একাংশ পাদ্রী সাহেবদের এই মধুর কথায় বিভ্রান্ত হন। ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক ও স্বাধীন পাহাড়ী রাজ্য গঠনের স্বপ্ন দেখেন। ফলে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদের পথে পা বাড়ান। নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরামে একদল উপজাতি এই অত্যন্ত মারাত্মক পথে

পা বাড়িয়েছেন। ত্রিপুরা রাজ্যে উপজাতি যুব সমিতিও এই বিপজ্জনক পথেই পা বাড়িয়েছেন। একথা সকলেরই উপলব্ধি করা দরকার যে, হিন্দু ধর্ম বা ইসলাম ধর্ম বা খৃষ্টান ধর্ম বা যেকোন ধর্মের দোহাই মেরে রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করা হউক না কেন বস্তুতঃ এই ধর্মের প্রবর্তকরা পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থারই সমর্থক ও পৃষ্ঠপোষক। তারা সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরোধী। কাজেই তাদের শাসনে শোষিত মানুষের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মুক্তি আসতে পারে না। শোষিত ও নিপীড়িত ছোট ছোট জাতিগোষ্ঠীর জনগণের সার্বিক কল্যাণ আসতে পারে না। সমাজের ও দেশের সম্পদের উপর একচেটিয়া পুঁজিপতিদেরই কর্তৃত্ব বজায় থাকে। পৃথিবীতে প্রায় সব বড় বড় পুঁজিপতি দেশগুলি খৃষ্টধর্মাবলম্বী বড়লোকদের শাসনে রয়েছে। লক্ষ্য করা দরকার যে সেই সকল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে সেই ধর্মাবলম্বী সাধারণ মানুষের উপর বড়লোকদের শোষণ ও নির্যাতন যেমন কমে নাই তেমনি ছোট ছোট অনগ্রসর জাতি ও উপজাতির জনগণের বিকাশের পথ খোলে নাই। বরং তাদের উপর নির্যাতনের তীব্রতা বাড়ছে। রুশদেশের জার সম্রাটও খৃষ্টাধর্মাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু তার আমলে খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী শ্রমজীবী জনগণের ভাগ্যে অত্যাচার ও উৎপীড়ন ছাড়া আর কিছু জুটে নাই। কাজেই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন যেমন সাধারণ মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে না। তেমনি উপজাতিদের সার্বিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে না, বরং এই দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের বিকাশের পথ খুলে নাই বরং তাদের উপর নির্যাতনের তীব্রতা বাড়ছে।কাজেই ধর্মের ভিত্তিতে রাষ্ট্র গঠন যেমন সাধারণ মানুষকে শোষণ ও নিপীড়ন থেকে মুক্তি দিতে পারে না তেমনি উপজাতিদের সার্বিক বিকাশের পথ প্রশস্ত করতে পারে না। বরং এই দুর্বল জনগোষ্ঠীর উপর শোষণ ও নিপীড়নের মাত্রা আরও বাড়তে থাকে। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের অবস্থাই তার প্রমাণ।

আরও লক্ষ্য করার বিষয় ত্রিপুরায় মার্কসবাদীরা সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক ক্ষমতা ও সীমাবদ্ধ আর্থিক সম্বল নিয়ে মাত্র পাঁচ বছর আগে ক্ষমতায় আসেন। তাও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের কর্মসূচী নিয়ে নয় —জনগণের হিতার্থে কতগুলি গণতান্ত্রিক কর্মসূচী নিয়ে অন্য রাজনৈতিক দলগুলির সাথে যুক্ত হয়ে সরকারে বসেন। রাষ্ট্র ক্ষমতা এখনো দিল্লীর হাতে। অথচ এই সীমাবদ্ধ প্রশাসনিক এবং সীমাবদ্ধ আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার ত্রিপুরার সাধারণ জনগণের সার্বিক কল্যাণে অনেক কিছু করেছেন। ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের জন্য যা করেছেন তা তুলনাহীন। তাদের ভাষা বিকাশের জন্য পদক্ষেপ, তাদের চাকুরীতে প্রবেশের সুযোগ সম্প্রসারণ, জমিতে তাদের অধিকার সুরক্ষিত রাখার পদক্ষেপ, উপজাতিদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানা পদক্ষেপ গ্রহণ,

সর্বোপরি উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার জন্য স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন প্রভৃতি কাজ বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিকতার সাথে করেছেন। বুর্জোয়াদের কাছ থেকে এটা আশা করা যায় না। ভারতের কোথায়ও এই ধরনের পদক্ষেপ সক্রিয়ভাবে নেয়া হয় নাই। কেননা, সেখানে রয়েছে পুঁজিপতিগোষ্ঠীর হাতে প্রশাসনিক ক্ষমতা।

বামফ্রন্ট সরকার এই ধরণের কাজ করার শিক্ষা কোথা থেকে পেল? যে সর্বহারা শ্রেণীর আদর্শ অর্থাৎ সাম্যবাদের আদর্শের প্রতি আনুগত্য রেখে রুশ দেশের কমিউনিস্ট পার্টি নভেম্বর বিপ্লব সম্পাদন করেছেন, ত্রিপুরা এবং পশ্চিমবঙ্গের মার্কসবাদীরাও সেই একই আদর্শ থেকে প্রেরণা ও শিক্ষা গ্রহণ করে অগ্রসর হচ্ছেন। তাই এই দুই রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের কাজকর্ম ও দৃষ্টিভঙ্গীতে জাতি ও উপজাতির জনগণের প্রতি কোন বৈষম্য নাই। বলা যায়, বামফ্রন্ট সরকার কর্তৃক ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন ত্রিপুরায় উপজাতি জনগণের বিকাশ সাধনের পথে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাই বলা যায়, নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের শোষিত জনগণের কাছে একটি বড় আশীর্বাদ ও পথ প্রদর্শক। আর সাম্যবাদ বিরোধী পুঁজিবাদী সমাজের ধারক ও বাহকদের কাছে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের কারণ। বুর্জোয়ারা যে ধর্মই অবলম্বন করুন, আর যে ধর্মের দোহাই পাড়ুন, তাঁরা কখনও শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ সাধন করতে পারেন না। ভারত সমেত বিশ্বের পুঁজিবাদী দেশগুলির ঘটনাবলীই তার প্রকৃত প্রমাণ। নভেম্বর বিপ্লব এই অমূল্য শিক্ষাই আমাদের দিচ্ছে। তাই নভেম্বর বিপ্লব বিশ্বের শোষিত জনগণের কাছে এত তাৎপর্যপূর্ণ।

(দেশের কথা, ১৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ১২ নভেম্বর, ১৯৮২ শুক্রবার)

বাম গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট ছাড়া জনগণের আর বিকল্প নাই

আনুষ্ঠানিকভাবে ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা না হলেও আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষের দিকে কিংবা জানুয়ারীর প্রথম দিকে নির্বাচন যে অবধারিত এটা ধরে নেওয়া যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলি একথা মনে রেখেই তাদের কর্মতৎপরতা শুরু করে দিয়েছে।

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির হাবভাব দেখে একথা মনে করা যায় যে, এবার ত্রিপুরা বিধানসভার নির্বাচনে প্রধানতঃ দুইটি শিবিরেই ভোটের লড়াই হবে। এই দুইটি শিবিরের একটি হবে বামফ্রন্ট এবং অপরটি হবে বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তি। বামফ্রন্ট বিরোধী শক্তিগুলোর সকলের একটি বামবিরোধী রাজনৈতিক নির্বাচনী আঁতাতে সংগঠিত হবার সম্ভাবনা কম। কিছু রাজনৈতিক দলকে কংগ্রেস (ই) শিবিরের বাইরে থেকে নির্বাচনী লড়াই করতে হবে। কেননা, আসন বন্টনের ব্যাপারে কংগ্রেস (ই)-উপজাতি যুব সমিতির জোটের সিংহভাগ চলে গেলে অন্যদের দেবার মত তাঁদের হাতে খুব কমই আসন থাকবে। তাই নীতিগতভাবে এই দলগুলির অবস্থান প্রায় একই কক্ষে হলেও আসন বখরা নিয়েই এদের মধ্যে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে, এদের সকলে এক জোটে একত্রিত হওয়া সম্ভব হবে না। তাবা ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে নির্বাচনে দাঁড়ালেও তাদের আক্রমণ কেন্দ্রীভূত হবে বামফ্রন্টের বিরুদ্ধেই।

কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির নির্বাচনী আঁতাত পাকাপাকি হয়ে গেছে বলা যায়. দারুণ অশুভ মিতালী সন্দেহ নেই। কিন্তু কংগ্রেস (ই) আমরা বাঙ্গালী, জনতা পার্টি, ভি এস পি এবং নকশাল প্রভৃতি দলগুলিব কং(ই), টি ইউ জে এস জোটে স্থান পাবার সম্ভাবনা কম। তাদের পৃথকভাবেই নির্বাচনে নামতে হবে। তারাও গণফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা করছেন বটে, তবে শেষ পর্যন্ত কতটুকু সফল হবেন এখনও বলার সময় হয়নি। এই দলগুলি কং(ই) জোটে না থাকলেও এবং ভিন্ন ভিন্ন অবস্থানে থেকে নির্বাচন লড়লেও তাদের আক্রমণের লক্ষ্য হবে বামফ্রন্ট অর্থাৎ গণতান্ত্রিক শক্তি। তাদের মধ্যে পাবস্পরিক আক্রমণ হবে না। তাঁরা কং(ই) জোটকেও আক্রমণ কববে না। অর্থাৎ বামফ্রন্ট বিরোধী এই রাজনৈতিক দলগুলি স্বৈরতন্ত্র, সাম্প্রদাযিকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে তেমন আক্রমণ হানবে না। এবং ঐ সকল অশুভ ও জনবিরোধী শক্তিগুলিকে অনেকটা আড়াল করে রেখেই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলির উপরই আক্রমণ হানবে।

প্রত্যেক সরকারেরই ইতিবাচক এবং নেতিবাচক এই দুইটি দিকই আছে। এই পাঁচ বছর ধরে সরকার পরিচালনার ক্ষেত্রে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক ও নেতিবাচক

দুইটি দিক থাকবে। এখন খতিয়ে দেখতে হবে কোন দিকটায় পাল্লা ভারী। খতিয়ে দেখলে দেখা যাবে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের ইতিবাচক দিকটার পাল্লা অনেক বেশী ভারী। সীমিত আর্থিক ক্ষমতার মধ্যে যতটুকু জনহিতকর কাজকর্ম করা সম্ভব তা বামফ্রন্ট সরকার আন্তরিকতার সাথেই করেছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার মধ্যে এবং সর্বময় ক্ষমতা কেন্দ্রের কাছে রেখে রাজ্যের বামফ্রন্ট সরকারের পক্ষে এর চেয়ে বেশী অগ্রসর হওয়া হয়ত সম্ভব ছিল না। ত্রিপুরা সরকারই পাঁচ বছরে যা করেছে তার তুলনা নেই। অন্য কোন কং(ই) শাসিত রাজ্যগুলিতে এর সিকি মাত্রও করা হয় নাই। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই কটি বছরে যা করছে তা খুবই প্রাণিধানযোগ্য। কাজের বদলে খাদ্য, এন আর ই পি এবং এস আর ই পি প্রভৃতি প্রকল্প ব্যাপকভাবে চালু করে একদিকে যেমন ত্রিপুরার প্রতিটি গাঁওসভায় অনেকগুলি জনহিতকর ও গঠনমূলক কাজ করেছে, তেমনি ঐ প্রকল্পগুলির মাধ্যমে গ্রামের এক বিরাট সংখ্যক বেকারদের বৎসরের অধিকাংশ সময় কাজে নিয়োজিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ ছাড়া রাস্তাঘাট থেকে আরম্ভ করে স্কুলের সংখ্যাবৃদ্ধি, সব গ্রামে না হলেও বেশী সংখ্যক গ্রামে বিদ্যুৎ সরবরাহ, জলসেচের পরিমাণ বৃদ্ধি, পাছড়া তৈরীর স্কীম চালু করে উপজাতি নারীদের এক বিরাট সংখ্যককে কাজ দেওয়া, ত্রিপুরায় বিভিন্ন অংশের জনগণের বিস্মৃতি প্রায় সংস্কৃতিকে পুনরোদ্ধার করা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার সম্প্রসারণ করা প্রভৃতি অসংখ্য জনহিতকর কাজ ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার এই পাঁচ বছরে করেছে। সীমিত আর্থিক সম্বল নিয়ে এই পাঁচ বছরে ত্রিপুরায় কমপক্ষে চল্লিশ হাজারের বেশী বেকারদের কাজ দেওয়া হয়েছে। প্রায় বার হাজার উপজাতি বেকার এবং সাড়ে পাঁচ হাজার তফসিল সম্প্রদায়ভুক্ত বেকার যুবক যুবতী কাজ পেয়েছেন। রাজার আমলেব রাজ্যবাসী (সৈনিক) বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এবং বিকলাঙ্গ ব্যক্তিরা মাসিক পেনসন পেয়েছেন। যাবা অল্প পরিমাণ পেনসন পেতেন তাদের সকলের ক্ষেত্রেই নিম্নতম পেনসনের হার বেধে দেওয়া হয়েছে। কংগ্রেস (ই) শাসিত ত্রিপুরায় এগুলি স্বপ্নেরও অগোচর ছিল।

এই ৩৫ বছরে ভারতের জনগণের কাঁধে অনেক পর্বত প্রমাণ বোঝা চেপেছে। কংগ্রেস শাসকগোষ্ঠীরা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়তে গিয়ে তা করেছে। এই সঙ্কটেব বোঝা দিনের পর দিন আরও বেড়েছে। ত্রিপুরায় তার প্রতিক্রিয়া দারুণ পড়েছে। সমস্যা ক্রমশঃ জটিলতর হচ্ছে। ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের একার পক্ষে এই পর্বত প্রমাণ সমস্যার সম্যক মোকাবেলা করা সম্ভব নয়। এর সঠিক মোকাবেলা করতে গেলে ভারতের বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন করতে হবে। যাক সে প্রশ্ন এখন থাক। সীমিত আর্থিক সঙ্গতি নিয়ে বামফ্রন্ট সরকার শ্রমিক, কৃষক, দিনমজুর, জুমিয়া ভূমিহীন, তপশিলী উপজাতি, তফঃ জাতি, সংখ্যালঘু মুসলমান ও মণিপুরী প্রভৃতি প্রতিটি অংশে জনগণের

সমস্যা সমাধানের জন্য সম্ভাব্য অনেক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। কং(ই) শাসিত রাজ্যগুলিতে এর সিকিমাত্রও হয়নি। বর্তমান পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে জিইয়ে রেখে ঐগুলির মৌলিক সমাধান করা সম্ভব নয়। আজ একথা প্রায় সকলেই বুঝতে শুরু করেছেন। এই সীমিত সঙ্গতির মধ্যে বামফ্রন্ট যতটুকু করেছে তাও লক্ষ্যণীয়। এই বাস্তবতার স্বীকৃতি লাভ করেছে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক প্রকাশিত বিভিন্ন সমীক্ষা রিপোর্টে। তপশিলী জাতি ও তপশিলী উপজাতিদের জন্য ত্রিপুরার (বামফ্রন্ট সরকার) সরকার যা করেছে তা ভারতের অন্যান্য রাজ্যগুলির পক্ষে অনুকরণীয় বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

ত্রিপুরার উপজাতি অধ্যুষিত এলাকায় উন্নয়নমূলক কাজকর্মে জনগণের অংশ গ্রহণের সুযোগ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে ত্রিপুরা উপজাতি স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারের আর একটি গুরুত্বপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ। এই পদক্ষেপ ভারতের গণতান্ত্রিক মানুষের বিপুল সমর্থন লাভ করেছে।

ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট ও বামফ্রন্ট সরকার সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন ভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। জাতি ও উপজাতি জনগণের সম্প্রীতি ও সংহতি সুপ্রতিষ্ঠিত করতে নিরবচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

এই সাথে মিলিয়ে দেখুন ঐ সব বামফ্রন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির ভূমিকা। বিচার করতে হবে ত্রিপুরায় জনগণের বিভিন্ন সমস্যার প্রশ্নে তাদের ভূমিকা কি ছিল? তাঁরা ত্রিপুরাকে কোন পথে ঠেলে দিতে চেয়েছিল? এখনো কোন পথে ঠেলে দিতে চান? চোখে ধরা পড়বে ঐ দলগুলির ন্যক্কারজনক ভূমিকা। ত্রিপুরায় গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ় করতে জাতি ও উপজাতির শ্রমজীবী জনগণের সম্প্রীতি ও ঐক্য সুদৃঢ় করতে তাদের ভূমিকা শুধু মূল্যের কুঠুরীতে নয় এই পরিবেশের অবনতি ঘটাতে এদের অধিকাংশই ব্যস্ত ছিলেন। কং (ই), আমরা বাঙ্গালী দল ও উপজাতি যুব সমিতির ভূমিকা ছিল খুবই জঘন্য। তারা বরাবরই চেষ্টা করছে ত্রিপুরার উপজাতি ও বাঙ্গালী সাধারণ মানুষের মনে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ঢালতে। সাম্প্রদায়িকতায় তাদের মন বিষাক্ত করতে এই উভয় অংশের জনমনে পারস্পরিক সন্দেহ, অবিশ্বাস ও ঘৃণার উদ্রেক করতে। তারা কোন কারণেই বাঙ্গালী ও উপজাতির সাধারণ মানুষের মিলন চান নাই। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক সুদৃঢ় করতে চান নাই।

১৯৮০ সালের জুনের দাঙ্গার সময় ঐ দলগুলির কুৎসিত চেহারা নগ্নভাবে দেখা গেছে। আমরা দেখেছি উপজাতি যুব সমিতি, আমরা বাঙ্গালী ও কংগ্রেস (ই)র লোকদের এই ভয়াবহ দাঙ্গার অংশগ্রহণ করতে, মানুষ খুন করতে, ঘরে ঘরে আগুন দিতে, ঘরের

আসবাব -পত্র লুঠ করতে। আরও দেখেছি নানান ধরনের গুজব ছড়িয়ে জনমনে আতঙ্ক ও উত্তেজনা সৃষ্টির প্রয়াস চালাতে। পারস্পরিক সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মাত্রা বাড়িয়ে তোলার অপকর্মে লিপ্ত হতে। ত্রিপুরা সরকার এবং সশস্ত্র বাহিনী যখন দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশের শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে লিপ্ত, দাঙ্গা বিধ্বস্তদের খাওয়া পরানের কাজে ব্যস্ত, তখন ওরা দাঙ্গা দমনের কাজে নয়, রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার কাজে নয়, দাঙ্গার আগুন নেভানোর কাজে নয়, ওরা ব্যস্ত ছিলেন রাষ্ট্রপতি শাসনের দাবী তুলে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে এবং দাঙ্গার পরিস্থিতি জীইয়ে রাখতে। জনগণের স্বার্থের প্রতি তাদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। বামফ্রন্টের বিরোধিতার নামে ত্রিপুরা জনগণের জীবনে বিপর্যয় ডেকে আনাই তাদের লক্ষ্য। উপজাতি যুব সমিতি, কংগ্রেস-ই আমরা বাঙ্গালী দলের এই ন্যক্কারজনক ভূমিকা ত্রিপুরাবাসীরা সহজে ভুলতে পারেন না। নির্বাচনের সময়তো নয়ই। এই তিন দলের বাইরেও ত্রিপুরায় আরও কিছু বামফ্রন্ট বিরোধী রাজনৈতিক দল আছে। গত পাঁচ বছরে ত্রিপুরার জনগণের বিভিন্ন সমস্যার মোকাবেলার ক্ষেত্রে উল্লেখ করার মত তাদেব কোন ভূমিকা নেই। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নীবব দর্শক। তারা এখন একটিও নজীর দেখাতে পারবেন যে অশুভ শক্তির স্বৈরতান্ত্রিক, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাজকর্মের বিরুদ্ধে সোচ্চার হযেছেন। নীরবতা অবলম্বনের মধ্য দিয়ে বরং ঐ অশুভ শক্তিগুলিকে প্রকারান্তরে সহায়তাদানের ভূমিকাই পালন করেছেন। কাজেই কং(ই) যুব সমিতি জোট, গণফ্রন্টওলারা কেহই ত্রিপুরার সাধারণ মানুযের বাঁচার সংগ্রামেব বিকল্প হতে পারে না। একমাত্র বামফ্রন্ট ছাড়া সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে ত্রিপুরায় অন্য কোন রাজনৈতিক দল সংগ্রাম করে নাই। ভবিষ্যতে করবে কিনা ভবিষ্যতই জানে। নির্বাচনের সময় ত্রিপুরার সচেতন ভোটদাতাদের বিবেচনা থেকে এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলি বাদ পড়বে না একথা ধরে নেয়া যায়। কোন দৃষ্টিভঙ্গী এবং কোন রাজনৈতিক দল সত্য সত্যই ত্রিপুরাকে সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করে নিতে সহায়ক শক্তি হিসাবে কাজ করবে ইহাও বিচার্য বিষয় হবে। বামফ্রন্ট ছাড়া ত্রিপুরার জনগণের সার্বিক কল্যাণের পথে ত্রিপুরাবাসীকে সঠিকভাবে সাহায্য করবে এমন কোন বিকল্প আর নাই। এই বাস্তব সত্যটুকু ত্রিপুরাবাসীদের আজ অগোচর নয়।

জীবন দেববর্মা, "ডেইলি দেশের কথা, চতুর্থ বর্ষ, ৮৪ তম সংখ্যা" "১৭ই নভেম্বর ১৯৮২ ইং"

এরা খুনীদের আড়াল করতে পারবে না

বামফ্রন্ট সরকার আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে অপারগ এই তত্ত্ব দাঁড় করিয়ে তা প্রমাণ করার জন্য ষড়যন্ত্রের অভাব নেই। ত্রিপুরায় ১৯৭৮ সালে বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার পর থেকেই সেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছিল। সেই ষড়যন্ত্র সমানে চলছে।

একথা আজ দিনের আলোর মত পরিষ্কার হয়ে উঠেছে যে, গত পাঁচ বছরে আমরা বাঙ্গালী দল যে নাশকতামূলক কাজ করেছে, তেলিয়ামুড়া প্রভৃতি স্থানে দাঙ্গা করেছে আর উপজাতি যুব সমিতির উগ্রপন্থীরা যে খুন, সন্ত্রাস ও নাশকতামূলক কাজ করেছে এর পেছনে কং(ই)র গোপন হাত ছিল। উপজাতি যুব সমিতির সমর্থক এবং আমরা বাঙ্গালীদলের সমর্থকদের হাতে বামফ্রন্ট তথা মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির বহু কর্মী নিহত হয়েছেন এবং নিগৃহীত হয়েছেন। কংগ্রেস (ই)'র সমর্থকদের হাতেও বহু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী নিহত হয়েছেন এবং নিগৃহীত হয়েছেন।

কংগ্রেস (ই), আমরা বাঙ্গালী দল এবং উপজাতি যুব সমিতি বলছিলেন ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে। তাঁরা তো ১৯৮০ সালের ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সংঘটিত করে বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করতে চেয়েছিলেন। দাঙ্গাবাজদের হাতে বহু নিরাপরাধ নরনারীর প্রাণ অকালে ঝরে পড়ে। বহু ঘরবাড়ী ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়,জনগণের অশেষ দুর্গতি হয়। কিন্তু এই জনগণের শত্রুদের বিবেকে তা বিন্দুমাত্র আঘাত করে না। তাদের বিবেকের দংশন হয় না। দেশের জনগণের স্বার্থ রক্ষা এবং জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার ব্যাপারে তারা আদৌ আগ্রহী নয়। এই নির্বাচনে তাদের ভূমিকায় তা আরও স্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে।

ত্রিপুরার সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে দেখা গেছে জনগণের অধিকার রক্ষা করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। জনগণ যাতে স্বাধীনভাবে আপন বিবেক অনুযায়ী ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন সেই পরিবেশ সৃষ্টি করা তাদের লক্ষ্য ছিল না। তাদের লক্ষ্য ছিল যে কোন পন্থা অবলম্বন করে সরকারী গদীতে বসা। সেই পথ গৃহীত হোক বা অগৃহীতই হোক, খুন-সন্ত্রাসের পথই হোক, বা অর্থের প্রলোভন দেখিয়েই হোক তাতে তাদের বিবেকের দংশন হয় না। তাই এই নির্বাচনে দেখা গেছে কং(ই) এবং টি ইউ জে এস জোটকে বাহির থেকে গুন্ডা আমদানী করতে, বলপূর্বক ভোট কেন্দ্র দখল দখল কার মতলবে, মিথ্যা ও অপ প্রচার চালিয়ে খুন ও সন্ত্রাসের পথ ধরে, টাকা ছড়িয়ে ভোট আদায় করার প্রয়াস চালাতে, সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিষ ছড়িয়ে ভোট আদায় করার জন্য জঘন্য ও হীনপন্থা অবলম্বন করতে। টি ইউ জে এসের সমর্থকরা তো বন্দুক দেখিয়ে

পাহাড় অঞ্চলে উপজাতি ভোটারদের স্থানে স্থানে শাসিয়েছেন কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির জোটকে যারা ভোট দেবে না তাদেরকে গুলি করে মারা হবে। দশরথ দেবের প্রাণ নাশের বার বার চেষ্টা করে পুলিশ এবং সি আর পি এফ'র জীপে আক্রমণ করে তাঁদের কয়েক জনকে খুন করে টি ইউ জে এসের উগ্রপন্থীরা উপজাতি এলাকায় বড়াই করে প্রচার করে "দেখ, আমরা পুলিশ ও সি আর পি খুন করতে পারি। ওরা আমাদের টিকিটিও ধরতে পারে না। কেন্দ্রীয় কং(ই) সরকার আমাদের গায়ে হাত দেবে না। আমাদের কথামত না চললে তোমাদের শেষ করতে কতদিন লাগবে?" সি আর পি ও পুলিশ জোয়ানদের হত্যা করে ভোটারদের আতঙ্কিত করেছেন এবং বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন ওদের প্রার্থীদের অর্থাৎ কংগ্রেস(ই) এবং টি ইউ জে এস জোটের প্রার্থীদের ভোট না দিলে সত্যিই তাদের খুন করা হবে।

তাদের এই পথ গণতন্ত্রের পথ নয়। এইপথ সন্ত্রাসের পথ। জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করার পথ। জনগণের স্বাধীন মতামত প্রকাশের পথ রুদ্ধ করার। তাদের মর্জিমাফিক চলবার জন্য জনগণের উপব বলপ্রয়োগের পথ। ইন্দিরা কংগ্রেস এবং টি ইউ জে এস জোট এই মারাত্মক রাজনীতি অনুসরণ করে চলেছেন। এদের আরও জনবিচ্ছিন্ন করতে না পারলে ত্রিপুবার গণতান্ত্রিক পরিবেশ কলুষিত হবে। জনগণের দুর্গতি বাড়বে। রাজ্যে অরাজকতা হবে। শ্রমজীবী জনগণের বাঁচার সংগ্রাম ব্যাহত হবে।

নির্বাচনের রায় ওরা মেনে নিতে চান না। নির্বাচন শেষ হয়েছে। জনগণের রায়ে ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ওরা জনগণের এই রায়কে ম্লান করে দিতে চাচ্ছেন। নির্বাচনে বিপুল সংখ্যক ভোটারদের দ্বারা বর্জিত হয়েও তাদের ইচ্ছা জনগণের উপর চাপিয়ে দিতে কং(ই) এবং টি ইউ জে এস জোট একের পর এক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন। নির্বাচনের পরেও উদয়পুর, অমরপুর প্রভৃতি মহকুমায় বেশ কয়েকজন মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী ও সমর্থক ওদের হাতে খুন হয়েছেন। বনমালীপুর কেন্দ্রে সুখময় বাবুর জয়েব সংবাদ প্রকাশিত হবার সাথে সাথে কং(ই)র সমর্থকরা যে ধবনের উন্মত্ততা প্রদর্শন করেছিলেন, এই নির্বাচনে যদি বামফ্রন্ট পরাজিত হতেন তা হলে অন্ধকারের জীবগুলি ত্রিপুরায় জনজীবনকে কত ভয়াবহ করে তুলতেন তা সহজেই অনুমেয়।

আজ নির্বাচনের পর কিছু মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির নেতা ও কর্মীর নৃশংসভাবে খুন হবার পর কিছু কিছু পত্রিকা প্রশ্ন করেছেন — এই খুনের রাজনীতি কতদিন চলবে। মন্তব্য প্রসঙ্গে হিতোপদেশ দিচ্ছেন বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলিকে সংযত হতে এই পথ পরিহার করতে।

এই আগুন নিয়ে খেলার রাজনীতি অত্যন্ত নিন্দনীয়, জনগণের ঘৃণার পাত্র সে বিষয়ে কারো দ্বিমত থাকতে পারে না। কিন্তু যারা এই মন্তব্য করেছেন তাদের আন্তরিকতা ও নিরপেক্ষতা সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ থেকেই যাচ্ছে। বিবদমান রাজনৈতিক দলগুলি এই কথাটি আদৌ ঠিক নয়। আক্রান্ত হচ্ছেন বামপন্থী কর্মীরা। ভীম দেববর্মা এবং সুরমণি কলই উপজাতি যুব সমিতির লোকদের দ্বারা নিহত হয়েছেন। উদয়পুর, সোনামুড়া, বিশালগড় এবং বিলোনীয়া প্রভৃতি স্থানে মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির লোকেরাই নিহত হয়েছেন, নিগৃহীত হয়েছেন। তাদেরই ঘর বাড়ী ছাড়খার করা হয়েছে। কংগ্রেস (ই) এবং উপজাতি যুব সমিতির পক্ষ থেকেই মার্কসবাদী কর্মীদের উপরেই পরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিক আক্রমণ সংগঠিত করা হয়েছে এবং হচ্ছে। কাজেই ঘটনাগুলি প্রমাণ করতে বিবদমান রাজনৈতিক দল নয়, ঘটনাতো ঘটাচ্ছেন এক পক্ষের লোকেরাই। তারা হলেন ইন্দিরা কংগ্রেস এবং উপজাতি যুব সমিতির লোক। কাজেই "বিবাদমান রাজনৈতিক দলগুলি" কথাটা আমদানী করে জনসমক্ষে আসল সত্য আড়াল করার জন্যই সবই প্রকাশ পাচ্ছে। কোন কোন পত্রিকা মন্তব্য করেছেন উপমুখ্যমন্ত্রীর উস্কানীমূলক বক্তৃতাই নাকি এই খুনের রাজনীতিতে উৎসাহ যোগাচ্ছে। এই মন্তব্যেই ওদের আসলরূপ নগ্নভাবে আরও বেশী উদঘাটিত হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রী এই হত্যাকান্ডে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত না হয়ে গণতন্ত্রের আদর্শে অবিচল থেকে সংযত হতেই সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন। তবে উপমুখ্যমন্ত্রী অনুরোধ করলেও জনগণ নিশ্চয়ই খুনীদের হাতে নিজেদের আত্মরক্ষার অধিকার ছেড়ে দেবেন না। জনগণের আত্মরক্ষার অধিকার হলো জন্মগত অধিকার। সেই অধিকার তাদের হাত থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারে না।

ত্রিপুরাবাসীদের উপলব্ধি করতে হবে যারা ত্রিপুরার বিধানসভার নির্বাচন চান নাই, যারা এই নির্বাচন বানচাল করতে প্রথম থেকেই উঠে পড়ে লেগেছিলেন, যারা বামফ্রন্ট সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রপতির শাসন চালু করতে চেয়েছিলেন যারা ১৯৮০ সালের জুন মাসে দাঙ্গা করে বামফ্রন্ট সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে চেয়েছিলেন যারা আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটিয়ে ত্রিপুরার জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলতে চেয়েছিলেন এই নির্বাচনোত্তর সময়েও তারাই সেই একই উদ্দেশ্য হাসিল করতে এই খুন - সন্ত্রাস চালাচ্ছেন। তাঁদের আরও জনবিচ্ছিন্ন করতে, ত্রিপুরার শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ সুদৃঢ় করতে জনগণকে আরও সতর্ক আরও সচেতন ও সংগঠিত হতে হবে। এই পথই হবে এই সন্ত্রাসবাদী খুনীদের মোকাবেলার পথ।

জীবন দেববর্মা "ডেইলী দেশের কথা', চতুর্থ বর্ষ, ১৫০ সংখ্যা" '২২শে জানুয়ারী ১৯৮৩ ইং"

৬ষ্ঠ তফসিলের দাবী আকস্মিক নয়, প্রয়োজনভিত্তিক

সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফশিল ত্রিপুরায় চালু করতে কেন্দ্রীয় সরকার বরাবর অস্বীকার করে চলেছেন। তাই ত্রিপুরার বামফ্রন্ট সরকারকে বাধ্য হয়েই ৭ম তফসিলের আশ্রয় গ্রহণ করে ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেল পরিষদ দিতে হয়েছে। তাতে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের ৬ষ্ঠ তফসিলের গণতান্ত্রিক দাবীর একাংশ পূরণ হয়েছে বলা যেতে পারে। বর্তমান স্বশাসিত জেলা পরিষদের মাধ্যমে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের উন্নতিকল্পে কিছু কাজ করা যাচ্ছে।

ত্রিপুরার ৭ম তফসিল অনুযায়ী স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করে ত্রিপুরায় বামফ্রন্ট সরকার উপজাতি জনগণের এই দাবীর প্রতি আন্তরিকতা প্রদর্শন করেছেন। এই আন্তরিকতা আবারও প্রকাশিত হয়েছে দ্বিতীয় বামফ্রন্ট সরকার গঠনের সাথে সাথেই ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করার দাবীতে কেন্দ্রীয় সরকারকে অনুরোধ করে বিধানসভায় প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে।

ত্রিপুরার স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের দাবী আকস্মিক নয়। এই দাবী উঠেছিল ১৯৫২ সাল থেকে। দেশ বিভাগের পর প্রবল সংখ্যক বাঙ্গালী উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসার পর থেকেই ত্রিপুরার উপজাতি জনগণ জমি এবং অন্যান্য পেশায় নিজেদের নিরাপত্তা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে উঠেন। ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ এই বাস্তব অবস্থা উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়। উপজাতিদের জীবন ধারণের পক্ষে ভবিষ্যতে আবও ভয়াবহরূপ ধারণ করতে পারে তা অনুমান করতে পারে। তাই ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদের নেতৃত্বে ত্রিপুরার উপজাতি জনগণের রক্ষাকবচরূপে ত্রিপুরার একাংশ সংরক্ষিত করে তথায় স্বায়ত্ব শাসন চালু করার দাবী সামনে তুলে ধরেন। ইংরেজীতে প্রবাদ বাক্য আছে "Necessity is the father of invention" অর্থাৎ প্রয়োজন আবিষ্কারের উৎস বা প্রেরণা। এক্ষেত্রেও তাই। দেশ বিভাগের পূর্বে ত্রিপুরায় উপজাতিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। জীবন যাত্রায় জটিলতা ছিল না। এখনকারমত এত তীব্র প্রতিযোগিতা ছিল না। তাই বিশেষ রক্ষা কবচের প্রয়োজনীয়তা তখন তাদের চেতনায় স্থান পায় না। দেশ বিভাগের পর যখন তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ) থেকে হাজার হাজার বাঙ্গালী হিন্দু উদ্বাস্তু ত্রিপুরায় আসেন তখনই এই রক্ষা কবচের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতে পারেন।

১৯৫২ সালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে পার্লামেন্টের সেন্ট্রাল হলে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনে দশরথ দেব এম পি দাবী উত্থাপন

করেন ঃ- "Some area or areas of Tripura shall have to be set aside for the tribal alone and no other persons belonging to non-tribal community should be allowed to settle there. And this conference should take note that this is not new idea at all".

"কতকগুলি অঞ্চল কেবলমাত্র উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে যেখানে উপজাতি ভিন্ন অন্য সম্প্রদায়ের কাউকে তথায় বসতি স্থাপন করতে দেওয়া উচিত হবে না। এই সম্মেলনকে ইহা উপলব্ধি করতে হবে এটা যে আদৌ কোন নতুন কথা নয়।"

পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৫ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর ত্রিপুরা রাজ্যের প্রাচীনতম ও বৃহত্তম উপজাতি সংগঠন ত্রিপুরা রাজ্য গণমুক্তি পরিষদ কর্তৃক পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুর কাছে প্রদত্ত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল। ঃ-

"In the present crumble for land, it is not possible for the tribal, particularly for the tribal Jumias to secure land on personal initiative therefore, is the area inhabited by tribal people, all khas Land should be received exclusively for rehabilitation of tribals"

অর্থাৎ বর্তমানে ত্রিপুরার ভূমিতে যেরূপ টানাটানি চলছে তাতে উপজাতিদের পক্ষে বিশেষতঃ উপজাতি জুমিয়াদের পক্ষে কেবলমাত্র নিজেদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার ভূমি সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। তাই উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার খাস ভূমি কেবলমাত্র উপজাতিদের পুনর্বাসনের জন্যই সংরক্ষিত রাখতে হবে।"

১৯৫৬ সালের ১৯শে মার্চ দশরথ দেব, এম পি লোকসভায় বিষয়টি আবার উপস্থিত করেন ঃ The Government khas land in tribal compact areas must be reserved for tribal alone.

অর্থাৎ উপজাতি অধ্যুষিত এলাকার খাস ভূমি কেবলমাত্র উপজাতিদের জন্য সংরক্ষিত রাখতে হবে।

১৯৬০ সালে ধেবর কমিশন গঠিত হয়। তখনকার ত্রিপুরার চীফ কমিশনার এন এস পট্টনায়ক মহাশয় ধেবর কমিশনের কাছে প্রস্তাব রাখেন ঃ A particular area on right be demarcatd as reserved for the tribal and area right be brought under the fifth sehedule of the constitution.

অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট অঞ্চল চিহ্নিত করে তা উপজাতি সংরক্ষিত ঘোষণা করে সংবিধানের ৫ম তফশিলের আওতায় আনতে হবে।

ধেবর কমিশন বলেছেন ঃ Recomended for formation of tribal Development Block in the Tribal compact areas on experimental basis. The Commission felt that fifth schedule of the constitution might be tried only if that did not fulfil the aspiration of the tribals.

অর্থাৎ ধেবর কমিশন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে পরীক্ষামূলকভাবে উপজাতি উন্নয়ন ব্লক গঠনের সুপারিশ করেন। কমিশন মনে করেন যে, এই ব্যবস্থা উপজাতিদের চাহিদা মিটাতে ব্যর্থ হলে সংবিধানের ৫ম তফসিলের চালু করে দেখা যেতে পারে।

কে হনুমন্থাইয়ার নেতৃত্বে গঠিত প্রশাসনিক সংস্কার কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছেঃ In State like Tripura and Manipur it might be possible to demarcate a tribal compact are and to have a council established with limited powers in their hands.

অর্থাৎ ত্রিপুরা এবং মণিপুরের মতন রাজ্যে উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল চিহ্নিত করা সম্ভব এবং সীমিত কিছু ক্ষমতা দিয়ে কাউন্সিল গঠন করা সম্ভব।

ত্রিপুরার উপজাতিদের ভূমি ব্যবস্থায় নিরাপত্তা দান এবং সার্বিক উন্নতি সাধনের জন্য একটি নির্দ্ধারিত অঞ্চল চিহ্নিত করে তথায় স্বায়ত্ব শাসন চালু করার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত প্রত্যেকটি কমিশন এক বাক্যে স্বীকার করেছেন। পরবর্তী সময়ে মন্ডল কমিশনও প্রায় একই সুরে কথা বলেছেন। উপায় সম্পর্কে তারতম্য থাকতে পারে কিন্তু সব কমিশনই স্বীকার করেছেন যে, ত্রিপুরায় উপজাতিদের জন্য প্রশাসনিক স্তরে স্বায়ত্বশাসন চালু করে রক্ষাকবচের প্রয়োজনীয়তা আছে।

এটা স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে যে, ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট ব্লক ত্রিপুরায় ৫টি গঠন করা হয়েছে এবং এখনো চালু আছে। যেমন কাঞ্চনপুর, ছামনু, অমরপুর, ডম্বুরনগর এবং সাতচাঁদ ব্লক। ইহাও আজ পরীক্ষিত যে এই উপজাতি উন্নয়ন ব্লকগুলি উপজাতিদের চাহিদাপূরণ করতে পারে নাই। তাদের জমি থেকে উচ্ছেদ বন্ধ করতে পারে নাই। বরং এই ব্লকগুলি গঠিত হবার পর আশেপাশের এলাকাগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত হওয়ায় সেই এলাকাগুলিতে অগ্রসর জনগোষ্ঠীর স্বচ্ছল অংশের ভিড় বাড়তে

থাকে। ফলে উপজাতিরা জমি থেকে দ্রুত উচ্ছেদ হয়ে যায় অথচ পূর্বেকার কংগ্রেস সরকার প্রতিকারের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই।

বামফ্রন্ট সরকার ৭ম তফশিল অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করেছেন। কিন্তু তারও ক্ষমতা খুবই সীমিত। তাই প্রয়োজন সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ চালু করা।

সংবিধানের ৬ষ্ঠ তফসিল অনুযায়ী ত্রিপুরায় স্বশাসিত জেলা পরিষদ গঠনের কাজ যত বিলম্বিত হবে ত্রিপুরায় উপজাতিদের উন্নতি সাধনের কাজ ততই বিলম্বিত হবে।

এই দাবী ত্রিপুরার সকল অংশের গণতান্ত্রিক জনগণের সমর্থন লাভ করেছে। কেন্দ্রীয় কংগ্রেস (ই) সরকারের উচিত অবিলম্বে সংবিধানের প্রয়োজনীয় অংশ সংশোধন করে ত্রিপুরায় ৬ষ্ঠ তফসিল চালু করা ।

(জীবন দেববর্মা, 'ডেইলি দেশের কথা' চতুর্থ বর্ষ, ২০৯তম সংখ্যা ২৪ মার্চ, ১৯৮৩ ইংরেজী)